হুমায়ূন আহমেদ

রুমালী

আমার জীবনের প্রথম জোনাকি পোকা দেখার দৃশ্যটাও খুব অদ্ভুত ছিল। বাবা এবং মা'র সঙ্গে ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছি। রাতের ট্রেন। ট্রেনের বাতি হঠাৎ নিভে গেল। মা বিরক্ত হয়ে নানান কথা বলতে লাগলেন "ছাতার এক দেশে ছাতার এক ট্রেন। এখন ডাকাত পড়বে জানা কথা" এই সব। মায়ের কথা শুনে আমার ভয় ভয়
করতে ন হচ্ছিল এই
বুঝি দ দিয়ে হুড়মুড়
করে এ ঢুকে পড়বে।
ডাকাত ভয়ে জানি

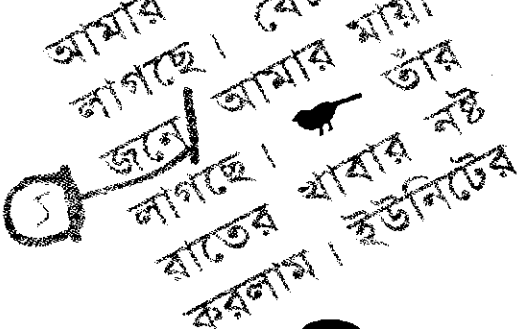

রুমালী

হুমায়ূন আহমেদ

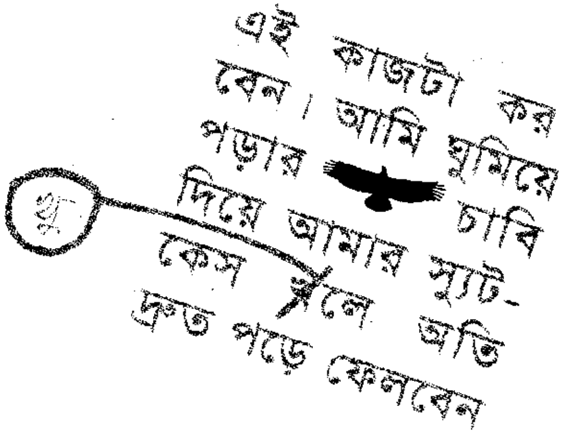

পার্ল পাবলিকেশন্স

জলি আবেদিন

জামাল আবেদিন

যুগলেষু।

এমন আনন্দময় মানব-মানবী আমি খুব কম দেখেছি। তাঁদের এই আনন্দ দেখেও সুখ।

Where have all the flowers gone ?
Young girls pick them every one.
Where have all the young girls gone ?
Gone to youngman every one.
Where have all the youngman gone ?
Gone for soldiers every one.
Where have all the soldier's gone ?
Gone to graveyard every one.
When will they ever learn ?
When will they ever learn ?

— *Country song, Kingstone Trio*

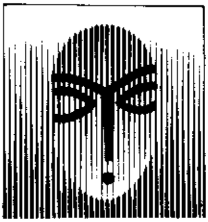

'বকু তুই রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

আমি পাশ ফিরে মা'কে দেখলাম। মা কোন ফাঁকে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বিড়ালের চেয়েও নিঃশব্দে হাঁটতে পারেন। আশে পাশে কেউ নেই, আমি হয়ত নিজের মনে গল্পের বই পড়ছি। এক সময় হঠাৎ দেখব মায়ের মাথাটা আমার ঘাড়ের পাশে। তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বলবেন, কী পড়ছিস? আমি যদি বলি গল্পের বই মা বলবেন, আজে বাজে গল্প নাতো? দেখি বইটা। মা বইটা হাতে নেবেন। বই এর নাম পড়বেন। নামের মধ্যে প্রেম ভালবাসা জাতীয় কিছু থাকলে তাঁর ভুরু কুঁচকে যাবে। আমি যে পাতাটা পড়ছি সেই পাতাটা পড়ে দেখবেন। এই হচ্ছে আমার মা— সাবিহা বেগম। বয়স আটত্রিশ। সেই বয়স তিনি নানান ভাবে কমানোর চেষ্টা করছেন। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। সেই ভাঁজ দূর করার অনেক চেষ্টা চলছে। তিনি কোত্থেকে একটা বই জোগাড় করেছেন। নজিবুর রহমান নামের এক ভদ্রলোকের লেখা—"যৌবন ধরে রাখুন"। সেই বই-এ মুখের চামড়ার ভাঁজ দূর করার যে সব প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা আছে তার কিছু কিছু প্রয়োগ করছেন। তেমন লাভ হচ্ছে না। আমার ধারণা খানিকটা ক্ষতি হচ্ছে। মা'র চোখ দু'টা ভিতরে ঢুকে চেহারায় খানিকটা ইঁদুর ভাব চলে এসেছে।

এখন বাজছে সকাল ন'টা এর মধ্যেই মা গোসল করে ফেলেছেন। চোখে কাজল দিয়েছেন। ম্যাচ করে শাড়ি ব্লাউজ পরেছেন। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগও আছে। সেই ব্যাগের রঙও শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলানো— সবুজ। মা বললেন, কিরে বকু রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

মার গলায় প্রবল উৎকণ্ঠা—যেন রোদে দাঁড়ানোর কারণে আমার শরীরে কিছুক্ষণের মধ্যে ফোসকা পড়ে যাবে। অথচ আমি মোটেই রোদে দাঁড়িয়ে নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি বিশাল একটা শিমুল গাছের নীচে। শিমুল গাছে কোন পাতা

নেই— শুধুই থোকা থোকা ফুল। এমন কড়া লাল রঙ যে— তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয় গাছে আগুন ধরে গেছে। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনে হচ্ছে আমার মাথার উপর আগুন জ্বলছে। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। গাছে হেলান দিতে পারলে আরো ভাল হত— কিন্তু হেলান দেবার উপায় নেই— গাছ ভর্তি বড় বড় কাঁটা। আমি মা'র দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম। এই মিষ্টি হাসি হচ্ছে নকল মিষ্টি। অভিনয়ের মিষ্টি হাসি। আমি যখন তখন এই হাসি হাসতে পারি। মা আবারো বললেন, কিরে কথা বলছি জবাব দিচ্ছিস না কেন ?

আমি বললাম, মা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

মা এই প্রশংসাতেও টললেন না। প্রায় ধমকের গলায় বললেন— শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

'কারণ আছে বলেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'কারণটা কী ?'

'কারণটাতো মা তোমাকে বলা যাবে না।'

'ফাজলামি করবি না।'

'আমাকে ডিরেক্টর সাহেব থাকতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা গেল। মা খুশি। ডিরেক্টর সাহেব থাকতে বললেতো থাকতেই হবে। এই মুহূর্তে তিনিই সব কিছু— আমাদের সম্রাট। সম্রাটের প্রতিটি কথা পালন করতে হবে। তাঁকে খুশি রাখতে হবে। মা'র এখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্রাটকে খুশি রাখা। তাঁর আশেপাশে থাকা। সম্রাটের সস্তা ধরনের রসিকতায় হা হা হি হি করে হাসা। আমাদের এই সম্রাটের ধারণা তিনি খুব রসিক মানুষ। ডিরেক্টর সাহেবের নাম মঈন খান। বয়স ঠিক কত এখনো জানি না— চল্লিশের উপরতো বটেই। রোগা পাতলা মানুষ। ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বহুরূপী ব্যাপার আছে। একেক দিন তাঁকে একেক রকম দেখা যায়। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঘটে তাঁর চশমার কারণে। ভদ্রলোকের অনেকগুলি চশমা। একেক দিন একেক রকমের চশমা পরেন। চশমার সঙ্গে মিলিয়ে চুল আচড়ানোর মধ্যেও কিছু একটা নিশ্চয়ই করেন। তাঁর চেহারা পাল্টে যায়। চেহারার সঙ্গে সঙ্গে ভাবভঙ্গি পাল্টে যায়। আজ তিনি সোনালী ফ্রেমের চশমা পরেছেন।

মা বললেন, মঈন ভাই তোকে এখানে থাকতে বলেছেন ?

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'কাজ দেখতে বলেছেন।'

'তাতো বটেই— কাজ না দেখলে কাজ শিখবি কীভাবে ?'

মা লম্বা লম্বা পা ফেলে ডিরেক্টর সাহেবের দিকে এগুচ্ছেন। আমি শংকিত বোধ করছি। কারণ ডিরেক্টর সাহেব আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন নি। শিমুল গাছটা দেখে আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি ইচ্ছা করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। শুটিং এর কাজ হচ্ছে রাস্তার ঐ পাশে। ন'দশ বছরের একটা মেয়ে এবং চার পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে দাঁড়া করিয়ে রাখা হয়েছে সেই সকাল থেকে। মেয়েটার পরণে ফ্রক। ছেলেটা সম্পূর্ণ নগ্ন। শুধু তার কোমরে কালো সুতা বাঁধা। সুতার সঙ্গে তিনটা শাদা কড়ি।

যে দৃশ্যটা এখন নেয়া হবে সেই দৃশ্যটা এরকম—এই দুই ভাই-বোন পানিতে ঝাপাঝাপি করছিল। হঠাৎ দেখতে পেল শহুরে কিছু মানুষ চারটা গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে। শহুরে মানুষদের গায়ে ঝলমলে পোষাক, তারা আনন্দ করতে করতে যাচ্ছে। এই দেখেই দুই ভাই-বোন পানি থেকে উঠে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কৌতূহলী চোখে গরুর গাড়ির ভেতরের মানুষগুলিকে দেখতে চেষ্টা করবে। গরুর গাড়ির ভেতরে সাব্বির নামের এক ভদ্রলোক ক্যামেরায় তাদের ছবি তুলতে যাবেন—ওম্নি মেয়েটা হেসে ফেলবে, আর ছেলেটা দু' হাতে তার নেংটো ঢেকে ফেলবে।

খুব সহজ দৃশ্য। অন্য কেউ হলে ফট করে নিয়ে নিত। কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর সাহেব এই দৃশ্যটাকে যথেষ্ট জটিল করে ফেলেছেন। রাস্তার পাশে ট্রলী পেতেছেন। দৃশ্যটা নেয়া হবে ট্রলীতে। রিফ্লেক্টর বোর্ড হাতে তিনজন লাইটম্যান দাঁড়িয়ে আছে। এরা একটু পরপর ধমক খাচ্ছে। ট্রলীও বোধ হয় ঠিকমত বসছে না— ক্যামেরা কাঁপছে। কোদাল দিয়ে রাস্তাটা সমান করে ট্রলী বসানো হয়েছে— তারপরেও বোধ হয় রাস্তা সমান হয় নি। ডিরেক্টর সাহেবের কাছ থেকে ক্যামেরাম্যানও ছোট্ট একটা ধমক খেলেন।

বাচ্চা দু'টি পুকুর থেকে উঠে এসেছে বলে তাদের গা ভেজা থাকার কথা। রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গা শুকিয়ে যাচ্ছে। তখন তাদের মাথায় বালতি ভর্তি পানি ঢালা হচ্ছে। এই কাজটিতে এরা দু'জনই খুব মজা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাদের জীবনে এমন আনন্দময় মুহূর্ত আর আসে নি।

আমি লক্ষ্য করলাম মা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন। আমি মা'র মুখ দেখতে পাচ্ছি না— কিন্তু আমি জানি তাঁর মুখ ভর্তি হাসি।

আজকের পরিস্থিতি মোটেই ভাল না। এখনো ক্যামেরা ওপেন হয় নি। এই অবস্থায় মা গিয়ে কী না কী বলবে কে জানে! তাদের কথাবার্তা এরকম হতে

পারে। মা বলবেন, মঈন ভাই আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে ? (আপনার কাজ কেমন হচ্ছে, না-জিজ্ঞেস করে মা বলবেন— আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে। মা প্রমাণ করতে চাইবেন যে উনার কাজটাকে মা নিজের কাজ ভাবছেন।)

মঈন সাহেব মা'র কথার জবাবে কোন কথা বলবেন না, একটু হয়ত হাসবেন। মেজাজ ভাল থাকলে অবশ্যি মা'র সঙ্গে রসিকতা করে কিছু বলবেন। আজ মেজাজ ভাল নেই। মা তা ধরতে পারবেন না। কারণ মা অন্যের মেজাজ মর্জি কিচ্ছু বুঝতে পারেন না। নিজের মনে হুড়বড় করে কথা বলে যান।

আমার ধারণা মা এক পর্যায়ে বলবেন— মঈন ভাই, আমার মেয়ে আপনাকে কী চোখে যে দেখে— আপনি যা বলেন তাই তার কাছে একমাত্র সত্য। আপনি তাকে কাজ দেখতে বলেছেন— ঐ দেখুন সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তাকে ছায়ায় দাঁড়াতে বলুনতো। আপনি না বললে যাবে না। আশ্চর্য মেয়ে। কী সমস্যায় যে ভাই মেয়েটাকে নিয়ে আছি।

মঈন সাহেব তখন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাবেন। কী হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করবেন। তিনি বলে ফেলতে পারেন— কই আপনার মেয়ের সঙ্গেতো আজ আমার কোন কথা হয় নি। তখন অবস্থাটা কী হবে! ডিরেক্টর সাহেবের কাছে মা'র ছুটে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে— আমার কথা যাচাই করে নেয়া। মা'র স্বভাব হচ্ছে— যে যাই বলুক মা যাচাই করে নেবেন।

মা কাউকেই বিশ্বাস করেন না। কোন ফেরেশতা এসে যদি মা'কে বলে— আপা শুনুন, আপনার মেয়েকে দেখলাম একা একা রিকশায় করে নিউ মার্কেটে যাচ্ছে। মা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, ও কী রঙের সালোয়ার পরেছে বলুনতো?

আমার খুব অস্বস্থি লাগছে। কী বিশ্রী ব্যাপার হল। ডিরেক্টর সাহেব যখন বিরক্ত গলায় বলবেন, কই আমিতো আপনার কন্যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলি নি তখন কী হবে! তিনি হয়ত হাত উঁচিয়ে আমাকে ডাকবেন।

এত দূর থেকেও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার মা হেসে হেসে কী যেন বলছেন। মঈন সাহেব মায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখে হাসি নেই, তবে বিরক্তিও নেই। শুধু পাপিয়া ম্যাডাম বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছেন। বেশির ভাগ সময়ই তিনি বিরক্ত হয়ে থাকেন।

পাপিয়া ম্যাডাম বসে আছেন মঈন সাহেবের পাশে। তাঁর হাতে বড় একটা গ্লাসে হলুদ রঙের কী একটা জিনিস। তিনি চুক চুক করে খাচ্ছেন। মা'র অকারণ হাসিতে সম্ভবত তাঁর মাথা ধরে যাচ্ছে। পাপিয়া ম্যাডামের সব সময় মাথা ধরে থাকে।

পাপিয়া ম্যাডাম আমাদের এই ছবির নায়িকা। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখি নি। মোমের পুতুল বললেও কম বলা হবে। তাঁর ঠোঁট

সুন্দর, চোখ সুন্দর, নাক সুন্দর, দাঁত সুন্দর। লম্বা সিল্কি চুল যা দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে। এবং কেঁচি দিয়ে এক গোছা চুল কেটে বাড়ির দেয়ালে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। তাকে দেখলে প্রথম যে কথাটা মনে হয় তা হচ্ছে—মানুষ এত সুন্দর হয় কী করে ? হেলেন অব ট্রয় কিংবা ক্লিওপেট্রা এরা কি তাঁর চেয়েও সুন্দর ছিল ? মনে হয় না।

মা তর তর করে ছুটে আসছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে জটিল কোন মিশন সম্পন্ন করে ফিরছেন। মিশনের ফলাফল তাঁর পক্ষে।

'বকু, তোকে বেলের সরবত দিয়েছে ?'

আমি কিছু বললাম না। মা হড়বড় করে বললেন, ইউনিটের সবাইকে বেলের সরবত দিয়েছে তোকে দিচ্ছে না কেন ? তুইতো ফেলনা না, তুই এই ছবির দুই নম্বর নায়িকা।

'মা চুপ করতো !'

'চুপ করব কেন ? মঈন ভাইয়ের কানে আমি এক সময় কথাটা তুলব। সবাইকে সব কিছু সেধে সেধে দেয়া হয়— তোর বেলায় চেয়ে চেয়ে নিতে হয়। কেন তুই কি বন্যার জলে ভেসে এসেছিস ? নাকি বৃষ্টির ফোটার সঙ্গে আকাশ থেকে পড়েছিস ?'

'উফ মা— চুপ কর।'

'সব সময় চুপ করে থাকলে হয় না। জায়গা মত কথা বলতে হয়। নিজের জিনিস আদায় করে নিতে হয়। বুদ্ধি খেলাতে হয়। তুই বুদ্ধি খেলাতে পারিস না। সবার মেয়ে হয় বুদ্ধিমতী, আর তুই হয়েছিস বোকামতী।'

মা চলে যাচ্ছেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, তবে নিশ্চিত হতে পারলাম না। মা সহজে কিছু ছেড়ে দেন না। বেলের সরবত প্রসঙ্গ এই খানেই চাপা পড়বে বলে মনে হয় না। যথাসময়ে ডিরেক্টর সাহেবের কানে উঠবে।

মা'র কথাগুলি মনে পড়ে এখন একটু হাসি পাচ্ছে— কেমন চোখ মুখ শক্ত করে বলছিলো —"সব সময় চুপ করে থাকলে হয় না। জায়গা মত কথা বলতে হয়। নিজের জিনিস আদায় করে নিতে হয়।" ভাবটা এ রকম যেন মা সব সময় নিজের জিনিস নিজে আদায় করে নিয়েছেন। আসলে তিনি কিছুই নিতে পারেন নি। বরং তার নিজের যা সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন আমার বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান। আমার বুদ্ধিমতী মা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি— এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। তিনি নানান ধরনের পাগলামী করার চেষ্টা করেন। গোলাপ গাছে স্প্রে করে দেয়ার যে বিষ ঘরে ছিল সেটা খাওয়ার চেষ্টা করেন, খানিকটা মুখে নিয়ে 'থু' করে ফেলে দেন। এতেই তার

মুখে ঘা-টা হয়ে একাকার। একবার পঞ্চাশটার মত ঘুমের অষুধ খান। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাওয়ায় সেই অষুধে টানা আঠারো ঘন্টা ঘুম ছাড়া তাঁর আর কিছুই হয় না। তারপর উঠে-পড়ে লাগেন, গুন্ডা লাগিয়ে বাবাকে মারার ব্যবস্থা করবেন। সেই নিয়ে দিনরাত আমার সঙ্গে পরামর্শ— বুঝলি বকু এমন মারের ব্যবস্থা করব যে প্রাণে মরবে না তবে হাত পা ভেঙ্গে লুলা হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে। পিশাব পায়খানা বিছানায় করবে। আমাকে চিনে না ? আমি তার বাপদাদা চৌদ্দগুষ্ঠির নাম ভুলিয়ে দেব। পাতলা পায়খানা করিয়ে ছাড়ব। কলসি ভর্তি ওরস্যালাইন খেয়েও কূল কিনারা পাবে না।

ভাড়াটে গুন্ডার পরিকল্পনা এক সময় বাতিল হয়— মা বিপুল উৎসাহে উকিলের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। দিনে উকিলের সঙ্গে কথা রাতে আমার সঙ্গে পরামর্শ— বুঝলি বকু হুজুরকে আমি শ্রীঘরে নিয়ে ছাড়ব। আমার বিনা অনুমতিতে বিয়ে! সাত বৎসর শ্রীঘরে বসে ইট ভাঙ্গতে হবে। ইট ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাতে কড়া পড়ে যাবে। আমি সহজ জিনিস না। তুই শুধু দেখ— কী হয়।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। মা কাঁদতে কাঁদতে আগামসি লেনে তার বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতে আসেন। আর আমার বাবা তার অফিস সেক্রেটারীকে বিয়ে করে ফেলেন। আমার ধারণা তাদের এখন বেশ সুখের সংসার। দু'টা ছেলেমেয়ে আছে। বাবা থাকেন এলিফেন্ট রোডে একটা কেনা ফ্ল্যাটে। তাদের একটা মেরুন কালারের গাড়িও আছে। একদিন দেখি নতুন মা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা তাঁর পাশে বসে হাসি হাসি মুখে কী যেন বলছেন। নতুন মা'র মুখেও হাসি। বাবা বেশ সুখেই আছেন। তবে মা'র ধারণা বাবা আছেন হাবিয়া দোজখে। কারণ যে মহিলাকে বিয়ে করেছেন— তিনি পর্বতের মত। বসলে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। টেনে তুলতে হয়।

'বুঝলি বকু, সারা গায়ে শুধু থলথলা চর্বি। পুতুল পুতুল দেখে তোর বাবা মজে গিয়ে বিয়ে করেছিল— সেই পুতুল এখন মৈনাক পর্বত। ট্রাকে তুললে ট্রাকের চাকার হাওয়া চলে যায় এই অবস্থা। আর মাগীর মেজাজ কী ! সারাক্ষণ খ্যাক খ্যাক করে।'

সবই মা'র বানানো কথা। মহিলা একটু মোটার দিকে— কিন্তু খুবই মায়াকাড়া চেহারা। মৃদুভাষি। কথা বলার সময় ঠোঁট টিপে টিপে হাসেন— দেখতে ভাল লাগে। আমার সঙ্গে তাঁর এই পর্যন্ত তিনবার দেখা হয়েছে। তিনবারই তিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। মা আমাদের এই দেখা হবার খবর জানেন না। খবর জানলে আবারো গোলাপ ফুলে দেয়ার কীটনাশক অষুধ খেয়ে ফেলতেন।

তবে এখন আর আমাদের গোলাপ গাছ নেই। এবং গাছে দেয়ার অষুধও নেই। নানাজানের দোতলা বাড়ির একটা অংশে আমরা থাকি। দোতলার অর্ধেকটা এবং একতলার পুরোটা ভাড়া দেয়া হয়। এই ভাড়ার টাকায় আমাদের এবং আমার মামার সংসার চলে। মামার বয়স পঞ্চাশ— এখনো বিয়ে করেন নি। আমার বুদ্ধি হবার পর থেকে শুনে আসছি তিনি বিয়ে করছেন। সব ঠিকঠাক। সেই বিয়ে এখনো হয় নি। এতে অবশ্যি আমার মা খুশি। কারণ বিয়ে করলেই দোতলার অর্ধেকটা আর ভাড়া দেয়া যাবে না। মামা সেখানে তাঁর সংসার পাতবেন। বাড়ি ভাড়া থেকে আয় অর্ধেক হয়ে যাবে। সংসারের খরচও যাবে বেড়ে। মামাকে তখন আর সামান্য হাত খরচ দিয়ে মানানো যাবে না। এমনিতেই মামা কিছুদিন পর পর গম্ভীর গলায় মা'কে ডেকে বলেন— সাবিহা শোন। তোর ভালর জন্যে বলছি। তোর মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দে। তারপর তুই মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে উঠে যা। কারণ এই বাড়ি আমার। বাড়ি ভেঙ্গে আমি ফ্লাট বানাব। এক তলায় দোকান, উপরে ফ্লাট। মুফতে অনেক দিন থেকে গেলি। তোর কাছে থেকে এক পয়সা বাড়ি ভাড়া নেই নি। আর কত ? সারাজীবন তোদের পালব এমন কথাতো না। আমিতো আর হাজি মোহাম্মদ মোহসিন না। আমি হলাম গিয়ে পাজি মোহাম্মদ কাসেম।

নানাজানের এই বাড়ি যে শুধু মামার একার তা না। মা'র অবশ্যই তাতে অংশ আছে। মা মামার সঙ্গে ঐ লাইনে কোন কথা বলেন না। মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন—ভাইজান এই বাড়ি অবশ্যই আপনার। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই চলে যাব। আজ বললে আজ যাব। বিপদের সময় আপনি যে আমাকে থাকতে দিয়েছেন এই যথেষ্ট। আমার আর আমার মেয়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানালেও আপনার ঋণ শোধ হবে না ভাইজান। ......

বলতে বলতে মা'র গলা ধরে যেত, তিনি বাক্য শেষ করতে না পেরে কেঁদে অস্থির হতেন। এতেই আমার কাসেম মামা বিচলিত হয়ে বলতেন—আরে কী শুরু করলি ? তোদের আমি ফেলে দেব নাকি ? আমার একটা বিচার আছে না ? আমিতো নর-পিশাচ না। আমি নর-মানব। আমি যতদিন থাকব তোরাও থাকবি। চোখ মুছ।

চোখ মোছার বদলে মা আরো ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠতেন। মামা হতেন বিচলিত আমি আমার মায়ের অভিনয় প্রতিভায় হতাম মুগ্ধ।

মা অবশ্যই বুদ্ধিমতী। বাবার চলে যাওয়াকে এক সময় তিনি সহজ ভাবে নিয়ে নিলেন— এবং বাস্তব স্বীকার করে বাঁচার চেষ্টা চালালেন। বাবার কাছে কান্নাকাটি করে তিনি মাসিক একটা বরাদ্দের ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়াও

প্রায়ই— বকুলের শরীর খারাপ চিকিৎসা করাতে হবে, বকুলের কলেজে ভর্তি হবার খরচ, এইসব বলে বলে টাকা আদায় করতে লাগলেন। সেই টাকার একটা পয়সাও খরচ করলেন না। ব্যাংকে জমা করতে লাগলেন। বাড়ি ভাড়া বাবদ যে টাকা পেতেন তার পুরোটাও মা খরচ করতেন না। একটা অংশ ব্যাংকে জমা করতেন। ছোটাছুটি করার ব্যাপারে মা একজন এক্সপার্ট। নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী বলার ব্যাপারেও এক্সপার্ট। স্কুলে আমাকে কখনো বেতন দিতে হয় নি। ফ্রী শিপের জন্যে মা দরখাস্ত করতেন। যেখানে লেখা থাকত—

> আমি স্বামী পরিত্যক্ত একজন মহিলা বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছি। আমার বর্তমানে কোন সহায় সম্বল নাই, আশ্রয় নাই। দুইবেলা অন্ন সংস্থানের পথ নাই। আমি তারপরও মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই। তার পরেও আমি আমার কন্যা মালিহা রুমালীকে (বকুল) সুশিক্ষিত করতে চাই। আমার এই কন্যা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল। অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় সে মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হয়েছিল। আপনার দয়ার উপর আমি নির্ভর করছি। এই কঠিন জীবন সংগ্রামে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। মালিহা রুমালীর বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। আপনার অবগতির জন্যে পেপার কাটিং এর ফটোকপি পাঠাইলাম।
>
> বিনীতা
> মালিহা রুমালীর দুর্ভাগা মাতা
> সাবিহা বেগম মুক্তা।

মা'র এই জাতীয় দরখাস্তে কাজ হত। তিনি নানান ধরনের মহিলা সমিতিতেও ঘুরতেন। এক মহিলা সমিতি তাঁকে পায়ে চালানো একটি সেলাই মেশিন দিয়েছিল। তিনি মেশিন বিক্রি করে সেই টাকাও ব্যাংকে জমা করে রেখেছিলেন। এক এনজিওর কাছ থেকে তিনি আমার জন্যে একটা বৃত্তিও জোগাড় করেন। মাসে পাঁচশ' টাকা। এই টাকা নেবার জন্যে প্রতি মাসের তিন তারিখে আমাকে মা'র সঙ্গে এনজিও'র অফিসে যেতে হত এবং দীর্ঘ সময় করুণ মুখ করে একটা ঘরে বসে গরমে ঘামতে হত। সেই ঘরে ফ্যান ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বনবন করে ফ্যান ঘুরলেও সেই ফ্যানে কোন বাতাস হত না।

মা'র ভিক্ষাবৃত্তিমূলক কর্মকান্ড শুরুতে অসহ্য লাগলেও শেষে সয়ে গিয়েছিল। মানুষের দয়া এবং করুণা পাবার নিত্য নতুন কলাকৌশল মা আবিষ্কার করতেন— আমি সে সব দেখতাম, এবং অবাক হতাম। মা'র কারণেই

আমি প্রথম টিভি নাটকে সুযোগ পেলাম। নাটকের প্রযোজকের বাসার ঠিকানা বের করে তিনি একদিন আমাকে নিয়ে তাঁর বাসায় উপস্থিত। প্রযোজকের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে যে কান্না শুরু করলেন—সেই কান্নায় পাথর গলে— প্রযোজকের স্ত্রীতো গলবেনই। ভদ্রমহিলাও চোখ মুছতে লাগলেন। সেই মহিলার কল্যাণে আমি জীবনে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম। নাটকের নাম স্বপ্ন সায়র। স্বপ্ন সায়র নাটকে আমার অভিনয় নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়েছিল— কারণ আমার মা'কে তারপর আর কখনো কোন প্রযোজকের বাসায় গিয়ে তাঁদের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে হয় নি। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী হিসেবে আমি দু'বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেলাম। আমাদের বসার ঘরে দু'টা ছবি বড় করে বাঁধাই করা আছে। একটাতে আমি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের হাত থেকে পদক নিচ্ছি, অন্যটায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের হাত থেকে পদক নিচ্ছি। এরশাদ সাহেবের একটা হাত আমার মাথায় রাখা। মা আমাকে গান শেখার ব্যবস্থা করলেন, নাচ শেখার ব্যবস্থা করলেন, সবই বিনা পয়সায়। একজন স্বামী পরিত্যক্তা আশ্রয়হীনা মহিলার প্রতি দয়া বশতই গানের এবং নাচের টিচার রাজি হলেন।

সোহরাব চাচা আমার দিকে আসছেন। তাঁর হাতে বড় একটা কাচের গ্লাস। সোহরাব চাচা হচ্ছেন কথাকলি ফিল্মসের প্রডাকশান ম্যানেজার। রোগা টিং টিং-এ একজন মানুষ। সব সময় হলুদ পাঞ্জাবি পরেন— এবং ক্রমাগত পান খান। ভাত খাবার আগেও তাঁর মুখ ভর্তি পান থাকে। ভাতের নলা মাখার সময় থু করে পান ফেলে কুলি করে নেন। অসাধারণ একজন মানুষ। মাছির যেমন হাজার হাজার চোখ থাকে তাঁরও তেমনি হাজার হাজার চোখ। চারপাশে কোথায় কী হচ্ছে তিনি সব জানেন। সমস্যা, তা যত জটিলই হোক— তাঁর কাছে সমাধান আছে। সমস্যার সমাধান তিনি এমন ভাবে করেন যে কেউ বুঝতেই পারে না—সমাধানটা তিনি করেছেন। রাগ বলে কোন বস্তু তাঁর ভেতর নেই। চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারেন। তবে কাজের ফাঁকে গল্প করতেও খুব পছন্দ করেন। বিশেষ বিশেষ মানুষের সঙ্গে যে গল্প করেন তা না— সবার সঙ্গে গল্প। যার সঙ্গে গল্প করেন মনে হয় সেই তার প্রাণের বন্ধু, তিনি আমাকে ডাকেন রুমাল।

'রুমালের খবর কী?'

'খবর ভাল। আপনি কেমন আছেন চাচা?'

'আমি খুবই ভাল আছি— এই নাও তোমার বেলের সরবত।'

'বেলের সরবততো আমি খাব না।'

'সেকি তোমার মা যে বলল তুমি বেলের সরবত খেতে চাচ্ছ?'

'চাচ্ছি না।'

'আচ্ছা না চাইলেও খেয়ে ফেল। জিনিসটা ভাল। আরেকটা কথা শোন— যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে আমাকে বলবে। পুরোদস্তুর নায়িকা যখন হবে তখন আর বলতে হবে না। আপনাতেই সব হয়ে যাবে।'

'চাচা আমি কি নায়িকা হতে পারব?'

'সেটা আমি বলতে পারব না। অভিনয় প্রতিভা কার কেমন তা জানি না, বুঝিও না। আমি হলাম যোগানদার। যার যা লাগবে— আমাকে বলবে আমি উপস্থিত করব।'

'আপনাকে যা আনতে বলা হবে নিয়ে আসবেন?'

'তুমি বললে আনব না। তবে ডিরেক্টর সাহেব বললে জোগাড় করব।'

'উনি যা বলবেন তাই এনে দেবেন?'

'এনে দেব। ফিল্ম লাইনের প্রডাকশান ম্যানেজার হতে হলে "চাহিবা মাত্র উপস্থিত" বিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। তবে শোন মিস রুমাল— উদ্ভট কিছু কোন ডিরেক্টর চায় না। ডিরেক্টরও জানে কী জোগাড় করা যাবে কী যাবে না।'

'মঈন সাহেবকে আপনি খুব পছন্দ করেন তাই না চাচা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন করেন?'

'তুমি যে কারণে কর— আমিও সেই কারণে করি।'

'কই আমিতো পছন্দ করি না।'

'পছন্দ না করাই ভাল। বেলের সরবতটা কেমন লাগলগো মা?'

'ভাল।'

'রেসিপি লাগবে? রেসিপি লাগলে বল— আমি রেসিপি দিয়ে দিচ্ছি। কাগজে লেখা আছে। এই নাও।'

আমি অবাক হয়ে দেখি সত্যি একটা কাগজে—বেলের সরবতের রেসিপি লেখা। সোহরাব চাচার হাত থেকে আমি কাগজটা নিলাম—

বেলের সরবত

পাকা বেল	১টি
ঠাণ্ডা পানি	৩ কাপ
দৈ	$\frac{১}{২}$ কাপ
চিনি	১ কাপ
গোলাপজল	১ টেবিল চামচ

১. বেলের আঠা ও বীচি ফেলে ১ কাপ পানিতে ভেজাতে হবে মোটা চালুনীতে ছেঁকে নিতে হবে।
২. চালবার পর ১ কাপ চিনি মেশাতে হবে।
৩. দৈ ফেটে মেশাতে হবে। গোলাপ জল এবং বরফের কুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। চিনির বদলে ক্যারামেল সিরাপ দেয়া যেতে পারে।

আমি বললাম, চাচা আপনি রেসিপি নিয়ে ঘুরছেন কেন ?

সোহরাব চাচা গলার স্বর নিচু করে বললেন, পাপিয়া ম্যাডামের জন্যে। ম্যাডামের এই সরবত এত পছন্দ হয়েছে যে রেসিপি চেয়েছেন। রেসিপি যখন লিখতেই হচ্ছে কার্বন পেপার দিয়ে তিন কপি করে ফেললাম— ছোট নায়িকা হিসেবে তুমি এক কপি রেখে দাও।

'থ্যাংক য়্যু।'

সোহরাব চাচা চলে গেলেন। এতক্ষণে শুটিং শুরু হল। তিনটা টেক নেয়া হল। টেক মনে হয় ভাল হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেবকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। তিনি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিচ্ছেন। আনন্দের সময় তিনি ফস করে সিগারেট ধরান— লম্বা লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই সিগারেট কুড়িয়ে তুলে নেবার ব্যাপারে সমবেত জনতার মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ দেখা যায়। এখানেও তাই হচ্ছে।

মুখভর্তি চাপদাড়ির মওলানা ধরনের একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি দেখেও না দেখার ভান করলাম।

ভদ্রলোকের কাঁধে চাদর। পাঞ্জাবি নেমে এসেছে পায়ের পাতা পর্যন্ত। পাঞ্জাবির উপর খোপখোপ প্রিন্টের চাদর গা থেকে আতরের গন্ধ ভেসে আসছে।

ভদ্রলোকের দিকে ভাল মত তাকালে দেখা যাবে চোখে সুরমাও দিয়েছেন। আমি ভাল মত তাকালাম না। এই জাতীয় মানুষরা কঠিন প্রকৃতির হয়ে থাকেন। শুটিং নিয়ে অকারণ হৈ চৈ শুরু করে দিতে পারেন। হয়ত বলে বসবেন আজ জুম্মাবার— আজ এইসব কী হচ্ছে? ঢাকার আশে পাশের মানুষ শুটিং-এ অভ্যস্ত। জায়গাটা ঢাকা থেকে অনেক দূরে। ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা। সেখান থেকে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে আরো তিন কিলোমিটার। জায়গাটার নাম চন্ডিগড়। কে জানে হয়ত চন্ডিগড়ের মানুষরা খুব ধর্মভীরু।

এত জায়গা থাকতে চন্ডিগড়ে শুটিং হচ্ছে— কারণ চিত্রনাট্য এই ভাবে লেখা। ঢাকা থেকে গারো পাহাড়ের দেশ দুর্গাপুরে বেড়াতে এসেছে একটা পরিবার, রিটায়ার্ড পুলিশের বড় কর্তা এবং তাঁর দুই মেয়ে দিলশাদ ও নিশাত। ছুটি কাটানোর গল্প। তারা উঠল একটা ডাক বাংলোয় অনেক মজা করল। আমি হচ্ছি ছোট বোন দিলু।

মওলানা সাহেব বিনীত গলায় বললেন, আসসালামু আলায়কুম।

আমি খুবই অস্বস্থিতে পড়ে গেলাম। বয়স্ক কোন ভদ্রলোক আগ বাড়িয়ে সালাম দিলে খুব অস্বস্থি লাগে। আমি লজ্জিত গলায় বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম।

'শুটিং হচ্ছে নাকি মা?'

'জ্বি।'

'দাঁড়ায়ে যদি দেখি কোন অসুবিধা আছে?'

'জ্বি না।'

'কেউ কিছু বলবে নাতো?'

'জ্বি না।'

'আপনি কি শুটিং এর মেয়ে?'

'জ্বি।'

'শুটিং এর কথা শুধু শুনেছি। দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।'

'আজ দেখুন।'

'রাংতা লাগানো বোর্ডের মত জিনিসগুলি কী?'

'এদেরকে বলে রিফ্লেক্টর। আয়নার মত। গায়ের উপর আলো ফেলে।'

'বাহ্ চমৎকার। লাল সার্ট পরা ভদ্রলোক কে?'

'উনি মঈন খান। এই ছবির পরিচালক। ছবিটা উনি বানাচ্ছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। উনার সঙ্গে কি কথা বলা যাবে?'

'কেন যাবে না—অবশ্যই যাবে। তবে এখন কাজ করছেনতো এখন বিরক্ত না করাই ভাল।'

'জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা। বিরক্ত করব না। মঈন সাহেবের স্ত্রী মাশাল্লাহ্ দেখতে খুব সুন্দর।'

'উনি ডিরেক্টর সাহেবের স্ত্রী না। উনার নাম পাপিয়া—এই ছবির নায়িকা। খুব বড় অভিনেত্রী।'

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল। পাপিয়া ম্যাডাম যেভাবে বসেছেন তাতে যে কোন মানুষেরই ভুরু কুঁচকাবার কথা। দু'টা চেয়ার গায়ে গায়ে লেগে আছে। পাপিয়া ম্যাডাম তাঁর বাঁ হাত পাশের চেয়ারের হাতলে তুলে দিয়েছেন। দূর থেকে মনে হয় তিনি ডিরেক্টর সাহেবের কাঁধে হাত রেখে বসে আছেন।

কড়া রোদ উঠেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। সকালবেলা ঠান্ডা থাকে। কুয়াশা কুয়াশা ভাব থাকে। এগারোটার দিকে ঝাঁঝালো রোদ উঠে যায়। এমন রোদ যে চোখ জ্বালা করতে থাকে।

'মা শুটিং কি শেষ হয়ে গেছে?'

'জ্বি না— আজ সারাদিনই শুটিং হবে।'

'ঐ যন্ত্রটা কী?'

'এর নাম ক্রেন ট্রলী। ক্যামেরা ক্রেন ট্রলীতে বসিয়ে উপুর নিচ করা হয়। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখুন আমি চলে যাচ্ছি।'

'আমি চন্ডিগড় হাইস্কুলের শিক্ষক—ইসলামিয়াত পড়াই।'

'ও আচ্ছা। খুব ভাল।'

'আমিও চলে যাব—আজ জুম্মাবার নামাজ আছে। আমার নাম মেরাজ উল্লাহ্। লোকে অবশ্য মেরাজ মাস্টার ডাকে। আমি আরো কিছুক্ষণ দেখি—আযান হয় বারোটার সময়। বারোটা বাজতে এখনো দেরি আছে।'

'আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা দেখুন।'

'মা আপনার নামটা জানা হয় নাই।'

'আমার নাম বকুল।'

'মাশাল্লাহ্ অতি সুন্দর নাম।'

আমি জায়গা ছেড়ে চলে এলাম—মেরাজ মাস্টার সাহেব আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে চারপাশের কর্মকান্ড দেখছেন। আজ আমার কোন সিকোয়েন্স হবে না। সাব্বিরের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন—তিনি এসে পৌঁছান নি, তাঁর গতকালই এসে পৌঁছানোর কথা। তাঁকে ছাড়া শুটিং শুরু করা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক সবাইকে খুব বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন। তবে ডিরেক্টর

সাহেবের মধ্যে এ নিয়ে কোন দুঃশ্চিন্তা লক্ষ্য করছি না। কোন কিছু নিয়েই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ না হবার ক্ষমতা এই মানুষটার আছে। কেমন গা এলিয়ে সিগারেট টানছেন যেন মনে হচ্ছে তিনিই রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার—পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে স্বয়ং দুর্গাপুরের পাহাড়ে এসেছেন। ছুটি শুরু হয়েছে।

পাপিয়া ম্যাডামের দিকে চোখ পড়তেই দেখি তিনি হাত উঁচিয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি চাপা অস্বস্তি নিয়ে এগুচ্ছি। এই মহিলার সামনে কেন জানি আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারি না। পাপিয়া ম্যাডাম গলায় লাল পাথরের নেকলেস পরেছেন। শিমুল ফুলের মত পাথরগুলিও জ্বলছে। তাঁর চোখে এখন সানগ্লাস। কিছুক্ষণ আগেও সানগ্লাস ছিল না। তাঁকেতো সারাক্ষণই লক্ষ্য করছি। কোন ফাঁকে সানগ্লাস পরে ফেললেন ? পাপিয়া ম্যাডামের সামনে দাঁড়ানোর পর আমার প্রথম যে ইচ্ছাটা হল তা হচ্ছে— আমি অবিকল উনার মত একটা লাল পাথর বসানো নেকলেস কিনব।

পাপিয়া ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, 'বকুল তুমি ঐ মওলানার সঙ্গে গুটগুট করে কী কথা বলছিলে ?'

'কী হচ্ছে না হচ্ছে উনি জানতে চাচ্ছিলেন।'

'পাবলিকের সঙ্গে কোন রকম মেলামেশা করবে না। সে যদি কিছু জানতে চায়— ইউনিটের সঙ্গে কথা বলবে। তোমার ফড় ফড় করে এত কথা বলার দরকার কী ? আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি আমার উপর রাগ করছ নাতো ?'

'জ্বি না।'

'শো বিজনেসে যারা থাকে তাদের সবার উচিত মানুষজনের কাছ থেকে একটু দূরে থাকা। লোকজন আসবে নানান কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। তুমি খোলা মনে উত্তর দেবে—তারপর সেগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্যদের বলবে। মওলানা সাহেবকে আমার খুব কনসপিকিউয়াস মনে হচ্ছে। মওলানা মানুষ তিনি থাকবেন মসজিদে, শুটিং স্পটে কেন ?'

মঈন সাহেব হাসি মুখে বললেন— মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল। বেচারা মওলানা বলে তার কৌতূহল থাকবে না ?

পাপিয়া ম্যাডাম খুব ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, প্লীজ দয়া করে তুমি আল্লাদী ধরনের কথা বলবে না। মওলানাকে বেচারা বলছ কেন ? বেচারার ডেফিনেশন কী ?

মঈন সাহেব বেচারার ডেফিনেশন শুরু করলেন— আর আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম ব্যাপারটা কী, পাপিয়া ম্যাডাম ইনাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন ? উনাকে ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে যতবার কথা বলতে শুনেছি ততবারই আপনি বলতে শুনেছি। আজ হঠাৎ তুমি কেন ?

'পাপিয়া শোন, বেচারা মানে হচ্ছে নেই-চারা। বে হল নেই, কাজেই বে চারা—নেই চারা। চারা হল চারাগাছ। অর্থাৎ যার শিকর আছে। গাছ নেই মানে শিকড়ও নেই। কাজেই বেচারার অর্থ দাঁড়াচ্ছে— শিকড়হীন মানুষ।'

পাপিয়া ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, মঈন ভাই শুনুন। যা কিছু একটা লজিক দাঁড়া করালেইতো হয় না। লজিক ব্যাপারটাকে আপনি খেলো করে ফেলছেন।

'তাই কি ?'

'হ্যাঁ তাই। আমি আপনার লজিক লজিক খেলা দেখতে দেখতে ক্লান্ত। এবার ক্ষান্ত দিন। অনেকতো হল।'

'তুমি দেখি সত্যি সত্যি রাগ করছ—শোন পাপিয়া আমি আসলে রসিকতা করছিলাম। তুমি মনে হচ্ছে আজকাল রসিকতাও নিতে পারছ না। তোমার কি শরীর খারাপ ?'

'হ্যাঁ আমার শরীর খারাপ।'

'পাপিয়া শোন, তুমি একটা কাজ কর— নার্ভ রিলাক্স করে এ জাতীয় দু'টা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক। বিশ্রাম নাও। আজ তোমার কোন শট হবে না।'

পাপিয়া ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনের কথা কাটাকাটির মধ্যে পড়ে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। পাপিয়া ম্যাডাম এখন অবশ্যি ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আপনি আপনি করেই কথা বলছেন। মনে হয় উনার শরীর আসলেই ভাল না। কখন আপনি বলছেন, কখন তুমি বলছেন বুঝতে পারছেন না। উনি দ্রুত পা ফেলে এগুচ্ছেন আমি যাচ্ছি তাঁর পেছনে পেছনে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি এখনই বলবেন— এই মেয়ে তুমি আমার পেছনে পেছনে আসছ কেন ? আমি কেন উনার পেছনে পেছনে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রেগে যাওয়া মানুষের সঙ্গে থাকতে নেই। রেগে যাওয়া মানুষ তার রাগ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই উনার রাগের খানিকটা আমার উপর এসে পড়বে।

'বকুল।'

'জ্বি।'

'তোমার মা তোমাকে বকু ডাকে কেন ?'

'আদর করে ডাকেন। বকুল থেকে বকু।'

'এইসব আদর ভাল না। তুমি শো বিজনেসের মেয়ে। তোমার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে—এইখানে বকু আবার কী ? তা ছাড়া বকুল নামটাওতো ভাল না। শো বিজনেসে নাম হবে ফ্লাওয়ারী। বকুল ফুলের নাম হলেও ফ্লাওয়ারী নাম না। তোমার আর কোন নাম নেই ?'

'আমার ভাল নাম— মালিহা রুমালী।'

'রুমালী নামটাতো বেশ ইন্টারেস্টিং। তবে মালিহা না। মা দিয়ে যে সব নাম শুরু তার কোনটাই আমার ভাল লাগে না। সেইসব নামে মা মা গন্ধ থাকে। শো বিজনেসের মেয়ের নামে মা মা গন্ধ থাকা ঠিক না। রুমালী নামটা অবশ্যি ভাল।'

'রুমালী নাম আমার বাবা রেখেছিলেন।'

'ভাল কথা মনে করেছ। তোমার বাবা প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। কথাটা তোমার বাবা প্রসঙ্গে না— তোমার মা প্রসঙ্গে। তুমি বাবার কথা বলায় মনে পড়ল।'

'বলুন।'

'তোমার মা সবচে অপছন্দের কাজ যেটা করেন সেটা হচ্ছে দুঃখের কাঁদুনী শুরু করেন। তোমার মা'র কাছ থেকে এই পর্যন্ত তিনবার আমি শুনেছি— তোমার বাবা তোমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তোমরা কী ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে পড়েছিলে, খেয়ে না খেয়ে ছিলে। সবাইকে এইসব বলে বেড়ানোর অর্থ কী ? এটাতো কোন আনন্দের ঘটনা না যে পৃথিবী শুদ্ধ সবাইকে জানাতে হবে ? সহানুভূতি পাবার জন্যে বলা ? সহানুভূতির দরকার কী ? আর শোন রুমালী, মানুষ সহানুভূতির বস্তা খুলে বসে নি যে দুঃখের কাঁদুনি শুনলেই সহানুভূতির বস্তা থেকে পাঁচ কেজি সহানুভূতি দিয়ে দেবে। সহানুভূতি হচ্ছে—খুবই ফাইনার ফিলিংস। একমাত্র মহাপুরুষদের মধ্যেই এই ফিলিংস আছে। বুঝতে পারছ কী বলছি ?'

'জ্বি।'

'তুমি কি তোমার মা'কে খুব পছন্দ কর ?'

'জ্বি।'

'তোমাকে জরুরি একটা কথা বলি— কাউকে খুব বেশি পছন্দ করবে না। খুব বেশি পছন্দ করলে কী হয় জান ?'

'জ্বি না।'

'খুব বেশি পছন্দ যাকে করবে সে তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে। কখন যে গ্রাস করবে তুমি বুঝতেই পারবে না। মানুষের মধ্যে আছে ঝিনুক স্বভাব। ঝিনুক কী করে? মুখ খুলে হা করে থাকে। ধরা যাক তুমি কোন একটা ঝিনুককে খুব বেশি পছন্দ করে ফেললে—তুমি তখন করবে কী, তার পেটের ভেতর গিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়বে। ওম্নি ঝিনুক তার ডালা বন্ধ করে ফেলবে। সেই ডালা খুলে তুমি আর কখনো বের হতে পারবে না। চির জীবনের জন্যে ঝিনুকের ভেতর আটকা পড়ে যাবে। তুমি কি আমার কথায় রাগ করছ?'

'জ্বি না।'

'শোন রুমালী আমি কথা খুব কম বলি। আবার মাঝে মাঝে যখন মেজাজ খারাপ হয় তখন প্রচুর কথা বলি। প্রচুর কথা বলায় আমার নিজের লাভের মধ্যে লাভ এই হয়— যার সঙ্গে কথা বলি সে যায় রেগে।'

'আমি রাগি নি, রাগ করার মত কোন কথা আপনি বলেন নি।'

'এখন বলব— কথাটা হচ্ছে— তুমি আমার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করবে না। বড় জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোট্ট একটা নৌকা থাকে। জাহাজ যেখানে যায় নৌকা জাহাজের পেছনে পেছনে সেখানে যায়। এই নৌকাকে বলে 'গাধাবোট'। আমি জাহাজ কি না জানি না, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি— আমার সঙ্গে সব সময় চার পাঁচটা গাধাবোট থাকে। গাধাবোট আমার কাছে অসহ্য লাগে।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাপিয়া ম্যাডাম এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শেষ কথাগুলিতে আমি কী রকম কষ্ট পেলাম তা দেখার জন্যেও একবার পেছনে ফিরলেন না। মজার ব্যাপার হল আমি একেবারেই কষ্ট পাই নি। বরং আমার একটু হাসি পাচ্ছে। কাউকে কষ্ট দেব এটা আগে ভাগে ঠিক করে কেউ যখন কিছু করে তখন আর কষ্ট লাগে না। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে— মা'র সঙ্গে থেকে থেকে আমার গায়ের চামড়াও হয়ত খানিকটা শক্ত হয়েছে।

'বকুল শুনে যাও।'

আমি পেছন ফিরলাম। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডাকছেন। তিনি বেশ আয়েশ করে বসেছেন। পাপিয়া ম্যাডাম যে চেয়ারে বসেছিলেন সেই চেয়ারে পা তুলে দিয়েছেন। এতক্ষণ চোখে সানগ্লাস ছিল না, এখন চোখে সানগ্লাস। পাপিয়া ম্যাডামের ফেলে যাওয়া সানগ্লাসটাই তাঁর চোখে। তাঁর মুখ আকাশের দিকে ফেরানো। গা এলানো গা এলানো ভাব।

ক্রেন ট্রলীতে কোন একটা সমস্যা হচ্ছে। ট্রলী খোলা হচ্ছে। মনে হয় সমস্যা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত শুটিং শুরু হবে না।

আমি ডিরেক্টর সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি চেয়ার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, বোস। আমি বসলাম।

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি ভাল।'

'চন্ডিগড় জায়গাটা সুন্দর না?'

'জ্বি।'

'আমার কাছে তত সুন্দর লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে আউটডোর বান্দরবানে ফেললে ভাল হত। তুমি বান্দরবানে কখনো গিয়েছ?'

'জ্বি না।'

'খুব সুন্দর। একটা পাহাড়ি নদী আছে। নদীর নাম— শংখ নদী। খুব সুন্দর।'

ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। কারণ তিনি সানগ্লাস পরে আছেন। সানগ্লাস পরা মানুষ কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বোঝা যায় না বলে কথা বলে ভাল লাগে না। তা ছাড়া ডিরেক্টর সাহেবও আমার সঙ্গে দায়সারা ভাবে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে তাঁর কিছু করার নেই বলেই কথা বলে সময় কাটানো। কথা বলার জন্যে তাঁর সবসময় কাউকে না কাউকে দরকার। পাপিয়া ম্যাডাম নেই কাজেই আমাকে দরকার। আমি না থাকলে তিনি অন্য কাউকে ডেকে নিতেন। ফিল আপ দ্যা ব্ল্যাংক। শূন্যস্থান পূরণ।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'দেখি একটা প্রশ্নের জবাব দাও—তোমার বুদ্ধি কেমন পরীক্ষা করা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে কী— তিনটা পিঁপড়া সারি বেঁধে যাচ্ছে। একজনের পেছনে একজন। সবার প্রথম যে পিঁপড়াটা যাচ্ছে সে বলল, আমার পেছনে আছে দু'টা পিঁপড়া। মাঝখানের পিঁপড়াটা বলল, আমার সামনে আছে একটা পিঁপড়া, পেছনে আছে একটা পিঁপড়া। মজার ব্যাপার হচ্ছে সবচে পেছনে যে পিঁপড়াটা যাচ্ছে সে বলল— আমার সামনে কোন পিঁপড়া নেই, আমার পেছনে আছে দু'টা পিঁপড়া। সে এ রকম বলছে কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম। এই ধাঁধার উত্তর আমি জানি। এর উত্তর হচ্ছে— সবচে পেছনের পিঁপড়াটা চালবাজ এবং মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা বলছে। কেউ যদি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে তার মনে মনে আশা থাকে ধাঁধার জবাব কেউ পারবে না। যদি কেউ পেরে যায় তাহলে প্রশ্নকর্তার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ডিরেক্টর

সাহেবের মন খারাপ করতে চাইলাম না। আমি এমন ভাব করলাম যে, ধাঁধার জবাব আমার জানা নেই। আমি আকাশ পাতাল ভাবছি। ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না।

'পারছ না ?'

'পারব। আমার একটু সময় লাগবে।'

'কোন অসুবিধা নেই। সময় নাও। যত ইচ্ছা সময় নাও।'

'আচ্ছা পিঁপড়া তিনটা কি আসলেই একটার পর একটা যাচ্ছিল ?'

'অবশ্যই।'

'এরা হঠাৎ উল্টো দিকে চলা শুরু করে নিতো?'

'না।'

'আমি পারছি না।'

'পারছ না ? খুব সহজ, শেষের পিঁপড়াটা দারুণ মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা বলছিল। মানুষের মধ্যে যেমন মিথ্যুক আছে পিঁপড়াদের মধ্যেও আছে। হা হা হা হা।'

ডিরেক্টর সাহেব উচ্চ স্বরে হাসতে লাগলেন। উনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে পানি এসে গেল। হঠাৎ করেই এসে গেল। উনি ভাবলেন—ধাঁধার জবাব দিতে না পারার কারণে লজ্জায় এবং অপমানে আমার চোখে পানি এসেছে। তিনি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

'আরে বোকা মেয়ে কাঁদছ কেন ? এটা একটা ফালতু ধরনের ধাঁধা। তোমাকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। আচ্ছা যাও প্রতিজ্ঞা করছি—এই জীবনে তোমাকে আর ধাঁধা জিজ্ঞেস করব না। প্লীজ চোখ মোছ।'

আমি উড়নায় চোখ মুছলাম।

'যাও রেস্ট হাউসে চলে যাও। বিশ্রাম কর। গল্পের বই-টই পড়। আজ তোমার কোন কাজ হবে না। আর শোন মেয়ে একটা কথা বলি—কিছু না পারলেই কেঁদে ফেলতে হবে এটা ঠিক না। তুমি তোমার এক জীবনে দেখবে অনেক কিছুই পারছ না। প্রতিবারই যদি কাঁদতে থাক তাহলে তোমার জীবন যাবে কাঁদতে কাঁদতে। এটা ঠিক না।'

আমি চলে যাচ্ছি। ডিরেক্টর সাহেব এখন যদি আমাকে দেখতেন—তাহলে অবাক হতেন। আমার চোখ শুকনা এবং ঠোঁটে হাসি। বিষাদের হাসি না, আনন্দের হাসি। হঠাৎ এত আনন্দ হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। আমার নিজের অনেক কিছুই আমি এখন বুঝতে পারি না। শিমুল গাছের নীচে আমি দীর্ঘসময় দাঁড়িয়েছিলাম। কেন দাঁড়িয়েছিলাম ? শুটিং দেখার জন্যে ? কাজ শেখার জন্যে ? না, তা না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম যাতে ডিরেক্টর সাহেবকে দেখতে পাই। এই

মানুষটাকে আমার এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই আমার চোখে পানি আসে। এর মানেই বা কী ? ভয়ংকর একটা ঘটনা আমার ভেতর ঘটে গেছে। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, আমি জানি না। আমার জানতে ইচ্ছেও করে না। এই ভদ্রলোক আজ যদি আমাকে ডেকে বলেন—বকুল শোন, তুমি একটা কাজ কর। আমি একটা মৃত্যু দৃশ্যের শট নেব। তুমি ঐ যে পাহাড়টা দেখা যায়—পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঝাপ দিয়ে নীচে পড়।

আমি তখনই তা করব। কেন করব কী জন্যে করব তা আমি জানি না। কিন্তু আমি অবশ্যই করব। আমি আবার হাসলাম। আমি জানি হাসলে আমাকে খুব সুন্দর দেখায়। আমি কি কখনো আমার হাসি উনাকে দেখাতে পারব ? না পারব না। কারণ আমি তাঁকে কিছু দেখাতে চাই না। আমি কাউকেই কিছু দেখাতে চাই না। নিজেকেও না। আমি নিজেকে নিজের কাছে আড়াল করে রাখতে চাই।

রোদ আরো বেড়েছে। চারদিক ঝকঝক করছে। গল্প উপন্যাসে মাটির গন্ধের কথা পড়েছি। এখন আমি মাটির গন্ধ পাচ্ছি। কড়া গন্ধ। এই গন্ধে ঝিম ধরানো ভাব থাকে। কিছু গন্ধ থাকে যা গায়ে মাখতে ইচ্ছা করে। মাটির গন্ধ হল সে রকম গন্ধ। ফুলের গন্ধ গায়ে মাখতে ইচ্ছা করে না। সুন্দর কোন কৌটায় জমিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।

আমি এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছি। আমার মা বোধ হয় এখনো জানেন না যে আমি রোদের মধ্যে হাঁটছি। জানতে পেলে ছুটে আসতেন। গ্রামে আমার এই প্রথম আসা। যা দেখছি তাই ভাল লাগছে। মুগ্ধ হয়ে একটা বরই গাছের সামনে দাঁড়ালাম। বরই গাছতো কতই দেখেছি । বরই গাছ দেখে কখনো মুগ্ধ হই নি। এই গাছ দেখে মুগ্ধ হচ্ছি কারণ পুরো গাছ সোনালী রঙের চাদর দিয়ে ঢাকা। খুব সরু সোনালী লতা গাছটাকে ঢেকে ফেলেছে। রোদের আলোয় ঝলমল করছে। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ছবি তুলতাম। ক্যামেরা সঙ্গে নেই— মা'র ব্যাগে আছে। ছোট্ট ভিভিটার ক্যামেরা হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা যায়। ছোট্ট হলেও দামী— খুব ভাল ছবি ওঠে।

এই ক্যামেরাও মা'র উপার্জন। তিনি একদিন বাবার কাছে গিয়ে বললেন— পরশু তোমার মেয়ের জন্মদিন। সে ষোল বছরে পড়ল। এই মেয়েতো পথে ফেলে দেয়া মেয়ে। তার জন্মদিনে তুমি আসবে এটা আমরা ভাবি না—তোমাকে আসতেও বলব না। তোমার মেয়ে তোমার কাছে একটা উপহার চেয়েছে তাকে তুমি একটা দামী ক্যামেরা দেবে। অটোমেটিক ক্যামেরা। তোমার কাছেতো

মেয়ে মুখ ফুটে কোনদিন কিছু চায় নি—এই প্রথম চাচ্ছে। তুমি কিনে এনে রাখবে আমি কাল এসে নিয়ে যাব। বায়তুল মোকাররমের দোকানে পাওয়া যায়। দেখে শুনে কিনবে— সেকেন্ড হ্যান্ড যেন না হয়। সিঙ্গাপুর মেড না, জাপান মেড।

বাবা ক্যামেরা কিনে দিলেন। মা ঝলমল মুখে ক্যামেরা নিয়ে এলেন।

আমি মা'কে বললাম, ক্যামেরা ভিক্ষা চাইতে তোমার লজ্জা লাগল না মা ?

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, লজ্জা লাগবে কেন ? তুই তার মেয়ে না ? নাকি আমি অন্য মানুষের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে তোকে পেটে এনেছি!

'ছিঃ মা এইসব কী ধরনের কথা ?'

'তুই যে ধরনের কথা বলিস তার উত্তরে এইসব কথাই বলতে হয়। আমাদের যা দরকার আমরা আদায় করে নেব। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পারি আদায় করব।'

'এই ক্যামেরা আমি নেব না মা।'

'নিতে না চাইলে নিবি না। আমার কাছে থাকবে। তোর নাটক-টাটকের রেকর্ডিং যখন হবে তখন এই ক্যামেরায় আমি তোর ছবি তুলব।'

'এই ক্যামেরায় আমি কোনদিন আমার ছবি তুলতে দেব না।'

'না দিলে না দিবি।'

মা খুব আনন্দিত। আমার কঠিন কথাতেও তাঁর আনন্দের কোন কমতি হল না। তিনি হাসি মুখে ক্যামেরা গুছিয়ে রাখলেন। বুঝতে পারছি জিনিসটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। আমার যখন কোন রেকর্ডিং থাকে— মা হাসিমুখে ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হন। আশে পাশে কে আছে না আছে কোন খেয়াল না করে বলেন— দেখি বকু, আমার দিকে তাকা। মুখটা হাসি হাসি কর। ওমা ঠোঁটটা আরেকটু ফাঁক কর— এত অল্প ফাঁক না। দেখি চুলগুলি সামনে এনে দে না। উঁহু ডান দিকে না, বাম দিকে। মুখটা একটু উঁচু কর। চোখে আলো পড়ছে না, চোখ অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। হয়েছে—এখন বল 'চীজ'।

'আমি বলি—চীজ।'

মানুষ যদি ঝিনুকের মত হয় তাহলে আমি মায়ের ঝিনুকের ভেতর বসে আছি। মা ডালা বন্ধ করে রেখেছেন। ডালাবন্ধ ঝিনুকের ভেতরের গরমে আমার অসহ্য বোধ হলেও আমিতো জানি মা ভালবাসার রসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমাকে মুক্তা বানানোর চেষ্টা করছেন। পরিপূর্ণ মুক্তা হবার পর ঝিনুক কী করে ? ডালা খুলে মুক্তা উগরে ফেলে দেয় ? না-কি চিরজীবন বুকের ভেতর ধরে রাখে ?

'কী দেখছেন ?'

আমি চমকে তাকিয়ে দেখি সেলিম ভাই। আমাকে প্রশ্নটা করে তিনি নিজেই যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। সেলিম ভাই আমাদের ইউনিটের সঙ্গে আছেন। তাঁর কাজটা কী এখনো জানি না। তিনি অভিনেতাদের কেউ না। কারণ তিনি শিল্পীদের সঙ্গে থাকেন না, বা শিল্পীদের সঙ্গে খেতেও বসেন না। তিনি থাকেন ইউনিটের লোকদের সঙ্গে। খাওয়া দাওয়াও তাদের সঙ্গে করেন। তবে ইউনিটের কোন কাজ করেন না। খুবই বিব্রত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ান। যেন সিনেমার দলের সঙ্গে ঢুকে পড়ে খুব লজ্জায় পড়েছেন। আমি সেলিম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললাম, বরই গাছটা কেমন সোনালী চাদর গায়ে দিয়ে জড়সড় হয়ে আছে তাই দেখছি। খুব সুন্দর না?

'জ্বি সুন্দর। এই লতাটার নাম স্বর্ণলতা।'

'আপনি কি খুব গাছ গাছড়া চেনেন?'

'গ্রামের ছেলেতো—গাছ চিনব না কেন?'

'আপনি গ্রামের ছেলে?'

'জ্বি। স্কুল কলেজ সবই গ্রামে। গ্রাম থেকেই বি.এ. পাস করেছি।'

'এখন কী করছেন?'

'কিছু করছি না। এম.এ. পড়ার শখ ছিল। টাকা পয়সা নেই। বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্টও ভাল হয় নি। এই রেজাল্টে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়াও সমস্যা।'

'আপনার রেজাল্ট কী?'

'সেকেন্ড ক্লাস তাও খুব নীচের দিকে। থার্ড ক্লাস হতে হতে হয় নি।'

'সিনেমার দলের সঙ্গে ঘুরছেন কেন?'

'আমি মঈন স্যারের কাছে গিয়েছিলাম একটা চাকরির জন্য। উনি বিখ্যাত মানুষ—উনার কত জানাশুনা, উনি একটু বলে দিলেই আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই আশায় যাওয়া। উনি বললেন— আমার সঙ্গে দুর্গাপুরে চল। চলে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'না, খুব ভাল করি নি। এক কাপড়ে চলে এসেছি।'

'এক কাপড়ে এলেন কেন?'

'স্যারকে চাকরির কথা বলতেই উনি বললেন, চল আমার সঙ্গে দুর্গাপুরে। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা। এই বলেই স্যার ঘর থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠলেন। উনি যে তখনই দুর্গাপুর যাচ্ছেন তাতো আমি জানি না। উনি জীপে উঠলেন, জীপের পেছনে ইউনিটের বাস। আমি বাসে উঠলাম।'

'দুর্গাপুরে পৌছে উনি আপনাকে কিছু বলেন নি ?'

'জ্বি–না। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে উনি বোধ হয় আমার কথা ভুলেই গেছেন। আমাকে হয়ত ইউনিটের কেউ ভাবছেন। আমি যে নিজ থেকে তাঁকে কিছু বলব সেই সাহসও আমার নেই। আমি উনাকে খুবই ভয় পাই।'

'সবাই ভয় পায়। আমিও ভয় পাই। আচ্ছা আপনিতো গাছ পালা খুব চেনেন। এই গাছগুলির নাম কী ? সাদা সাদা ফুল।'

'এই গাছের নাম দলকলস। ফুলে খুব মধু হয়। বাচ্চারা ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু খায়।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ সত্যি। খেয়ে দেখুন।'

সেলিম ভাই ফুল তুলে দিলেন। ঠোঁটে লাগিয়ে কীভাবে টানতে হয় দেখিয়ে দিলেন। আমি টান দিতেই সত্যি সত্যি মুখের ভেতর মধু চলে গেল। হালকা মিষ্টি মধু। আশ্চর্যতো।

'আরো মধু খাবেন ? ফুল তুলে দেব ?'

'দিন।'

সেলিম ভাই ফুল তুলছেন। আমি মুখে দিচ্ছি, টেনে টেনে মধু নিয়ে ফুল ফেলে দিচ্ছি— আমার খুবই মজা লাগছে।

'বকু! এই বকু!'

আমি তাকিয়ে দেখি মা ছুটতে ছুটতে আসছেন। সেলিম ভাইএর সঙ্গে আমাকে দেখে মা'র নিশ্চয়ই আত্মা কেঁপে গেছে। তিনি যে ভাবে ছুটছেন তা দেখে যে কেউ বলবে এই মাত্র তিনি কোন ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনেছেন। আমার হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছে হল মা'কে আরো ঘাবড়ে দি। সেলিম ভাইকে কী বলব, সেলিম ভাই কিছু মনে করবেন না—আপনি ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে আমার হাতটা একটু ধরুন তো। হাতটা ধরবেন এবং হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন—আর কিচ্ছু লাগবে না। বললাম না, কারণ এই ঘটনায় মা যতটা না ঘাবড়াবেন তারচে বেশি ঘাবড়াবেন সেলিম ভাই।

থাক দরকার নেই। আমি মা'র দিকে তাকিয়ে আছি তিনি উন্মাদিনীর মতই ছুটে আসছেন। তিনি তাঁর ঝিনুক–কন্যাকে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ডালা বন্ধ করে দেবেন। অনেকক্ষণ ধরে মেয়ে ঝিনুকের বাইরে। আর সময় দেয়া যায় না।

আমি মা'র দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সেলিম ভাই বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দলকলস গাছের নামটা বলার জন্যে তাঁকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে না।

মা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাওয়ার মত করছেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ছুটে আসার ধকল কাটাচ্ছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা যা ছোটাছুটি কমিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু মা সহজ স্বাভাবিক ভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারেন না— তাঁকে কিশোরী মেয়েদের মত ছুটে যেতে হবে এবং ফলস্বরূপ অনেকক্ষণ ধরে খাবি খেতে হবে।

'বকু পানি খাব।'

'এইখানে পানি কোথায় পাবে ? তুমি অলিম্পিকের দৌড় দিলে ব্যাপার কী মা ? আচ্ছা থাক এখনি জবাব দিতে হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে নাও। বসবে ? ঘাসের উপর বসে পড়। শাড়ি নষ্ট হলে হবে।'

মা ঘাসের উপর বসে পড়লেন। আমি অপেক্ষা করছি কখন তিনি স্বাভাবিক হবেন।

'দারুণ এক ঘটনা বকু।'

'দারুণ ঘটনা শুনব, তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হোক।'

ঘটনা শুনলাম, আমার কাছে তেমন দারুণ কিছু মনে হল না। চন্ডিগড় গ্রামে হাফিজ আলি বলে এক যুবক আছে তার স্ত্রীর না-কি অদ্ভুত ক্ষমতা। যাকে যা বলে তাই হয়। সবাই এই মেয়েকে খুব মানে। মা বৌটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা করে সেখান থেকেই দৌড়তে দৌড়তে আসছেন।

'মা তোমার ধারণা বৌটার সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে ?'

'অবশ্যই আছে।'

'তোমাকে দেখে সে কী ভবিষ্যৎবাণী করল ? ফড়ফড় করে কি বলে দিল—একদিন আপনার কন্যা বাংলাদেশের এক নম্বর নায়িকা হবে ? তার এসি লাগানো গাড়ি থাকবে। গুলশানে বাড়ি থাকবে। বাড়িতে সুইমিং পুল থাকবে। সেই সুইমিং পুলে তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সাঁতার কাটবে।'

'সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করিস না বকু। বৌটার ক্ষমতা আসলেই অস্বাভাবিক। আমি ওদের বাড়িতে গেলাম। বৌটা দরজা ধরে দাঁড়াল।'

'দেখতে কেমন মা ?'

'দেখতে খারাপ না। সুন্দরই আছে। বয়স কমতো। কম বয়সের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য।'

'তোমাকে কী বলল ?'

'আমাকে দেখেই বলল, আপনার স্বামী দূর দেশে থাকেন। চিন্তা করবেন না উনি ফিরে আসবেন।'

'ভূয়া কথা। তোমার স্বামী দূর দেশে থাকে না, ঢাকা শহরেই থাকে, এবং সেই স্বামী কখনো ফিরে আসবে না।'

'তুই সব জেনে ফেলেছিস এই ভাবটা দূর করতো। এই দুনিয়ার তুই কিছুই জানিস না।'

'যা জেনেছি তাই আমার জন্যে যথেষ্ট। আর জানতে চাই না।'

'তুই আমার সঙ্গে চলতো বকুল। বৌটার কাছে তোকে নিয়ে যাই। দেখি বৌটা তোকে দেখে কী বলে।'

'আমি এইসব বিশ্বাস করি না মা। আমি মরে গেলেও ঐ মহিলা পীরের কাছে যাব না।'

'পীর না। খুব সাধারণ মেয়ে তবে খুব ক্ষমতা— কার মনের ভেতর কী আছে সব বলে দিতে পারে।'

'তাহলেতো আরো যাব না। আমার মনের ভেতর ভয়ংকর সব জিনিস আছে। এইসব জেনে ফেললে অসুবিধা আছে।'

'তোর মনের ভেতর কী আছে ?'

'তোমাকেতো মা আমি বলব না। আর যদি মনের ভুলে কোনদিন বলে ফেলি তুমি গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি এখনি মরতে চাই না। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। মা দেখ দেখ জীবন বাবুর চিল। আকাশে উড়ছে।'

'জীবন বাবুর চিল মানে ?'

'কবি জীবনানন্দ দাশের চিল—সোনালী ডানার চিল। কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাচ্ছে দেখেছ মা ?'

'তুই আমার সঙ্গে বৌটার কাছে যাবি না ?'

'না। এবং আমার একটা উপদেশ শোন মা, তুমিও যেও না। আগে ভাগে ভবিষ্যৎ জানা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার।'

'ভয়ংকর ব্যাপার কেন ?'

'তুমি বাবার সঙ্গে সুন্দর কিছু সময় কাটিয়েছ না ? তুমি যদি গোড়া থেকেই জানতে একদিন বাবা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তাহলে কি এত সুন্দর সময় কাটাতে পারতে ?'

'তুই বেশি জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছিস বকু। এত জ্ঞানী হওয়া ভাল না।'

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। আকাশে জীবনবাবুর চিল উড়ছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে চিলগুলি। হায় চিল, সোনালী ডানার চিল। এই ভিজে মেঘের দুপুরে......।

অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি—শত শত জোনাকি পোকা, জ্বলছে নিভছে। কী যে আশ্চর্য হচ্ছি। জোনাকি পোকা আগে দেখি নি তা না। অনেক দেখেছি। কিন্তু এত জোনাকি পোকা এক সঙ্গে কখনো দেখি নি। মনে হচ্ছে থোকায় থোকায় আলোর ফুল ফুটেছে। ফুলগুলি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। চঞ্চল অস্থির কিছু ফুল। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত দৃশ্যই না আছে।

আমার জীবনের প্রথম জোনাকি পোকা দেখার দৃশ্যটাও খুব অদ্ভুত ছিল। বাবা-মা'র সঙ্গে ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছি। রাতের ট্রেন। ট্রেনের বাতি হঠাৎ নিভে গেল। মা বিরক্ত হয়ে নানান কথা বলতে লাগলেন—"ছাতার এক দেশে ছাতার এক ট্রেন। এখন ডাকাত পড়বে জানা কথা"— এই সব। মায়ের কথা শুনে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি দরজা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে একদল ডাকাত ঢুকে পড়বে। ডাকাত ঢুকল না। কী ভাবে জানি একটা জোনাকি পোকা ঢুকে পড়ল। বাবা বললেন—রুমালী দেখ একটা জোনাকি পোকা। আমি অবাক হয়ে দেখছি কী সুন্দর আলো। এই জ্বলছে, এই নিভছে। বাবা বললেন—বেচারা জোনাকি একা একা ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছে কে জানে। আমারো মনে হল তাইতো—এর বন্ধু বান্ধব, সঙ্গী সাথী সব কোথায় পড়ে আছে। আর সে একা একা চলে যাচ্ছে। বাবা জোনাকি পোকাটা ধরে আমার হাতে দিয়ে বললেন—মুঠি বন্ধ করে ধরে থাক। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আলো আসবে। আমি মুঠি বন্ধ করে ধরে আছি। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। মা বললেন, বকু এখনই জোনাকি পোকা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দে। ফেলে দে বললাম।

আমি বললাম, কেন ?

মা চাপা গলায় বললেন, গাধা মেয়ে, জোনাকি পোকা ধরে রাখলে রাতে বিছানা ভিজানো রোগ হয়।

আমি বললাম, বিছানা ভিজানো রোগটা কী ?

মা আরো গলা নামিয়ে বললেন—প্রতি রাতে বিছানায় পেচ্ছাব করবি। গাধা মেয়ে। বিয়ের পরেও এই অভ্যাস যাবে না।

কী সর্বনাশের কথা। আমি জোনাকি পোকাটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম। সে যতক্ষণ উড়ে গেল আমি তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। যে হাতে পোকাটা ধরেছিলাম শুঁকে দেখি সেই হাতে কেমন অদ্ভুত দুর্বা ঘাসের গন্ধের মত গন্ধ।

'মিস রুমাল!'

আমি চমকে দেখি সোহরাব চাচা। তাঁর হাতে প্রকান্ড বড় একটা বালতি। ফিল্ম লাইনের সবকিছুই খানিকটা উদ্ভট। এত বড় বালতি আমি আগে দেখি নি।

'কী করছ গো মা ?'

'জোনাকি পোকা দেখছি চাচা।'

'জংলা জায়গা। জোনাকি-ফোনাকি কত কিছু দেখবে। চা কফি কিছু খাবে?'

'জ্বি না।'

'কিছু লাগলে বল— আমি বাজারে যাচ্ছি। পাপিয়া ম্যাডামের সবুজ কালির বল পয়েন্ট দরকার। এখন আমি সবুজ কালির বল পয়েন্ট কোথায় পাব কে জানে। নেত্রকোনা ছাড়া পাওয়া যাবে না।'

'নেত্রকোনা যাবেন ?'

'এখানে না পেলে যাব।'

'আমি পাপিয়া ম্যাডাম হলে আপনাকে একটা জিনিস দিতে বলতাম।'

'জিনিসটা কী ?'

'ফুলের মালার মত একটা জোনাকি পোকার মালা। মালা গলায় দিয়ে বসে থাকতাম— মালা জ্বলতো নিভতো।'

সোহরাব চাচা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা দেখি কী করা যায়। মৌমাছির মোম জোগাড় করতে পারলে জোনাকির মালা বানানো যাবে।

আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছিলাম চাচা। আপনাকে জোনাকির মালা বানাতে হবে না। আপনি ভারী বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বালতিটা রাখুন তারপর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করুন।

সোহরাব চাচা বালতি নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, বল কী গল্প শুনতে চাও।

তাঁর ভাবটা এ রকম যে— আমি যে গল্পই শুনতে চাই, তিনি সেই গল্পের রেকর্ড বাজিয়ে দেবেন।

'মহিলা পীরের গল্প বলুন।'

সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, মহিলা পীরটা কে?

'এই অঞ্চলে একজনের সন্ধান পাওয়া গেছে যে নিমিষের মধ্যে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে পারে।'

'ও আচ্ছা— হাফিজ আলির বৌ এর কথা বলছ?'

'বৌটাকে আপনি দেখেছেন?'

'না তাকে দেখি নি। হাফিজ আলিকে দেখেছি। সকালবেলা সে ছিলতো। কাঠ ফাড়াই করে দিল। ফাঁকিবাজের শেষ। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সারাদিনের জন্যে নিয়েছি। দুপুরের পর থেকে নেই।'

'তার বৌ যে ভবিষ্যৎ বলতে পারে এটা কি সত্যি!'

'আরে দূর দূর। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই এই জাতীয় খবর শুনবে। কারো এই ক্ষমতা, কারো সেই ক্ষমতা। সব বোগাস। আর মানুষের স্বভাব এরকম যে সে আসল জিনিস বিশ্বাস করে না। বোগাস জিনিস বিশ্বাস করে।'

'চাচা ঐ মহিলার কাছে কি আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'কেন?'

'গ্রামের অল্পবয়েসী একটা মেয়ে কোন কৌশলে মানুষকে ধোকা দেয় এটা আমার দেখার শখ।'

সোহরাব চাচা বালতি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন— তুমি তো ভাল পাগলী আছ। বারান্দায় মশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকো না। জংলি মশা। কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া ফ্যালেরিয়া বাঁধাবে। ঘরে চলে যাও। ঘরে ঘরে মসকুইটো কয়েল জ্বালিয়ে দিয়েছি।

আমি লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে চলে এলাম।

এমন কোন রাত হয় নি কিন্তু চারদিক কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের লোকরা মনে হয় সন্ধ্যা সাতটা বাজতেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কেমন অস্বস্থি লাগছে। গাড়ির হর্ণের শব্দ নেই, রিকশার শব্দ নেই। আমি বিছানায় উপুর হয়ে পড়লাম। ডাইরি লেখা যাক। পাপিয়া ম্যাডামের মত সবুজ কালির একটা বল পয়েন্ট আমার জন্যে আনতে বললে হত। ডাইরিতে ইন্টারেস্টিং কিছু কথা সবুজ কালিতে লিখতাম।

আমাদের আজ রান্না হতে দেরি হবে। রান্না কিছুক্ষণ আগে চড়ানো হয়েছে। পাপিয়া ম্যাডাম সন্ধ্যাবেলায় বলেছেন তাঁর খাসির মাংসের রেজালা খেতে ইচ্ছে করছে। বিরিসিরি থেকে খাসি কিনে আনা হয়েছে। এই মাত্র রান্না বসানো হল। আমাদের বাবুর্চির নাম কেয়ামত মিয়া। কেয়ামত কারো নাম হতে পারে?

শুরুতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল নামটার কোন সমস্যা আছে। একদিন জিজ্ঞেস করে দেখি আসলেই তাই। তাঁর নাম আসলে নেয়ামত। সবাই ঠাট্টা করে কেয়ামত ডাকতে ডাকতে এখন নাম হয়ে গেছে কেয়ামত। এখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কী, তিনি স্বাভাবিক গলায় বলেন— আমার নাম কেয়ামত, কেয়ামত মিয়া।

কেয়ামত মিয়া রান্না খুব ভাল করেন। অতি সামান্য জিনিস এত যত্ন করে রাঁধেন যে শুধু খেতেই ইচ্ছে করে। প্রতিদিনই একটা না একটা অদ্ভুত আইটেম থাকবে। আজ দুপুরে ছিল সজনে পাতা ভাজি। সজনে গাছের কচি পাতা প্রচুর পেয়াজ দিয়ে সামান্য টক দিয়ে এমন একটা বস্তু বানালেন যে সবাই একবার করে বলল— কেয়ামত মিয়া এই ভাজিটা রোজ করবে।

আমি নিজে ডাইরিতে লিখলাম, আজ আমরা নতুন একটা খাবার খেলাম সজনে পাতা ভাজি। খাবারটা এত ভাল হয়েছে যে আমার ধারণা এখন থেকে আমরা রোজই এই খাবার খাব। এবং যখন আমাদের শুটিং শেষ হবে তখন দেখা যাবে দুর্গাপুরের সব সজনে গাছ আমরা খেয়ে ফেলেছি। সজনে পাতা ভাজি রান্নার রেসিপি আমরা পেয়ে গেছি। পাপিয়া ম্যাডাম রেসিপি চেয়েছিলেন তাঁকে দেয়া হয়েছে, এবং ছোট ম্যাডাম হিসেবে আমাকেও দেয়া হয়েছে।

সজনে পাতা ভাজি

পেয়াজ দুই কাপ
রসুন আধা কাপ
তেতুলের রস আধা কাপ
কাচা মরিচ আধা কাপ
শুকনো মরিচ দশটা
সজনে পাতা এক গামলা

বসন্তের নতুন সজনে পাতা কুচি কুচি করে কেটে তেতুল পানিতে সারাদিন ডুবিয়ে রাখতে হবে। ভাজার আগমুহূর্তে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। লবণ পানিতে ধুয়ে কষ ফেলে দিতে হবে। এক কাপ পেয়াজ তেলে ভাজবে। পেয়াজ বাদামী বর্ণ হয়ে যাবার পর সজনে পাতা, এককাপ পেয়াজ কুচি এবং আধ কাপ রসুন কুচির তেলে ফেলে দিয়ে অল্প আঁচে ভাজতে হবে। সজনে পাতা তেল টেনে নেবার পর আরো আধ কাপ পানি দিয়ে দমে বসিয়ে দিতে হবে। পরিবেশনের আগে মুচমুচে করে ভাজা শুকনো মরিচ খাবারের উপর দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাতের সঙ্গে সজনে পাতা ভাজি অতি উপাদেয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই রেসিপিটা মিথ্যা রেসিপি। সোহরাব চাচা বিকেলে আমাকে এসে বললেন— মিস রুমাল আমাকে একটু সাহায্য করতো— একটা কাগজে সজনে পাতা ভাজির রেসিপি লিখে দাও। পাপিয়া ম্যাডাম বড় যন্ত্রণায় ফেললেন— কিছু একটা রান্না হলেই রেসিপি।

আমি বললাম, কীভাবে রান্না হয় আপনি বলুন, আমি লিখে দিচ্ছি।

'বানিয়ে বানিয়ে একটা কিছু লিখে দাওতো। তোমার কি ধারণা রেসিপি দেখে উনি জীবনে কখনো রান্না করবেন?'

'রান্না না করলে চাচ্ছেন কেন?'

'কেন চাচ্ছেন তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। মা লক্ষী তুমি সুন্দর করে একটা রেসিপি লিখে দাও।'

'যা ইচ্ছা লিখে ফেলব?'

'লিখে ফেল।'

আমি রান্নার বইয়ের মত করে রেসিপি লিখে ফেললাম। যখন লিখছি তখন ঘাড়ের উপর মা ঝুঁকে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন— বকু কী লিখছিস। ডাইরি? আমাকে কোন কিছু লিখতে দেখলেই মা উদ্বিগ্নবোধ করেন। ভাবেন নিষিদ্ধ কিছু বোধ হয় লিখছি।

আমি দু'হাতে লেখাটা ঢেকে বললাম, আমার যা মনে আসছে লিখছি তুমি পড়বে না।

'উপুর হয়ে লেখালেখি করবি নাতো— ফিগার খারাপ হয়ে যায়।'

'প্লীজ তুমি যাওতো মা।'

মা মুখ কালো করে চলে গেলেন। তবে তাঁর মন পড়ে রইল ডাইরিতে। না জানি তার কন্যা কী গোপন কথা লিখে ফেলেছে। এই গোপন কথা জানার জন্যে মা কোন না কোন সময়ে তাঁর কন্যার ডাইরি পড়বেন। আমার ধারণা আজ রাতেই এই কাজটা করবেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর চাবি দিয়ে আমার স্যুটকেস খুলে অতি দ্রুত পড়ে ফেলবেন। উত্তেজনায় এই সময় তাঁর নাক ঘামতে থাকবে। কান্ডটা করে তিনি যেন একটা শক পান সেই ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দলকলস গাছ প্রসঙ্গে লিখতে লিখতে এক ফাঁকে কিছু নিষিদ্ধ গোপন কথা জুড়ে দিয়েছি। তার একটা লাইন খুব ভাল করে কাটা যাতে মা কিছুতেই

সেই লাইনের পাঠোদ্ধার করতে না পারেন। মা জানবেন না কী লেখা হয়েছিল, ছটফট করতে থাকবেন। আমি লিখেছি—

দলকলস মধু

> আজ ভোমরার মত ফুল থেকে মধু খেয়েছি। দুপুরের দিকে একা একা হাঁটছিলাম তখন সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। খুব চমৎকার একজন মানুষ। হ্যান্ডসাম, বুদ্ধিমান। আমরা দু'জন অনেক গল্প করলাম। উনিই গল্প করলেন, আমি শুধু শুনে গেলাম। উনি আবার গাছপালা খুব ভাল চেনেন। আমাকে স্বর্ণলতা চিনিয়ে দিলেন— তারপর চিনিয়ে দিলেন দলকলস গাছ। এই গাছ থেকে কীভাবে মধু পান করতে হয় তাও শেখালেন। তারপর নিজেই একগাদা ফুল এনে দিলেন। আমি ফুল থেকে মধু খাচ্ছি উনি হঠাৎ বললেন— এই রুমালী তোমাকে ঠিক ভোমরার মত লাগছে। ভোমরা যেমন ফুলের মধু খায় তুমিও খাচ্ছ—তাই। উনি আমাকে রুমালী ডাকেন। তবে সবার সামনে না, আড়ালে। সবার সামনে আমাকে বকুল বলেন এবং আপনি করে ডাকেন। আমি তাঁকে বলেছি— সবার সামনে আমাকে আপনি বলার দরকার কী ? আমিতো সিনিয়ার কোন ম্যাডাম না, আমার বয়স মাত্র সতেরো। উনি বললেন, আঠারো হোক তখন সবার সামনে তুমি বলব। কে জানে এই কথাটার মানে কী ? আমি বড়দের সব কথা বুঝতে পারি না। দেখি একবার কায়দা করে মা'কে জিজ্ঞেস করব। মাকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। তিনি অনেক কিছু সন্দেহ করবেন।

এইটুক লিখে আরো দু'টা লাইন লিখে খুব ভালমত কালি দিয়ে কেটে দিয়েছি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি পড়ার পর মা'র ঘাম দিয়ে জ্বর এসে যাবে। বুক ধড়ফড় করতে থাকবে। এমনও হতে পারে তাঁর জিবের নীচে এনজিস্টও দিতে হতে পারে। আমি চাচ্ছি আজ রাতেই মা ডাইরিটা পড়ুক। কাজেই আমি আজ যা করব তা হচ্ছে ডাইরিটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রাখতে ভুলে যাব।

মা এখন কফি খাচ্ছেন এবং আড়ে আড়ে আমাকে দেখছেন। কফি নিশ্চয়ই পাপিয়া ম্যাডামের জন্যে বানানো হয়েছিল। রাতের খাবারের দেরি হবে সে জন্যেই কফি। খবর পেয়ে মা নিজের কন্যার জন্যে নিয়ে এসেছেন। আমি যেহেতু কফি খাই না—তিনি নিজেই চুকচুক করে খাচ্ছেন। ইউনিটে কোন একটা খাবার রান্না হলে— মা তা খাবেন না— তা কখনো হবে না। মা কফি খেতে খেতে জালালের মা'র সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন।

জালালের মা একজন এক্সট্রা। তিনি আমাদের ছবিতে কাজের বুয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন। রিটায়ার্ড পুলিশের বড় কর্তার বাসায় এই বুয়া ছোটবেলা থেকে আছে। ছুটি কাটাতে সবাই যখন এসেছে বুয়াকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জালালের মা রাতে আমাদের ঘরে থাকেন। আমরা সবাই থাকি দুর্গাপুর পি. ডাবলিউ. ডি. রেস্ট হাউসে। আমাদের ঘরে দু'টা খাট। একটা খাটে আমি আর মা—আরেকটা খাটে জালালের মা। রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, মা এবং জালালের মা সহজে ঘুমান না, তাদের গল্প চলতেই থাকে। ফিসফিস গুজগুজ। জালালের মা ছবির জগতের সব স্ক্যান্ডালের গল্প জানেন। বলার সময় এমন ভাবে বলেন যেন ঘটনাটা তার নিজের চোখের সামনে ঘটেছে। মা প্রতিটি গল্প খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনেন এবং প্রতিটি গল্পই বিশ্বাস করেন। অবিশ্বাস্য গল্পগুলিই বেশি বিশ্বাস করেন।

এখন যে গল্প হচ্ছে আমি তা শুনতে পাচ্ছি। যদিও গল্প ফিসফিস করে বলা হচ্ছে— আমার কান খুব পরিষ্কার। মশারা যদি কথা বলতে পারত তাহলে মশাদের গুনগুন কথাও শুনতে পেতাম।

' বুঝছেন আপা— টেকনাফে আউটডোর পড়ছে। চিত্রা প্রডাকশানের ছবি 'ডাকু সর্দার'। নায়িকা হলেন মহুয়া ম্যাডাম। ম্যাডামের প্রথম ছবি। প্রথম ছবি যখন করে তখন ম্যাডামদের মাথার ঠিক থাকে না। কী করে না করে নিজেও বুঝে না। মাথার মধ্যে থাকে ছবির জগতে যখন আছি তখন উল্টা পাল্টা কাজ করাই লাগবে। বুঝছেন আপা মনে হলে এখনো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়— ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

জালালের মা গলা আরো নিচু করে ফেলল। আমি দেখি মায়ের মুখ হা হয়ে গেছে চোখ বড় বড়। যেন এমন আনন্দময় গল্প তিনি কখনো শোনেন নি। তাঁর কর্ণ আজ স্বার্থক।

সন্ধ্যাবেলা ম্যাডাম চা খেতে গিয়েছেন, ব্লাউজের দু'টা হুক খোলা, ইচ্ছা করে খোলা। ব্লাউজের নীচে 'ইয়েও' নেই। গরম বেশি বলে পরেন নি। কারণ ছাড়াই ম্যাডামের হাহা হিহি হাসি। একেকবার হাসেন আর কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে যায়।

গল্পে বাধা পড়ল। সোহরাব চাচা এসে বললেন, মিস রুমাল— যাও স্যার ডাকছেন।

আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই মা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সোহরাব চাচা বললেন, ভাবী আপনার যাবার দরকার নেই। স্যার কালকের শুটিং কী হবে বুঝিয়ে দেবেন।

মা বললেন, সর্বনাশ, আমাকে থাকতেই হবে। বকু কিছু মনে রাখতে পারে না। আমাকেই সব মনে রাখতে হবে।

'আসুন তা হলে। দেরি করবেন না।'

মা বললেন, দেরি হবে না। এখনই আসছি।

সোহরাব চাচা ঘর থেকে বের হতেই মা বললেন, বকু চুল আচড়ে চট করে কপালে একটা টিপ দিয়ে নে।

আমি বললাম, আমিতো শুটিং এ যাচ্ছি না মা। স্ক্রীপ্ট বুঝতে যাচ্ছি।

'ফকিরনীর মত যাবি ? উনি কী ভাববেন ?'

'সেজেগুজে গেলেই তো অনেক কিছু ভাবার কথা।'

'তার মানে ?'

'উনি ভাবতে পারেন আমি তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে চাচ্ছি। তাঁকে ভুলাতে চাচ্ছি।'

মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জালালের মা যেখানে বসেছিলেন সেদিকে তাকালেন। কিছুটা স্বস্তি পেলেন। জালালের মা নেই। সোহরাব চাচাকে ঢুকতে দেখেই তিনি চলে গেছেন। এই মহিলা সোহরাব চাচাকে যমের মত ভয় করেন। মা বললেন, এ রকম কথা তুই কীভাবে বললি?

আমি বললাম, ভুলতো মা বলি নি। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার দিকে তোমার মঈন ভাইয়ের ঝোঁক আছে। দেখ না এখন পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে প্রেম করছেন।

'তুই এমন কুৎসিত কথা বলছিস কীভাবে!'

'প্রেম কুৎসিত হবে কেন মা ?'

' আর একটা কথা বলবি তো টেনে জিভ ছিঁড়ে ফেলব। বাঁদরামী যথেষ্ট করেছিস।'

আমি কথা বাড়ালাম না। চুল আঁচড়ালাম, কপালে টিপ দিলাম। মা অতি দ্রুত তাঁর শাড়ি পাল্টালেন। মুখে পাউডার দিলেন। ঠোঁটে লিপস্টিক দিলেন।

'এই বকু আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, খুব ভাল দেখাচ্ছে। উনি যদি তোমার প্রেমে পড়ে যান আমি মোটেও অবাক হব না। তোমাকে রাণীর প্রিয় সখীর মত দেখাচ্ছে।

মা আচমকা আমার গালে চড় বসালেন। তারপর বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন যেন কিছুই হয় নি।

ডিরেক্টর সাহেব তাঁর ঘরে একা বসে আছেন। পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছেন বলে তাকে প্রফেসর প্রফেসর লাগছে। তাঁর চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো মনে হয় কিছুক্ষণ আগে গোসল করে চুল টুল আঁচড়ে ভদ্র হয়েছেন। গা থেকে হালকা মিষ্টি গন্ধও আসছে। আফটার শেভ এর গন্ধ হতে পারে। মুখে মাখা ক্রীমের গন্ধ হতে পারে। আবার সাবান দিয়ে গোসল করা হলে সাবানের গন্ধও হতে পারে। আমার নাক কুকুরের নাকের মত— খুব তীক্ষ্ণ।

আজ তাঁকে অল্প বয়স্ক মনে হচ্ছে কারণ চুলে কলপও দিয়েছেন। চুলে কলপ দেয়া স্টেজে যারা চলে যান তাদের দেখতে খুব মজা লাগে। বুড়োটে ধরনের মানুষ হঠাৎ একদিন দেখা যায় কুচকুচে কালো চুলের একজন মানুষ। হাব ভাব যুবকের মত। এরা আবার রঙ চঙে সার্ট পরতেও ভালবাসে। চুলে যেমন কলপ লাগায়— মনেও খানিকটা লাগায়।

'বকুল এবং বকুল মাতা গেট সীটেড। বসে পড়ুন।'

আমরা সামনের খাটে বসলাম। মা বললেন, ভাই সাহেব কেমন আছেন ? ইস্‌ আপনার উপর খুব কাজের চাপ যাচ্ছে। আপনাকে দেখি আর অবাক হই। একটা মানুষ এত কাজ কীভাবে করে। আমি বকুলকে বলছিলাম— তোর চাচাকে দেখে শেখ, কর্মযোগী কাকে বলে। সকাল বিকাল দু'বেলা উনার পায়ের ধুলা নিয়ে কপালে ঘষবি এতে যদি কপালের উনিশ বিশ হয়। যে কপাল নিয়ে জন্মেছিস সে কপালে কিছু হবে না। তোর বাবা থেকেও নেই। এখন ওর মুরুব্বী বলতেও আপনি, বাবা বলতেও আপনি।

ডিরেক্টর সাহেব শান্ত ভঙ্গিতে শুনে যাচ্ছেন। উনি রাগ করছেন কি-না বুঝতে পারছি না। মনে হয় রাগ করছেন না। মা'র স্বভাব তিনি জেনে গেছেন। এই স্বভাবের মানুষের উপর রাগ করা যায় না। আমি ডিরেক্টর সাহেব হলে রাগ করতাম না। বরং মনে মনে হাসতাম।

মা কথা বলেই যাচ্ছেন। থামছেন না। "মা চুপ করতো"— বলে মা'কে আমি থামাতে পারি। ইচ্ছে করছে না। যার থামাবার সে থামাবে— আমার কী?

'মঈন ভাই আমার মেয়ের গলায় একটা গান কিন্তু আপনার ছবিতে রাখতে হবে। আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট। দুই লাইনের একটা গান হলেও তার গলায় রাখবেন। সবচে ভাল হয় নিজের গান সে যদি নিজে গায়। আপনি ওর গান শুনে দেখুন। যদি পছন্দ না হয় তখন প্লে ব্যাক সিঙ্গার নেবেন। ভাই আমার মেয়ের একটা গান আপনি শুনে দেখুন। পথহারা পাখি গানটা সে কী সুন্দর যে গায়। বকু, চাচাকে গানটা গেয়ে শোনা।'

ডিরেক্টর সাহেব হাসলেন। আমি ভদ্রলোকের ধৈর্য দেখে অবাক হলাম। ভদ্রলোকের হাসি দেখে মনে হতে পারে উনি এখনই বলবেন— বকুল শোনাও তোমার পথ হারা পাখি গান। আমি জানি তিনি তা করবেন না। আমার গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আমার গান এই ছবির জন্যে প্রয়োজন নেই। চিত্রনাট্যে কোথাও নেই দিলু গান করছে।

'মঈন ভাই— পান খাবেন ?'

'জ্বি না, পান খাব না। আপনার কন্যার গানও আজ শুনব না। অন্য একসময় শুনব।'

'কতক্ষণ আর লাগবে। ছোট গান, একটা মাত্র অন্তরা।'

'গান হচ্ছে মুডের ব্যাপার। আজ মুড নেই। কাল সকাল থেকে শুটিং হবে— আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে সেই বিষয়ে কিছু কথা বলি।'

মা হতাশ গলায় বললেন, জ্বি আচ্ছা বলুন। কিন্তু মঈন ভাই ওর গান কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে। মশলা খাবেন ? পানের মশলা ?

'না মশলাও খাব না। আপনি এক কাজ করুন— নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, কিংবা রান্না বান্না কেমন এগুচ্ছে একটু দেখুন। আমি একা আপনার কন্যার সঙ্গে কথা বলব।'

মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি অতি দ্রুত কিছু যুক্তি দাঁড়া করাবার চেষ্টা করছেন যে যুক্তিতে মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন। কোন যুক্তি তার মাথায় আসছে না। মা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আচ্ছা। মা বের হয়ে যাচ্ছেন— তাঁর হতাশ ভঙ্গিতে চলে যেতে দেখে আমার খারাপ লাগছে। ডিরেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই এমন কোন কথা বলবেন না যা আমার মায়ের সামনে বলা যায় না। তিনি থাকলে কোন ক্ষতি ছিল না। মা বেশি কথা বলেন তা ঠিক— মা'কে চুপ করে থাকতে বললেই তিনি চুপ করে যেতেন।

'বকুল।'

'জ্বি।'

'কেমন আছ তুমি বল।'

'ভাল আছি।'

'গ্রাম কেমন লাগছে ?'

'ভাল লাগছে।'

'চিত্রনাট্যটা কি মন দিয়ে পড়েছ ?'

'জ্বি।'

'চিত্রনাট্য তোমার কাছে কেমন লেগেছে ?'

'ভাল।'

'এই ছবি কি বাংলাদেশের মানুষ দেখবে ?'

'না।'

'না কেন ? ছবিতে নাচ-গান নেই এই জন্যে ?'

'ছবির গল্পটা খুব জটিল।'

'ছবির গল্প তোমার কাছে জটিল মনে হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'তোমার নিজের চরিত্রটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'দিলুকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'জ্বি হয়েছে।'

'তুমি কি দিলুর মত ?'

'না আমি দিলুর মত না।'

'এখন তুমি বল—দিলু কেমন ?'

'দিলু খুব নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে। একা একা থাকে। তার কিছুই ভাল লাগে না—খুব দুঃখী মেয়ে।'

'না ঠিক হল না। আর দশটা পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে যেমন দিলুও তেমন। দিলু আলাদা কেউ না। দিলুর শেষ পরিণতিটা খুব দুঃখময় বলে তুমি তাকে দুঃখী মেয়ে ভাবছ। সে সবার সঙ্গে হাসছে, খেলছে, গল্প করছে—ছুটি কাটাতে এসে মজা করছে। তারপর এক সময় তার জীবনে ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এমন একজনের প্রেমে পড়ে গেল যে বয়সে তারচে অনেক অনেক বড়। যাকে তার প্রেমের কথাটা সে বলতেও পারছে না। এইটাই তার সমস্যা। এর বাইরে তার কোন সমস্যা নেই। ঠিক বলছি ?'

'জ্বি।'

'দিলু মেয়েটার যে সহজ স্বাভাবিক জগৎ ছিল, প্রেমে পড়ার পর তার সেই জগৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। তাই না ?'

'জ্বি।'

'বকুল তুমি কি কখনো প্রেমে পড়েছ ?'

'জ্বি না।'

'প্রেমে পড়লে আমাদের জন্যে সুবিধা হত। তোমার জন্যেও অভিনয় করতে সুবিধা হত।'

ডিরেক্টর সাহেব মিটিমিটি হাসছেন। কেন হাসছেন আমি বুঝতে পারছি না। তিনি সিগারেট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলবেন, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি সিগারেট ফেললেন না। সহজ ভঙ্গিতে টেনে যেতে লাগলেন। সম্ভবত আজ তিনি আর সিগারেট ফেলবেন না। মনে হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাঁর কর্মকান্ড নির্ভর করে। তাঁকে এখন কেউ দেখছে না— তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে নেই কাজেই তিনি সিগারেট ফেলছেন না।

'বকুল।'

'জ্বি স্যার।'

'মেয়েটা এমন বয়স্ক একজন মানুষের প্রেমে কেন পড়ল?'

'জানি না। চিত্রনাট্যে সেটা উল্লেখ করা হয় নি।'

'তোমার কী ধারণা সেটা বল?'

'আমার কোন ধারণা নেই।'

' বয়োসন্ধির পর মেয়েরা হঠাৎ খানিকটা অসহায় বোধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে লতা ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে ....

'লতা ধর্মটা কী?'

'লতা ধর্ম হচ্ছে— লতানো গাছের ধর্ম। লতানো গাছ কী করে? আশে পাশে শক্ত কোন গাছের খোঁজ করে। পনেরো-ষোল বছরের মেয়েদের মধ্যে লতা ধর্ম যখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়, প্রেমটা তখনি আসে। কার প্রেমে পড়ল, তখন সে আর ভেবে দেখে না।'

আমি হেসে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলাম। প্রেম সম্পর্কে এমন সহজ ব্যাখ্যা এর আগে কেউ বোধ হয় দেয় নি।

'হাসছ কেন?'

'এম্নি হাসছি।'

'আমার ব্যাখ্যা খুব বেশি সরল বলে হাসছ? যে ব্যাপারটা বাইরে থেকে যত জটিল মনে হয় তার ব্যাখ্যা কিন্তু তত সহজ। পনেরো ষোল বছরের মেয়েরা কাদের প্রেমে পড়ছে সেই স্ট্যাটিসটিকস যদি নাও তাহলে অনেক মজার ব্যাপার দেখবে। এই সময়ে তারা যাদের সংস্পর্শে আসছে তাদেরই প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট মাস্টারের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে কারণ সে তাকে পড়াতে আসছে। গানের মাস্টারের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে, তার সঙ্গে তার যোগাযোগ হচ্ছে। বড় ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে প্রেম হচ্ছে। এমন কি বাবার বন্ধুর সঙ্গেও প্রেম হচ্ছে। কারণ বাবার বন্ধু মাঝে মাঝে বাসায় আসেন। তার সঙ্গে কথা হয়। সেই সময়কার প্রেমটা অন্য রকম। হিসাব নিকাশের বাইরের প্রেম।'

আমি কিছু বলব না, বলব না করেও বলে ফেললাম— হিসাব নিকাশের বাইরের প্রেম মানে কী ?

'প্রেমের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা মানেই হিসাব নিকাশ। পরিণতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছাড়া প্রেম মানে হিসাব নিকাশহীন প্রেম। বুঝতে পারছ ?'

'না।'

'না বোঝার মত কিছু না। আমাদের ছবির মেয়ে দিলুর প্রেম হিসাব নিকাশ হীন প্রেম। প্রেমের পরিণতি নিয়ে সে কখনো ভাবে নি। সে অন্ধের মত প্রেমে পড়েছে।'

'পরিণতি নিয়ে না ভাবলে সে আত্মহত্যা করে কেন ?'

'আত্মহত্যাটাও তার প্রেমেরই একটা অংশ। সে তার আবেগের তীব্রতাটা সবাইকে দেখাতে গিয়ে এই কান্ডটা করেছে। এই বয়সের প্রেমে একটা দেখানোর ব্যাপারও থাকে। দেখ আমি কী করে ফেললাম এই ভাব।'

আমি বললাম, স্যার আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কী মনে হচ্ছে ?

'আমার মনে হয়— মেয়েটা হঠাৎ তার নিজের ভেতরের প্রেম ভাল মত লক্ষ্য করে। তার তীব্রতা দেখে সে হকচকিয়ে যায়। সে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।'

তিনি একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসলেন। প্রশ্রয়ের হাসি। ছোট বাচ্চারা হঠাৎ জ্ঞানীর মত কথা বলে উঠলে বড়রা যেমন হাসে তেমন হাসি। তবে আমার কথার তেমন গুরুত্ব দিলেন না।

'বকুল !'

'জ্বি স্যার।'

'চিত্রনাট্যর কোন অংশটা তোমার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়েছে ?'

'দিলু যে মাঝে মাঝে খুব সুন্দর করে সাজে তারপর পুকুরের কাছে যায়। পুকুরের জলে নিজেকে দেখে এবং নিজের সঙ্গে কথা বলে এই দৃশ্যটা।'

'সেই দৃশ্যটা আমরা কাল করব। এই দৃশ্য দিয়ে শুরু। তুমি দৃশ্যগুলি আজ রাতে খুব ভাল মত পড়বে। শোবার আগে ভাববে। আমি দৃশ্যগুলি কী ভাবে নেব ভেবে রেখেছি— তোমার মাথায় যদি কিছু থাকে তাও আমাকে বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা'।

'এই ছবির আসল নায়িকা কে তুমি কি জান ?'

'জানি, দিলু।'

'হ্যাঁ এই কিশোরী মেয়েটিই ছবির নায়িকা। পাপিয়া ব্যাপারটা জানে না। তার ধারণা সেই ছবির নায়িকা। তাকে সে রকম বলাও হয়েছে। চিত্রনাট্য সে পড়ে নি। তাকে চিত্রনাট্য পড়তেও দেই নি। চিত্রনাট্য পড়লে সে খুব হৈ চৈ করত। আচ্ছা তুমি যাও —'

তিনি যাও বললেন কিন্তু আমি আগের জায়গাতেই বসে রইলাম। আমার কেন জানি উঠতে ইচ্ছা করছে না। তিনি বললেন— কিছু বলবে ?

'জ্বি না।'

তিনি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তাঁকে হঠাৎ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি অন্য কিছু ভাবছেন। আমি যে তাঁর সামনে বসে আছি তা আর তাঁর মনে নেই। ঘরে মসকুইটো কয়েল জ্বলছে। ধোঁয়ায় নাক জ্বালা করছে।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'আচ্ছা দেখি তোমার বুদ্ধি।'

তিনি নড়েচড়ে বসলেন এবং হাসি মুখে তাকালেন। তাঁর চোখে চাপা আনন্দ। ম্যাজিশিয়ান মজাদার কিছু করার আগে মনে হয় এই ভাবেই দর্শকদের দিকে তাকায়।

'গল্পটা মন দিয়ে শোন—একটা হাতি এবং একটা পিঁপড়ার গল্প। একটা পিঁপড়া মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল। একটা হাতি আসছিল উল্টা দিক থেকে। পিঁপড়া ব্যালেন্স হারিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে হাতির গায়ে পড়ল। বিরাট এ্যাকসিডেন্ট। মজার ব্যাপার হচ্ছে এ্যাকসিডেন্টে পিঁপড়ার কিছু হল না—শুধু হাতিটা আহত হল। এখন বল কেন এ্যাকসিডেন্টে পিঁপড়ার কিছু হল না ?'

আমি বললাম, জানি না।

'খুব সহজ উত্তর। পিঁপড়াটার মাথায় হেলমেট পরা ছিল। পিঁপড়া ছোট প্রাণী হলেও, ট্রাফিক রুল মেনে চলে। হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল নিয়ে বের হয় না।'

আমি ভেবেছিলাম জবাবটা দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাব মত হো হো করে হাসবেন। তিনি হাসলেন না বরং খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—

আহত হাতিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। দেখা গেল আহত হাতি এবং পিঁপড়া পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে।

এখন তুমি বল— পিঁপড়াটারতো কিছু হয় নি। সে কেন হাতির বেডের পাশে শুয়ে আছে?

'জানি না।'

'পিঁপড়া শুয়ে আছে কারণ পিঁপাড়াটা হাতিকে রক্ত দিচ্ছিল। তাদের দুজনের একই গ্রুপের রক্ত ' ও পজিটিভ '।'

তিনি এবারে গলা খুলে হাসছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছেলেমানুষি হাসি দেখছি। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে— তাঁর হাসি আমার শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আমার শরীর ঝমঝম করছে। শরীরের ভেতরটা কাঁপছে। আমার ইচ্ছা করছে ছুটে চলে যাই। কিন্তু উঠতে পারছি না। এমন সময় সোহরাব চাচা ঢুকলেন। ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন— আমি নেত্রকোনা যাচ্ছি। আপনার কিছু লাগবে?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, নেত্রকোনায় এক ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায় নাম হচ্ছে বালিস। মিষ্টিটার শুধু নাম শুনেছি কখনো খেয়ে দেখি নি। যদি পাও নিয়ে এসো।

'রান্নাও হয়েছে, খাবার দিতে বলি?'

ডিরেক্টর সাহেব বললেন— দিতে বল। পাপিয়াকে জিজ্ঞেস কর— সে কি সবার সঙ্গে খাবে, না তার খাবার আলাদা দেয়া হবে?

'ম্যাডাম বলেছেন উনি রাতে কিছু খাবেন না।'

'সেকী?'

'ম্যাডাম খেতে চেয়েছেন বলেই খাসি কিনে এনে রেজালা করা হয়েছে। পোলাও এর চালের ভাত করা হয়েছে। স্যার আপনি একটু বলে দেখবেন?'

'খাবে না কেন কিছু বলেছে?'

'উনার নাকি শরীর ভাল না। উনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন।'

'ভাল যন্ত্রণা হল দেখি।'

'ফরহাদ সাহেবও এখনো এসে পৌঁছালেন না। উনাকে ছাড়া শুটিং শুরু হবে কীভাবে? কাউকে কি পাঠিয়ে দেব? রাতে খেয়ে গাড়ি নিয়ে ঢাকা চলে যাবে— উনাকে নিয়ে চলে আসবে।'

'না।'

ডিরেক্টর সাহেব চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেলেন। কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে তিনি পাপিয়া ম্যাডামের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। আমার কেন জানি খুব ইচ্ছা করছে পাপিয়া ম্যাডামের রাগ কীভাবে ভাঙ্গানো হয় সেই দৃশ্য দেখি। ডিরেক্টর সাহেবের পেছনে পেছনে যাই।

সোহরাব চাচা বললেন, মিস রুমাল চল খেতে চল। আমি বললাম, চলুন।

মা নিশ্চয়ই মুখ গম্ভীর করে তাঁর ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি যাওয়া মাত্র ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার কী কী কথা হল সব শুনবেন। কোন কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। কোন কোন জায়গা দু'বার তিনবার করেও শুনাতে হবে। মা'র সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি সোহরাব চাচার সঙ্গে সরাসরি ডাইনিং রুমে চলে গেলাম।

খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। গণ খাবারের কায়দা কানুন অন্য রকম— প্লেট হাতে যেতে হয় বাবুর্চির কাছে। বাবুর্চি তার লোকজন নিয়ে বসে থাকেন। তাঁর সামনে বিরাট বিরাট ডেকচিতে ভাত, তরকারি, ভাজি, সালাদ। বড় বড় চামুচে প্লেটের উপর খাবার তুলে দেয়া হয়। থালা উপচে আগুন গরম খাবার পড়ে যেতে থাকে। সেই খাবার গবাগব করে খাওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটায় পিকনিক পিকনিক ভাব থাকে। আমার খুব ভাল লাগে।

ডাইনিং রুমে সবাই আছেন— শুধু মা আর জালালের মা নেই। মা নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন— আর জালালের মা, মা'কে এই ফাঁকে কয়েকটা ভয়ংকর টাইপ গল্প শুনিয়ে ফেলছে। আমাদের এই ডিরেক্টর সাহেবকে নিয়েও অনেক গল্প নিশ্চয়ই জালালের মা জানেন। তার কাছ থেকে কিছু গল্প শুনতে হবে। মা'কে না জানিয়ে শুনতে হবে।

তরকারির রঙ খুব সুন্দর হয়েছে। আমি প্লেট হাতে খাবার নিয়ে নিলাম। ধোঁয়া ওঠা পোলাওয়ের চালের ভাত— সুন্দর গন্ধ আসছে ভাত থেকে। খাসির গোসতের রেজালা। রেজালা দেখেই বোঝা যাচ্ছে— খেতে খুব ভাল হবে। পাপিয়া ম্যাডাম যদি খেতেন, রেজালার রেসিপি চাইতেন।

কেয়ামত ভাই হাসি মুখে বললেন— আপা, মা কই ?

আমি বললাম, মা আসবে। আমার খুব ক্ষিধে লেগেছে আমি আগে খেয়ে নেব!

'আজ এক তরকারির খানা। সালাদ নেন।'

'না সালাদ নেব না।'

ডাইনিং রুমে চেয়ার টেবিল আছে। চেয়ার টেবিলে সবার জায়গা হয় না। অলিখিত নিয়ম হচ্ছে শিল্পীরা চেয়ার টেবিলে বসবেন— বাকিরা প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে খাবেন— বুফে সিস্টেম। তবে আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এই দেখা যায় তিনি চেয়ার টেবিলে বসেছেন— আবার দেখা যায় দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। একবার দেখি ফকিরদের মত মাটিতে ল্যাপচা মেরে বসে খাচ্ছেন। সোহরাব চাচা কোত্থেকে পুরানো খবরের কাগজ এনে বললেন— স্যার এর উপর বসুন। তিনি বললেন— লাগবে না। লাগবে না। সোনার বাংলার স্বর্ণ

ধুলি গায়ে মেখে নিচ্ছি। তাঁর এই কথায় আসে পাশের সবাই হাসল। ডিরেক্টর সাহেব যাই বলেন তাতেই মজা পেয়ে সবাই হাসে। তিনি রসিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। আমার নিজের ধারণা তিনি পদাধিকার বলে রসিক। ডিরেক্টর না হয়ে তিনি যদি ক্যামেরা ম্যানের এসিসটেন্ট হতেন তাহলে তাঁর রসিকতায় কেউ হাসত না। বরং তাঁর কাজ কর্মে সবাই বিরক্ত হত।

আমি প্লেট নিয়ে খাবার টেবিলের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি ঘরের এক কোণায় সেলিম ভাই দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে খাবারের প্লেট। তিনি মাথা নিচু করে খাচ্ছেন। আজ তাঁর গায়ে পাঞ্জাবি। তিনি একটামাত্র সার্ট প্যান্ট নিয়ে এসেছিলেন আজ পাঞ্জাবি পেলেন কোথায় ? আমি হাসিমুখে ডাকলাম— সেলিম ভাই।

তিনি এমন ভাবে চমকে উঠলেন যে আরেকটু হলে হাত থেকে প্লেট পড়ে গিয়ে বিশ্রী কান্ড হত। নায়িকার হাত থেকে প্লেট পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া মজার ব্যাপার। সবাই তাতে মজা পায়। প্রোডাকশান ম্যানেজার আনন্দে হেসে ফেলেন। এক্সট্রা মেয়ের হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে সবাই কটমট করে তাকায়। প্রোডাকশান ম্যানেজার চাপা গলায় ধমক দেন। ধমক চাপা গলায় হলেও সবার কানে যায়। আমি হাসি মুখে ডাকলাম, সেলিম ভাই এদিকে আসুন। প্লেট হাতে সেলিম ভাই বিব্রত ভঙ্গিতে আসছেন। তাঁর অস্বস্তি দেখে মনে হচ্ছে— বেচারাকে না ডাকলেই হত। নিজের মনে আরাম করে খেতে পারতেন।

'বসুন। আসুন আমরা গল্প করতে করতে খাই।'

সেলিম ভাই অসহায় ভাবে চারদিকে একবার দেখলেন। আমার পাশে বসে খাওয়াটা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বসলেন আমার পাশে। সব দ্বিধা অবশ্যি ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। তাঁর চোখে খানিকটা মুখে লেগে রইল।

'সেলিম ভাই কেমন আছেন ?'

'ভাল।'

'কী রকম ভাল ? অল্প ভাল না অনেক খানি ভাল ?'

'অল্প ভাল।'

'এক বস্ত্রে এসেছিলেন— আজ দেখি গায়ে পাঞ্জাবি।'

'সার্ট প্যান্ট ধুয়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেছেন। ডিরেক্টর সাহেব কী জানেন যে আপনি তাঁর কথামত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন ?'

'জ্বি। আগে মনে করেছিলাম কিছু জানেন না। এখন বুঝেছি জানেন।'

'কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে ?'

'জ্বি।'

'কখন কথা হল ?'

'আজ সন্ধ্যায় ।'

'কী কথা হল ?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেলিম ভাই বিব্রত স্বরে বললেন, আমি একটা বিরাট ঝামেলায় পড়েছি।

'কী ঝামেলা ?'

'আপনাকে আমি বলব।'

'বলুন শুনি।'

'এখন বলব না। এখানে অনেক লোকজন।'

'কখন বলবেন ?'

'আজই বলব। আমি মস্তবড় একটা ঝামেলায় পড়েছি। জীবনে এতবড় ঝামেলায় পড়ি নি।'

'খুব চিন্তিত ?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে— আপনার ঝামেলার কথা শুনব— এখন চুপচাপ খেয়ে যান। খাবারটা ভাল হয়েছে না!'

'জ্বি হয়েছে।'

'রেসিপি লাগবে ? লাগলে বলুন।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

আমি হেসে ফেললাম— আর তখনি মা ঢুকলেন। তিনি আমাকে খেতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমার পাশে সেলিম ভাইকে দেখে তাঁর মাথায় প্রায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা হল। তিনি নিশ্চয়ই এর মধ্যেই আমার ডাইরি পড়ে ফেলেছেন। দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে বসে আছেন। মা খাবার নিয়ে আমার দিকে আসছেন। আমার কাছে তিনি বসতে পারবেন না, কোন চেয়ার খালি নেই। তাঁকে অনেকটা দূরে বসতে হবে। তবে তিনি অন্য একটা কাজও করতে পারেন— হয়ত সেলিম ভাই এর কাছে এসে বলবেন, এই শোন তোমার নাম যেন কী ? তুমি ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোস।

মা সামাজিক অবস্থান মাথায় রেখে তুমি আপনি বলেন। তিনি তাঁর রাডারের মত চোখ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে ফেলেন মানুষটার সামাজিক অবস্থান কী। তখন তুমি আপনি নির্ধারিত হয়ে যায়। সেলিম ভাইকে তিনি শুরু

থেকেই তুমি বলছেন। শুধু যে তুমি বলছেন তাই না— ছোট খাট কাজকর্মও তাকে দিয়ে করাচ্ছেন। গতকাল সকালেই তিনি সেলিম ভাইকে ডেকে বললেন— এই যে ছেলে শোন, আমার জন্যে একটা হাত পাখা নিয়ে এসো। প্রোডাকশানের কাউকে বললেই হাত পাখা দিয়ে দেবে।

মা আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই সেলিম ভাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি বসুন।

মা বিনাবাক্যব্যয়ে বসে পড়লেন। সেলিম ভাই প্লেট হাতে আগের জায়গায় চলে গেলেন। মনে হল তিনি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন।

মা রাগে কাঁপছেন। আমি তাঁর রাগ টের পাচ্ছি। রাগের প্রকাশ কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না। ঘটনাটা বাসায় ঘটলে প্লেট ছুঁড়ে মারতেন আমার দিকে। আমার শরীর রেজালার ঝোলে মাখামাখি হয়ে যেত। প্লেটের কোণা লেগে কপাল কেটে রক্ত পড়ত। এখানে এ জাতীয় কিছু করা সম্ভব না। মা কাঁপা গলায় প্রায় ফিস ফিস করে বললেন— মঈন ভাইয়ের সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন?'

'প্রেম কত প্রকার ও কী কী উদাহারণ সহ ব্যাখ্যা করলেন।'

মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। আমি সহজ ভঙ্গিতে ভাত মাখতে মাখতে বললাম— উনিতো প্রেম বিশারদ। প্রেমের সব কিছু তিনি জানেন।'

'ফাজলামি করছিস কেন?'

'ফাজলামি করছি না, যা সত্যি তাই বললাম।'

'আমি তোর জন্যে বসে আছি— তুই আমাকে না নিয়ে একা একা খেতে চলে এলি কী মনে করে?'

'ক্ষিধে লেগেছিল চলে এসেছি।'

'তোর হয়েছে কী?'

'কিছু হয় নি।'

'এই গাধাটা তোর সঙ্গে খাচ্ছে কেন?'

'আমি ডেকে এনেছি বলে আমার সঙ্গে বসে খাচ্ছিলেন। কারো সঙ্গে গল্প না করে আমি খেতে পারি না।'

'গাধাটার সঙ্গে কী গল্প করছিলি?'

'বার বার উনাকে গাধা বলছ কেন?'

'যে গাধা আমি তাকে কী বলব? হাতি বলব?'

'মা তুমি খাচ্ছ না। খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে তুমি খেয়ে মজা পাবে না। খাসির রেজালাটা খুব ভাল হয়েছে। খাঁটি সরিষার তেলে রান্না হয়েছেতো এই জন্যে। খেয়ে তোমার যদি ভাল লাগে আমাকে বলবে— আমি রেসিপি দিয়ে দেব।'

মা আগুন চোখে তাকাচ্ছেন। আমি তাকিয়ে আছি হাসি মুখে। আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। মা কিছুক্ষণ থাকুক একা একা। রেগে অস্থির হোক। রেগে অস্থির হয়ে এক সময় মা ড্রাগনের মত হয়ে যাবে— তার নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হতে থাকবে। সেই পর্যায়ে আসুক তখন ঠান্ডা পানি ঢেলে মা'র রাগ কমানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

'বকুল!'

'হুঁ।'

'মঈন ভাইয়ের সঙ্গে তোর কী কী কথা হয়েছে বল। কোন কিছু বাদ দিবি না।'

'হাতি এবং পিঁপড়া সম্পর্কে অনেক কথা বললেন।'

'হাতি এবং পিঁপড়া মানে?'

'একটা হাতি এবং পিঁপড়া ছিল— তাদের হচ্ছে একই ব্লাড গ্রুপ, ও পজিটিভ।'

'তোকে এখন আমি সবার সামনে চড় মারব।'

'হাত ধুয়ে তারপর চড় মার মা। নয়ত গালে ঝোল লেগে যাবে।'

মা তাকিয়ে আছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং মা'র চোখের সামনেই সেলিম ভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মা'কে দেখিয়ে দেখিয়ে সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করব। মা'কে আমি আজ ড্রাগন বানিয়ে ফেলব।

সেলিম ভাই আমাকে দেখে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকালেন। মা যেমন আমার কান্ডকারখানা বুঝতে পারছেন না, মনে হয় তিনিও পারছেন না।

'সেলিম ভাই!'

'জ্বি।'

'আপনি বলেছেন—আপনি ভয়ংকর বিপদে পড়েছেন। আমার ধারণা আমি বুঝতে পারছি আপনার বিপদটা কী?'

'বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা ডিরেক্টর সাহেব আপনাকে ডেকে বলেছেন— সেলিম তুমি মন দিয়ে আমার কথা শোন, ফরহাদ সাহেবের যে চরিত্রটি করার কথা ছিল— সেই চরিত্রটা তুমি করবে। কাল তোমার শুটিং।'

সেলিম ভাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ বড় করা দেখেই বুঝতে পারছি আমার অনুমান সত্যি। তবে এই অনুমান করার জন্যে শার্লক হোমস বা মিসির আলি হবার দরকার নেই। সাধারণ বুদ্ধি যার আছে সেই এই অনুমান করবে। আগামীকাল শুটিং শুরু হচ্ছে অথচ ফরহাদ সাহেব আসেন নি। সেলিম নামের এই মানুষটিকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেবের মাথায় কোন একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি কিছু করেন না। সাব্বিরের চরিত্রে সেলিম ভাইকে খুব মানাবে। ডিরেক্টর সাহেব স্ট্যান্ডবাই হিসেবেই সেলিম ভাইকে নিয়ে এসেছেন।

আমি বললাম, আমার কথা কি ঠিক হয়েছে সেলিম ভাই ?

'হুঁ।'

'খুব ভয় লাগছে ?'

'হুঁ।'

'ভয় লাগছে কেন ?'

'আমি আমার জীবনে কখনো অভিনয় করি নি। স্কুলে কলেজে কোথাও না।'

'আপনি কখনো অভিনয় করেন নি ?'

'জ্বি না।'

'কথাটাতো সেলিম ভাই ঠিক বলেন নি। মানুষ হয়ে জন্ম নিলেই অভিনয় করতে হয়। সংসারে অভিনয়। কখনো খুশি হবার অভিনয় করতে হয়, কখনো দুঃখিত হবার অভিনয় করতে হয়। প্রেমে না পড়েও প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়। আবার প্রেম লুকিয়ে রাখার অভিনয় করতে হয়। আসলে প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে পাকা অভিনেতা।'

'আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন।'

'শুনুন সেলিম ভাই— আপনার মুখ থেকে আপনি আপনি শুনতে আমার ভাল লাগছে না। আপনি দয়া করে আমাকে তুমি তুমি করে বলবেন। পারবেন না ?'

সেলিম ভাই চুপ করে আছেন। আমি মাথা ঘুরিয়ে মা'র দিকে তাকালাম। মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। কিছু খাচ্ছেন না। আমার মনে হয় তিনি পুরোপুরি ড্রাগন হয়ে গেছেন। মা'র জন্যে আমার এখন মায়া লাগছে। আমি তাঁর রাতের খাবার নষ্ট করলাম। ইউনিটের খাওয়া মা'র খুব পছন্দের জিনিস। ইউনিটের ফ্রি খাওয়া যত তুচ্ছই হোক মা সোনামুখ করে খান।

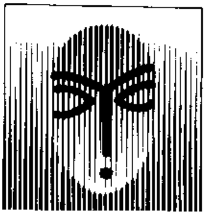

রাত কত হয়েছে কে জানে ?

শোবার সময় হাতে ঘড়ি পরে শুই নি বলে বলতে পারছি না। অবশ্যি ঘড়ি থাকলেও ঘড়ি দেখা যেত না। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। ঘুমের ভান যে করছে সে নিশ্চয়ই চট করে এক ফাঁকে ঘড়ি দেখবে না।

মা আমার গা ঘেষে শুয়েছেন। জালালের মা'র খাটটা ফাঁকা। তাঁকে আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাটা সোহরাব চাচার করা। তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন জালালের মা'কে এই ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আমি মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছি। এই ঘরের দু'টা খাট এখন আমার জন্যে আর মা'র জন্যে। মা কখনো আমাকে একা রেখে শোবেন না। দু'জন চাপাচাপি করে শুয়ে আছি। তাঁর ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না বলেই ঘরে বাতি জ্বলছে। মা'র অভ্যাস হচ্ছে ঘুমে যখন তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসবে তখন তিনি বাতি নিভিয়ে এলোমেলো করে পা ফেলে বিছানায় আসবেন। তিনি খুব নড়াচড়া করছেন। এরমধ্যে দু'বার পানি খেলেন। একবার গেলেন বাথরুমে। ডাকবাংলোয় আমাদের ঘরের বাথরুমটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয় না। যে ভেতরে যায় সে খুব অস্বস্তি বোধ করে। সারাক্ষণই খুট খাট শব্দ করে তার উপস্থিতি জানান দেয়। সোহরাব চাচাকে বললেই তিনি ঠিক করে দেবেন। তাঁকে বলা হচ্ছে না। বাথরুম থেকে একবার বের হলে দরজা বন্ধের সমস্যা কারোর মনে থাকছে না। আমরা বোধ হয় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেয়ে সাময়িক সমাধানকেই বেশি গুরুত্ব দি। একটা সমস্যা হয়েছে সমস্যাকে পাশ কাটাতে পারলেই হল। আর কিচ্ছু লাগবে না।

শুয়ে শুয়ে শিয়ালের ডাক শুনছি। শিয়ালের ডাকে ভয় ধরানো ভাব থাকে— মনে হয় এই শিয়ালের পালে একবার পড়লে এরা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে নেবে। আমরা যখন আজিমপুরের নয়া পল্টনে থাকতাম তখনো গভীর রাতে শিয়ালের ডাক শুনতাম। আজিমপুর কবরস্থানে শিয়াল থাকতো। শিয়াল প্রহর গুনে

ডাকে—আজিমপুর কবরস্থানের শিয়াল যখন তখন ডেকে উঠত। শহরে থেকে থেকে এরা বোধ হয় শহুরে হয়ে গেছে। পুরানো নিয়ম কানুন ভুলে গেছে।

আমি কুন্ডুলী প্যাকিয়ে শুয়ে আছি। আমার গায়ে ভারী কম্বল। তারপরেও শীত মানছে না। দিনে এমন গরম পড়েছিল, রাতে ঝপ করে শীত নেমে গেল। পাহাড়ী অঞ্চলের এই নাকি নিয়ম। রোদ উঠলে প্রচন্ড গরম। রোদ নিভে গেলেই হাড় কাঁপুনি শীত। মোটা কম্বলটাতেও শীত মানছে না। এই কম্বলটা মা'র খুব প্রিয়। তিনি যেখানে যাবেন কম্বলটা সঙ্গে থাকবে। চৈত্র মাসের প্রচন্ড গরমের সময়ও দেখা যাবে তিনি কোথাও যাবার আগে কম্বল প্যাক করছেন। সেই প্যাকিংএরও অনেক কায়দা। প্রথমে কম্বলটা ভরা হবে পলিথিনের একটা ব্যাগে। তারপর সেই পলিথিনের ব্যাগ ঢুকানো হবে মা'র নিজের বানানো মার্কিন কাপড়ের থলিতে। কম্বলের মাপে মাপে এই থলি বানানো। সেই থলি ঢুকানো হবে স্যুটকেসে।

মা'র এই প্রিয় কম্বলের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। তিনি একবার বাবার সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলেন বিছানার চাদর কিনতে। চাদর কিনতে গিয়ে কোন চাদরই তাঁর পছন্দ হল না, এই কম্বলটা তাঁর খুব পছন্দ হল। দাম চার হাজার টাকা। দাম শুনে বাবা-মা দু'জনেরই আক্কেল গুড়ুম। মা চাদর না কিনে ফিরে এলেন। তাঁর মন পরে রইল কম্বলে। কথায় কথায় বলেন—কী মোলায়েম কম্বল। কী সুন্দর ডিজাইন— হালকা সবুজ রঙ। দেখেই মনে হয় ওম ওম গরম। তার মাস চারেক পরের কথা। মা'র বিবাহ বার্ষিকীতে বাবা বিরাট একটা প্যাকেট এনে মা'র হাতে দিলেন। প্যাকেটের গায়ে লেখা—

খুকুকে
শুভ বিবাহ বার্ষিকী

মা প্যাকেট দেখে খুব বিরক্ত হলেন। ঝাঁঝাল গলায় বললেন, কী এনেছ তুমি বলতো ? উপহার তোমাকে কে আনতে বলেছে ? আমাদের বিয়েটা এমন কিছু না যে উৎসব করে পোলাও-কোরমা খেতে হবে, উপহার টুপহার দিতে হবে, আমি খুবই রাগ করছি। কী আছে এর মধ্যে ?

বাবা হাসিমুখে বললেন, খুলে দেখ।

মা বললেন, আমি খুলতে পারব না। বকু, খুলে দেখতো।

আমি বললাম, মা তুমিই খোল। তোমার জিনিস।

মা বললেন, হ্যাঁ আমার জিনিস। আমার জিনিস নিয়ে আমি স্বর্গে যাব।

বলতে বলতে উপহারের প্যাকেট খোলা হল এবং মা যে কী খুশি হলেন ! দেখতে দেখতে মা'র চোখে পানি এস গেল। তিনি এই হাসেন, এই কাঁদেন। সামান্য একটা কম্বলে মানুষ এত খুশি হয়। মে মাসের তীব্র গরমে মা সেই কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমুলেন।

মা'র সঙ্গে এইখানেই আমার তফাৎ। আমি হলে বাবা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেদিনই কম্বল ছিঁড়ে কুটি কুটি করে — আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিতাম। সিন্দাবাদের ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়ে রাখতাম না। মা'কে সেই কথা বলেছিলাম— মা অবাক হয়ে বললেন, তোর বাবার সঙ্গে এই কম্বলের সম্পর্ক কী ? সে যেখানে গেছে যাক। ধুমসীকে নিয়ে নাচাকুদা যা ইচ্ছা করুক আমার তাতে কী ? যখন সে কম্বলটা দিয়েছিল ভালবেসে দিয়েছিল। মানুষটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার ভালবাসা নষ্ট হবে কেন ?

আমি রাগি গলায় বললাম, মা তোমার ধারণা ভালবাসা নষ্ট হয় না ?

'ভালবাসা কি কোন খাবার যে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে ?'

'ভালবাসাটা তাহলে কী মা ?'

'এক সময় নিজেই জানতে পারবি—আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে না। সময় হোক, সময় হলে জানবি।'

'ভালবাসা কি চার হাজার টাকা দামের কম্বল ?'

'ফাজলামি করবি না। চুপ কর।'

আমি চুপ করে গেলাম। তবে চুপ করে গেলেও আমি এইসব নিয়ে ভাবি। খুব ভাবি। অন্য মেয়েরা এত ভাবে কি-না জানি না। হয়ত ভাবে না। তাদের এত সময় কোথায় ? তাদের খেলাধুলা আছে, বন্ধু বান্ধব আছে। পিকনিক আছে, জন্মদিন আছে। আমার কী আছে ? কিছুই নেই। শুধু মা আছেন। বাসায় আমরা দু'জন যতক্ষণ থাকি—মা অনবরত কথা বলেন। আমি বেশির ভাগ সময়ই কিছু শুনি না। মা'র দিকে তাকিয়ে থাকি তবে মা কী বলছেন তা আমার কানে ঢোকে না। মা মাঝে মাঝে বলেন— কী-রে তুই এমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছিস কেন ? আমি বলি— মা আমার চোখ দু'টাতো অদ্ভুত কাজেই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছি।

'আমার সঙ্গে ফাজিলের মত কথা বলবি না বকু।'

'ফাজিলের কী হল— আমার চোখ অদ্ভুত না ?'

'বকু তুই দিন দিন অসহ্য হচ্ছিস।'

'মা তুমিও দিন দিন অসহ্য হচ্ছ।'

'আমি অসহ্য হচ্ছি ?'

'হুঁ। এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার বাবার জন্যে সহানুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবা তোমাকে ছেড়ে গিয়ে খুব ভুল করে নি। আমি বাবা হলে অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম।'

কথাবার্তা এই পর্যায়ে চলে এলে মা যা করেন তাকে পুরোপুরি কিশোরী সুলভ আচরণ বলা যেতে পারে। তিনি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। খাওয়া বন্ধ। ভাত-রাগ। ভাত খাবেন না। মাঝে মাঝে শোনা যায় বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে তিনি কাঁদছেন— "ও বাবু। বাবু। তুমি কই বাবু। বাবু তুমি আমাকে একটু আদর করে দিয়ে যাও।"

বাবু হলেন আমাদের নানাজান। মা'র বয়স যখন সাত তখন তিনি মারা যান। মা তাঁর বাবাকে বাবা বা আব্বু ডাকতেন না। ডাকতেন— বাবু।

আমার পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি খাবার জন্যে উঠে বসলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, মা আমাকে ধরে বসবেন। বাকি রাত মা'র বক্তৃতা শুনে কাটাতে হবে। সকালে আমার শুটিং। রাত জাগলে তার ছাপ পড়বে চেহারায়। সিনেমার শক্তিশালী ক্যামেরাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। ক্যামেরা সব ধরে ফেলবে।

কাল সকালের সিকোয়েন্সটা খুব সুন্দর। আমি পানির তৃষ্ণা ভুলে থাকার জন্যে আমার সিকোয়েন্স নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম। দৃশ্যটা এ রকম—

দিলু শখ করে শাড়ি পরেছে। কপালে টিপ দিয়ে নিজের মত করে সেজেছে। দিলুর বাবা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে গল্পের বই পড়ছিলেন। দিলু তাঁকে বলল, বাবা আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? তিনি বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন—খুব সুন্দর লাগছেরে মা। বিউটিফুল। তোর মা'কে বলতো চা দিতে। দিলুর মনটা খারাপ হল। বাবা একবার তাকিয়ে তার রূপবতী কন্যাকে দেখলেনও না? সে তার মা'কে চা দেবার কথা না বলে ডাকবাংলো থেকে বের হল। তার দেখা হল জামিলের সঙ্গে। জামিল বলল, পরী সেজে কোথায় যাচ্ছিস? দিলু লজ্জিত গলায় বলল—জামিল ভাই আমাকে সত্যি সুন্দর লাগছে?

জামিল বললেন, সুন্দর লাগছে মানে— তোকেতো কুইন অব শেবার মত লাগছে। কপালের টিপটা ঠিকমত দিতে পারিস নি। একপেশে হয়ে গেছে। যা কলম নিয়ে আয় আমি টিপ একে দিচ্ছি।

এই কথায় দিলু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। সে চোখ মুখ লাল করে বলল—থাক আপনাকে টিপ আঁকতে হবে না। এই বলেই সে ছুটে বের হয়ে গেল। সে থামল পুকুরের কাছে গিয়ে। পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখল। সেই ছায়া দেখে তার লজ্জা আরো যেন বেড়ে গেল। একটা ঢিল ছুঁড়ে পুকুরের ছায়াটা ভেঙ্গে দিল। তারপর লজ্জায় শাড়ির আঁচলে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। এইখানেই প্রথম প্রকাশ পেল মেয়েটি জামিল নামের মানুষটিকে পাগলের মত ভালবাসে।

কাল কোন অংশটি হবে ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলেন নি। আমার ধারণা পুকুরের অংশটা হবে। কোন শাড়ি পরব—তাও ঠিক হয় নি। তবে শাড়ি নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে না। এই সব ব্যবস্থা ডিরেক্টর সাহেব করে রেখেছেন। প্রতিটি পোষাক দু'সেট করে কেনা আছে। একটা সেট আলাদা করা। ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত সেই সেটে হাত দেয়া হবে না। যদি হঠাৎ কোন প্যাচ ওয়ার্কের প্রয়োজন হয়। এইসব ব্যাপারে ডিরেক্টর সাহেবের কাজ কর্ম নিখুঁত।

পুকুরের পারে আমি কী ভাবে বসব ? চিত্রনাট্যে বসার কথা থাকলেও আমার ধারণা আমাকে বসতে হবে না। একটা মেয়ে দৌড়ে এসে পুকুর পারে হঠাৎ করে বসে যেতে পারে না। তা ছাড়া সুন্দর করে বসতে হলে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। শাড়ি নষ্ট করে কোন মেয়ে কি হাঁটু গেড়ে বসবে ? সবচে ভাল হয় পুকুরের যদি শান বাঁধানো ঘাট থাকে। আমি শুনেছি যে পুকুরে শুটিং হবে সেখানে বাঁধানো ঘাট নেই। জংলী ধরনের পুকুর। চারদিক গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে জঙ্গলা হয়ে আছে। অবশ্যি জংলী পুকুরেরও আলাদা সৌন্দর্য আছে। গাছপালায় ঢাকা ছায়াময় একটা পুকুর। সেই পুকুরের শান্ত নিস্তরঙ্গ টলটলে জল। পুকুরের জলের কথা ভেবে ভেবে আমার পানির পিপাসা আরো বাড়ল। আমি কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে-রে বকু ?

আমি বললাম, খুব পেট ব্যথা করছে মা।

পেট ব্যথার কথা বললাম যাতে মা আমাকে বিরক্ত না করেন। যদি বলতাম—তৃষ্ণা পেয়েছে পানি খাব তাহলে মা বাকি রাতটা কথা বলে বলে আমাকে বিরক্ত করে মারবেন। পেটে ব্যথা শুনলে অসুস্থ মেয়েকে হয়ত ততটা বিরক্ত করবেন না। শুয়ে থাকতে বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন।

'হঠাৎ পেট ব্যথা করছে কেন ?'

'আমি কী করে বলব কেন ? ব্যথায় মরে যাচ্ছি। দেখি মা, একগ্লাস পানি দাওতো।'

'বাথরুমে যাবি ?'

'না।'

'বাথরুম করলে পেট ব্যথা কমবে।'

'বললামতো বাথরুম পায় নি।'

'আয় আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত কথা তুমি যে মা বল ! বাথরুম পায় নি তারপরেও তুমি আমাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে যাবে। তারপর কী করবে কমোডে বসিয়ে রাখবে ? পানি চাচ্ছি পানি দাও।'

মা পানি এনে দিলেন। আমি পানি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। মা বললেন, বকু ব্যথা কি বেশি ?

আমি বললাম, হুঁ।

'পেটে তেল মালিশ করে দেব ?'

'কিচ্ছু মালিশ করতে হবে না।'

'পেটের নীচে বালিশ দিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে থাক।'

'ডাক্তারী ফলিও না মা।'

'তুই আমার সঙ্গে এত বিশ্রী ব্যবহার করছিস কেন ?'

'বিশ্রী ব্যবহার কী করলাম ?'

'তোর স্বভাব চরিত্র বদলে যাচ্ছে বকু।'

'দয়া করে চুপ করে থাকবে মা। পেটের ব্যথায় বাঁচি না। তোমার বকবকানি এখন অসহ্য লাগছে।'

'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?'

'আমার যন্ত্রণা পেটে— তুমি মাথায় হাত বুলাবে কেন ?'

'ডাইনিং রুমে তুই ঐ ফাজিলটার সঙ্গে এত কী কথা বলছিলি ?'

'কার কথা বলছ, সেলিম ভাই ?'

'আদুরে গলায় সেলিম ভাই বলবি নাতো— রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।'

'সেলিম ভাই না বলে যদি শুধু সেলিম বলি তাহলে কি তুমি খুশি হবে ?'

'ফাজিল ধরনের এইসব ছেলের সঙ্গে তোর এত কথা বলার দরকারটাই বা কী ?'

'আচ্ছা যাও আর কথা বলব না। পেটের ব্যথায় মরে যাচ্ছি তুমি এর মধ্যেও প্যাঁচাল শুরু করলে ? দয়া করে চুপ কর।'

'ব্যথা খুব বেশি ?"

'হুঁ।'

'মঈন ভাইয়াকে খবর দেব ?'

'মঈন ভাইয়াকে খবর দেব মানে ? উনাকে কেন খবর দেবে ? উনি কি ডাক্তার ?'

'ডাক্তার না হোক দলের মাথা। বিপদ আপদ হলে তাকেইতো সবার আগে জানাতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের ব্যবস্থা করবে। তুইতো ফেলনা না। তুই এই ছবির সেকেন্ড নায়িকা।'

'তোমার ধারণা নায়িকার পেট ব্যথা শুনে উনি ছুটে এসে নায়িকার পেটে হাত দিয়ে বসে থাকবেন ?'

'তুই কী ধরনের কথা বলছিস ! নোংরা ধরনের কথা শিখলি কোথায় ?'

'তোমার কাছ থেকে শিখেছি।'

'আমার কাছ থেকে শিখেছিস ? আমি নোংরা কথা বলি ?'

'অবশ্যই বল। তুমি আর জালালের মা— তোমরা কর কী ? সময় পেলেই গুজগুজ গুজগুজ। তোমরা কি ধর্মীয় আলাপ কর ? তোমার কি ধারণা তোমাদের গল্প আমার কানে যায় না ?'

'জালালের মা গল্প বলে আমি শুধু শুনে যাই।'

'গল্পগুলি কী রকম ? কোন নায়িকা কী নষ্টামী করল কাকে রাতে কার ঘরে পাওয়া গেল।'

'একজন কেউ আগ্রহ করে গল্প করলে আমিতো তার মুখ চাপা দিতে পারি না।'

'না পারলে নাই। তুমি ঘুমুতে এসোতো মা। আর কথা না। তুমি নিজে ঘুমাও আমাকেও ঘুমুতে দাও।'

মা সঙ্গে সঙ্গে মশারীর ভেতর ঢুকলেন। মাঝে মাঝে মা আমাকে ভয় পান। এই মুহূর্তে তিনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন। মা আমার ভয়ে ভীত, এই দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগে।

'বকু তোর পেট ব্যথাটা কমেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মঈন ভাইয়ার কাছে তোর ব্যাপারে নালিশ করতে হবে।'

'আদুরে গলায় মঈন ভাইয়া মঈন ভাইয়া বলবে নাতো মা। বিশ্রী লাগে। মনে হয় তুমি উনার প্রেমে পড়ে গেছ।'

'আমি প্রেমে পড়ে গেছি মানে ?'

'চুপ করে ঘুমাওতো মা। আমার আবার পেট ব্যথা করছে। মনে হয় এপেনডিসাইটিস।'

মা আর কথা বললেন না। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে আজ রাতটা নির্ঘুম কাটবে। হয়ত সকালে দেখা যাবে চোখের নীচে কালি পড়েছে। সেই কালি ঢাকতে মেকাপম্যানের কষ্ট হবে।

'মা। জেগে আছ ?'

'হুঁ।'

'সেলিম ভাইয়ের ব্যাপারে তুমি কি আপসেট ?'

মা জবাব দিলেন না। আমি হালকা গলায় বললাম, আপসেট হয়ো না। সেলিম ভাই কিন্তু সহজ মানুষ না। ভ্যাবলার মত ঘুরে বেড়ালেও তিনি মোটেই ভ্যাবলা না।

'তোকে সে যা বুঝিয়েছে তুই তাই বুঝেছিস।'

'সেলিম ভাই একজন বিখ্যাত অভিনেতা। তিনি এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। ফরহাদ সাহেবের যে চরিত্রটা করার কথা সেটা উনি করছেন।'

'পাগলের মত কথা বলবি না বকু।'

'মোটেই পাগলের মত কথা বলছি না। পুরো ব্যাপারটা সিক্রেট। কাল যখন সেলিম ভাইয়ের উপর ক্যামেরা ওপেন হবে তখনই জানতে পারবে, তাঁর অভিনয় দেখেও তোমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। তোমাদের সময়কার হিট নায়ক উত্তমকুমারকে তিনি কোঁৎ করে গিলে ফেলতে পারেন।'

মা কম্বল ফেলে উঠে বসলেন। কিশোরীদের মত কৌতূহলী গলায় বললেন— সত্যি ?

'সত্যিতো বটেই। তিনি যে সে লোক না। তিনি হলেন— সেলিমকুমার।'

অদ্ভুত শব্দে একটা পাখি ডাকছে। কেমন ভয় ধরানো গলার স্বর। আমি পাখির ডাক শুনছি। কী পাখি ডাকছে মা'কে জিজ্ঞেস করে জানা যাবে না। মা এইসব জানেন না। সেলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত।

'মা!'

'কিরে ব্যথা আবার বেড়েছে ?'

'উহুঁ। ঘুম আসছে না, একটা গল্প বলতো মা। ভুতের গল্প।'

'ভূতের গল্প আমি জানি নাকি ?'

'ছোটবেলায় কিংবা বড় বেলায় ভূত টূত কিছু দেখ নি ?'

মা হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভূত একটাই দেখেছি — তোর বাবাকে।

'বেশতো বাবা-ভূতের গল্পই বল।'

মা চুপ করে গেলেন। আমি বললাম, ভূতের সঙ্গে তোমার বিয়ের গল্পটা বলতো মা।

'নিজের বাবাকে ভূত বলছিস লজ্জা লাগছে না ?'

'তুমি বলছ বলেই আমি বলছি।'

'আমার কথা ভিন্ন।'

'ভিন্ন হবে কেন ? তুমিও যা, আমিও তা— বল মা, তোমাদের গল্প শুনি। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল না বিয়ের পর প্রেম ?'

'প্রেম ফ্রেম আমাদের জীবনে ছিল না।'

'শুরুতে নিশ্চয়ই ছিল— সেটা বল।'

'আচ্ছা শোন— একটা ভূতের গল্প শোন, মনে পড়েছে। আমার মায়ের কাছ

থেকে শুনেছি— আমার মায়ের বাড়ি ছিল কলসহাটি। মা তখন খুব ছোট, তিন চার মাস বয়স। হয়েছে কী তাঁকে তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমার নানি গিয়েছেন পাকঘরে কী একটা আনতে। ফিরে এসে দেখেন মেয়ে নেই। নেই তো নেই। কোথাও নেই। চারদিকে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কেউ বল্ল শিয়ালে নিয়ে গেছে, কেউ বলল বাঘডাসায় নিয়ে গেছে।'

'আসলে কি ভূতে নিয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

'দিনে দুপুরে ভূত এসে তোমার মা'কে নিয়ে গেল? এই গল্প শুনব না মা। থুক্কু তোমার সঙ্গে খেলব না।'

'তুই এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলিস কেন? 'থুক্কু তোমার সাথে খেলব না।' তুই কি আমার সঙ্গে খেলছিস?'

'খেলছিতো বটেই। আমরা সবাই সবার সঙ্গে খেলি। কারো খেলা ভাল হয়। কারো খেলা ভাল হয় না। খেলার মধ্যে ঝগড়া হয়। খামচা খামচি হয়। কেউ খেলা ফেলে রাগ করে উঠে চলে যায়।'

'পাগলের মত কথা বলবি নাতো বকু। তোর পাগলের মত কথা শুনতে অসহ্য লাগছে।'

'আচ্ছা কথা বলব না। তুমি কি আমার কাছ থেকে একটা ভূতের গল্প শুনতে চাও?'

'তোর কাছ থেকে ভূতের গল্প শুনব? তুই ভূতের গল্প জানিস না-কি?'

'হ্যাঁ জানি। শোন— অনেককাল আগে আমাদের দেশের ধনবান মানুষরা তাদের ধনরত্ন কী করতেন জান? ধনরত্নের একটা অংশ মাটির নীচে গর্ত করে রেখে দিতেন, যেন দুঃসময়ে ব্যবহার করা যায়। কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান সন্ততিরা ব্যবহার করতে পারে। তখনতো আর ব্যাংক ছিল না। মাটির নীচের গুপ্ত ঘরই হল ব্যাংক।

'কী হাবিজাবি শুরু করলি? ঘুমোতো।'

'আহা শোন না— ঐ সব ধনরত্ন টাকা পয়সা পাহারা দেয়ার জন্যে থাকতো যখ।'

'যখ কী?'

'যখ হচ্ছে যক্ষ। শোন নি— যক্ষের ধন? যখ বানানো হত কী ভাবে জান মা? যখ বানানোর প্রক্রিয়াটা মজার। নয় থেকে দশ বছর বয়সের একটা ছেলেকে যখ বানানো হতো। তাকে গোসল করিয়ে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে সাজানো হত। চোখে সুরমা দিয়ে চুল আচড়ে দেয়া হত। কোলে বসিয়ে দুধ ভাত

খাওয়ানো হত। তারপর নিয়ে যাওয়া হত গুপ্ত ঘরে। সেখানকার ধনরত্ন তার সামনে রাখা হত। একজন পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তে ধনরত্ন তার হাতে জিম্মা করে দিতেন। পুরোহিত বলতেন— হে যখ, তোমার হাতে এইসব রত্ন-রাজি তুলে দিলাম। তোমার দায়িত্ব হল এর রক্ষণাবেক্ষণ করা। আইনানুগ উত্তরাধিকারী ছাড়া তুমি এই ধনরত্ন কখনো হস্তান্তর করবে না। যে ছেলেটা যখ হবে সে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একসময় কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত। তখন তাকে সেখানে শুইয়ে সবাই চুপি চুপি উঠে আসত। গুপ্ত ঘরে জ্বলতো একটা ঘিয়ের প্রদীপ। তারা উপরে উঠে এসেই ঘরের মেঝের গুপ্ত কুঠুরি চিরদিনের মত বন্ধ করে দিত। এক সময় ছেলেটির ঘুম ভাঙ্গতো। আতংকে অস্থির হয়ে সে ছোটাছুটি করত। মা'কে ডাকতো, বাবাকে ডাকত। তার কান্না তার আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পেত না। ছেলেটার মৃত্যু হত সেই ধনরত্নপূর্ণ গুপ্ত কুঠুরিতে।'

আমি থামলাম। মা হতভম্ব হয়ে বললেন— এই ভয়ংকর গল্প তুই কোথায় শুনলি!

আমি বললাম, এটা কোন ভয়ংকর গল্প না মা। পুরানো ভারতের সাধারণ একটা গল্প। ভারতবর্ষের যেখানেই মাটির নীচে ধনরত্ন পাওয়া গেছে সেখানেই ছোট বালকের কংকাল পাওয়া গেছে।

'কে বলেছে তোকে ?'

'ঘুমাও মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'এইসব আজে বাজে গল্প কখনো বলবি না।'

'আচ্ছা আর বলব না।'

'এই গল্পটা তোকে কে বলেছে ?'

আমি জবাব দিলাম না। ঘুমের ভান করলাম। মা আরো কয়েকবার এই বকু, এই বকু বলে আমার গায়ে ধাক্কা দিলেন। আমি চমৎকার ঘুমের অভিনয় করলাম। মা চুপ করে গেলেন।

আমার ঘুম আসছে না। আমি জেগে আছি। গল্পটা আমাকে বলেছেন আমাদের ডিরেক্টর মঈন সাহেব।

যখ বানানোর প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর ছবি বানানোর শখ। ছবিটি কেমন হবে তাই তিনি পাপিয়া ম্যাডামকে বুঝাচ্ছিলেন। আমি দূর থেকে শুনছিলাম। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, এই ছবি বানিয়ে লাভ কী ?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মানুষ যে কত ভয়ংকার হতে পারে তা দেখানো।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, এখনতো আর কেউ যখ বানাচ্ছে না। সেই ভয়ংকার মানুষরাতো নেই।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, যারা যখ বানাতো তারা কিন্তু ভয়ংকর ছিলেন না। সাধারণ মানুষই ছিলেন। তাদের সংসার ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল। তাঁরা ধর্ম-কর্ম করতেন, দান ধ্যান করতেন। তার পরেও ভয়ংকর ব্যাপারটা কোন না কোন ভাবে তাদের চরিত্রে ছিল। ছিল না ?

'হ্যাঁ ছিল।'

'যদি তখন থাকে তাহলে এখনো আছে। মানুষ জন্মসূত্রে তার চরিত্রে এই ভয়ংকর ব্যাপারটি নিয়ে এসেছে। আমার ছবিটা মানুষের মনের ঐ দিকটাই দেখাবে।'

'ছবির নাম কী হবে ?'

'নাম ঠিক করি নি।'

'ছবিটা কি সত্যি সত্যি বানানো হবে ?'

'তাও জানি না। অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে। করতে পারি কোথায় ? টাকা নেই। টাকা নেই।'

'আপনার স্ত্রী টাকা দেয়া বন্ধ করেছে ?'

ডিরেক্টর সাহেব জবাব দিলেন না। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বকুল যখের গল্পটা তোমার কাছে কেমন লাগল। প্রশ্নটা এমন আচমকা করা হল যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমি যে গল্পটা এত আগ্রহের সঙ্গে শুনছি তা তিনি লক্ষ্য করবেন আমি ভাবি নি। এক পলকের জন্য আমার মনে হল আসলে গল্পটা তিনি আমাকেই শুনাতে চাচ্ছিলেন। পাপিয়া ম্যাডাম উপলক্ষ্য মাত্র। তার পরেই মনে হল— আরে না।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি— ঘুম আসছে না। এক সময় আমার নিজেকেই যখের মত মনে হল। আমি যেন একটা যখ— পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। অথচ এই সৌন্দর্য আমি উপভোগ করতে পারছি না। আমি শুধু পাহারা দিচ্ছি।

আচ্ছা সব মানুষই কি খানিকটা যখের মত না ? তাদের কাজ অন্যের ধনরত্ন পাহারা দেয়া। মা যেমন আমার ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছেন, আমি অন্য একজনেরটা পাহারা দিচ্ছি। দূর পাগলের মত কী ভাবছি! আমার ঘুমিয়ে পড়া দরকার। মানুষের ইচ্ছা-ঘুমের ক্ষমতা থাকার খুব প্রয়োজন ছিল। ইচ্ছা করা মাত্র

আনন্দময় ঘুম চোখে নামবে— আর কী শান্তি। তা-না ঘুমের জন্যে অন্য একজনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সেই অন্য একজন ঘুম পাড়িয়ে দিলে ঘুম আসবে। ঘুম পাড়াতে না চাইলে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে হবে। মওলানা মেরাজ মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে— ঘুম আসার কোন দোয়া তাঁর জানা আছে কি-না।

মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। আজ তিনি বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে আসব— না বাতি জ্বালানোই থাকবে ? বুঝতে পারছি না। ডাইরি লেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে আমি যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যাই— আর ঘুম আসবে না, তখন ডাইরি লিখতে বসি। আজ সারাদিনে লেখার মত অনেক কিছুই ঘটেছে। মনে মনে রাফ করে ফেললে কেমন হয়। রাফ করতে করতে এক সময় হয়ত ঘুম এসে যাবে। আমি মনে মনে ডাইরি লেখা শুরু করলাম।

হাতি ও পিঁপড়া সংবাদ

হাতি এবং পিঁপড়া বিষয়ক একটা গল্প ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলেছেন। গল্পটা আমি আগেও শুনেছি— তবে তিনি অনেক মজা করে বলেছেন। এই মানুষটার গল্প বলার ক্ষমতা ভাল। তবে তিনি যে খুব ভাল গল্প বলেন তা তিনি জানেন। একজন যখন জেনে ফেলে সে খুব ভাল গল্প করতে পারে তখন তার গল্প বলায় ওস্তাদী একটা ভাব এসে পড়ে। উনার মধ্যেও তা এসেছে। আমার মামাও খুব ভাল গল্প বলতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এই ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন না। জানেন না বলেই নিজের মনে মজা করে গল্প করেন। শুনতে অসম্ভব ভাল লাগে। হাতি এবং পিঁপড়ার এই গল্পটা মামাকে বললে— তিনি আরো অনেক বেশি মজা করে এই গল্প অন্যদের করবেন। তবে সমস্যা হচ্ছে কী, যারা খুব ভাল গল্প করতে পারে তারা শুধু নিজেরই গল্প করতে চায়। অন্যদের গল্প শুনতে চায় না। আমি নিজেও খুব ভাল গল্প করতে পারি। ডিরেক্টর সাহেবকে আমি একদিন আমার গল্প শুনাব। সেই একদিনটা কবে আমি জানি না। আজ উনাকে গল্প শুনাবার একটা সুযোগ আমার ছিল। আমি সেই সুযোগ গ্রহণ করি নি।

হাফিজ আলির স্ত্রী

হাফিজ আলির স্ত্রীর নাম, আমি এখনো জানি না। আমি কেন কেউই জানে না। এই মহিলা না-কি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। ইউনিটের সবাই এই মহিলার ব্যাপারে উৎসাহী। আমি উৎসাহী বোধ করছি না— তবে ভদ্রমহিলাকে আমার খুব দেখার শখ। একটা কাজ করলে কেমন হয়— একদিন চুপি চুপি ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যদি বলি, শুনুন আমার নাম রেশমী। আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি। আজ আমি এসেছি আপনার ভবিষ্যৎ বলতে। আপনি কি আপনার নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান ? তাহলে ভদ্রমহিলার মুখের ভাব কেমন হবে ? তিনি কি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে আগ্রহী হবেন ?

সেলিম ভাই

আমার ধারণা সেলিম ভাই খুব ভাল অভিনয় করবেন। তাঁকে ভাল অভিনয় করার ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি। তাঁর ভেতরে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুললেই হবে, আর কিছু লাগবে না। একজন যুবক ছেলের আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই যখন সে হঠাৎ দেখে একটা তরুণী রূপবতী মেয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন সমস্ত পৃথিবীটা মনে হয় তার হাতের মুঠোয়। আমি অনায়াসেই সেলিম ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাবার অভিনয় করতে পারি। তবে এখন এই অভিনয় করলে লাভ হবে না। কারণ সেলিম ভাই নিজে আমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছেন। আমার দিকে তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি সবই পালটে গেছে। এখন আমি আর তাঁকে সাহায্য করতে পারব না।

মা ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে বললেন, "বাবু ও বাবু। বাবু।" তিনি তাঁর বাবাকে ডাকছেন। আহা বেচারী। আমি মা'র গায়ে হাত রাখলাম, কোমল গলায় ডাকলাম, মা মা। মা ঘুমের মধ্যেই বললেন, হুঁ। আমি বললাম, তুমি আরাম করে ঘুমাও। আমি কখনো, কোনদিনও তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করি, তোমাকে রাগিয়ে দেই, কাঁদাই। কিন্তু তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি তা তুমি জান না। জানলে তোমার খুব ভাল লাগতো।

মা পাশ ফিরলেন। মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যেও তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন।

মাঝে মাঝে খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গে। কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ জেগে উঠে দেখি ঘরের ভেতরের অন্ধকারে নরম একটা ভাব। ঘন অন্ধকারকে কেউ যেন তরল করে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ঘন করে ফেলবে। ধ্বক করে বুকে ধাক্কা লাগে— হচ্ছে কী ? ভয়ংকর কিছু কি হচ্ছে ? এটাই কি সেই ভয়ংকর মুহূর্ত ?

ভয়ংকর মুহূর্তের একটা ইতিহাস আছে। আমি যখন খুব ছোট তখন দাদীজান আমাদের সঙ্গে থাকতেন। মাঝে মাঝে দাদীজানের সঙ্গে আমি রাতে ঘুমুতাম। তাঁর কাছে গল্প শুনতে চাইতে হত না। তিনি নিজের মনেই একের পর এক গল্প বলে যেতেন। তাঁর সব গল্পই ভয়ংকর টাইপের। আজরাইল শিঙ্গা ফুঁকছে—পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই শিঙ্গার কী ভয়ানক আওয়াজ। সেই আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র সমস্ত গর্ভবতী মা'দের পেটের সন্তান 'খালাস' হয়ে যাবে। শিঙ্গাটা ফোঁকা হবে— আধো আলো আধো অন্ধকার সময়। তখন দিনও না, রাতও না।

খুব ভোরে যতবার ঘুম ভাঙ্গতো ততবারই মনে হত এই কি সেই শিঙ্গা ফোঁকার সময় ? নিজেকে সামলাতে সময় লাগত। আমি এলোমেলো পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। বাড়ির সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। একটা মানুষ নেই। মানুষজন যেমন ঘুমুচ্ছে, রাস্তাটাও যেন ঘুমুচ্ছে। কোন একজন জীবন্ত মানুষ রাস্তায় এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত রাস্তার ঘুম ভাঙ্গবে না।

আমি ঠিক করে ফেলি রাস্তার ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত আমি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকব। যে মানুষটা রাস্তার ঘুম ভাঙ্গাবে তাকে দেখে ঘরে ঢুকব। তখন মনে এক ধরনের উত্তেজনা হতে থাকে। কাকে দেখব ? কাকে দেখব ? কে সেই ঘুম ভাঙ্গানিয়া ?

বেশির ভাগ সময়ই নামাজী মানুষদের দেখি। ফজরের নামাজ পড়তে মস্‌জিদের দিকে যাচ্ছেন। একবার শুধু বাচ্চা একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। তার পরনে লাল ফ্রক,খালি পা, হাতে একটা কঞ্চি। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে কঞ্চি দুলাতে দুলাতে যাচ্ছে। আমার মনটা খানিকক্ষণের জন্যে অন্যরকম হয়ে গেল — মেয়েটা এত ভোরে কোথায় যাচ্ছে ? তার মনে এত আনন্দইবা কিসের ? পৃথিবী কি সত্যই এত আনন্দময় ? আমি বারান্দা থেকে ডাকলাম, "এই মেয়ে, এই।" সে মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে ফিক্ করে হাসল তারপর আগের মতই কঞ্চি দুলাতে দুলাতে এগুতে লাগল। এরপর থেকে ভোরে ঘুম ভাঙ্গলেই মেয়েটার মুখ আমার মনে আসে। কী সুন্দর মায়া মায়া মুখ। কেমন টুক টুক করে হাঁটছিল।

দুর্গাপুর ডাকবাংলোয় আজ আবার আধো অন্ধকার আধো আলোয় ঘুম ভাঙ্গল। আমি পুরানো অভ্যাসমত বারান্দায় চলে এলাম। পাখিদের চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষরা যে খুব ভোরে জেগে ওঠে তার প্রধান কারণ বোধ হয়—পাখিদের হৈ চৈ। পাখিরা বড্ড বিরক্ত করে।

বারান্দা থেকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। পাপিয়া ম্যাডাম হাঁটছেন। তাঁর হাতে কফির মগ। মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন (কফি না হয়ে চা-ও হতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি কফি। তিনি চা খান না)। তিনি নিজের মনে হাঁটছেন। ছবির মত একটা দৃশ্য। তাঁর পরনে শাদা শাড়ি। লাল একটা চাদর মাথার উপর দিয়ে রেখেছেন। তাঁকে জীবন্ত একটা ফুলের মত লাগছে। আমার কাছে মনে হল আমি অনেকদিন এমন সুন্দর দৃশ্য দেখি নি। পাপিয়া ম্যাডাম কোনোদিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি আছেন আপন মনে। আমি যদি কখনো ছবি বানাই এমন একটা দৃশ্য অবশ্যই রাখব। ছবির নায়িকা খুব ভোরে বাগানে একা একা হাঁটছে। তার হাতে কফির মগ। মাঝে মাঝে সে মাথা উঁচু করে আকাশ দেখার চেষ্টা করছে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। আমার খুব ইচ্ছা করছে উঠোনে নেমে যাই। পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি। উনি হয়ত খুব রাগ করবেন। কিছু সময় আছে যখন মানুষ একা থাকতে চায়, অতি প্রিয়জনের সঙ্গও তার অসহ্য বোধ হয়। উনার হয়ত এখন ঐরকম সময় যাচ্ছে। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। নীচে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম, উঠোনে এমন ভাবে যাব যাতে মনে হবে উনি যে উঠোনে আছেন আমি জানতাম না। আমি যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উনাকে দেখেছি উনি তা জানেন না। আমি হঠাৎ উঠোনে উনাকে দেখে চমকে উঠেছি এমন একটা অভিনয়। আমার জন্যে সহজ অভিনয়।

আমি আমার অভিনয়ের অংশটা সুন্দর ভাবে করলাম। উনাকে দেখে চমকে উঠে বললাম, ও আল্লা আপনি! কী আশ্চর্য!

উনি হাসি মুখে বললেন, রুমালী তুমি কেমন আছ ?

'জ্বি ভাল।'

'আমাকে দেখে চমকে ওঠার ভান করলে কেন ? তুমিতো দোতলার বারান্দা থেকেই আমাকে দেখেছ।'

চট করে কোন জবাব আমার মাথায় এল না। আমি অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছি। কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারার মধ্যে তীব্র একটা আনন্দ আছে। বেশির ভাগ মানুষ এই আনন্দ অনেকক্ষণ ধরে পেতে চান। উনিও কি তা চাইবেন ? না-কি আমার কাছ থেকে কোন জবাবের জন্যে অপেক্ষা করবেন না, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন ?

পাপিয়া ম্যাডাম অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন— সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন,

তুমি কি রোজই এত ভোরে ওঠ ?

'জ্বি না। আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে।'

'আমি খুব আর্লি রাইজার। যত রাতেই আমি ঘুমুতে যাই না কেন—পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে আমার ঘুম ভাঙ্গবেই। তখন আমি নিজের জন্যে এক মগ কফি বানাই। কফি খেতে খেতে টুকটুক করে হাঁটি।'

কিছু বলতে হয় বলেই আমি বললাম, খুব ভাল অভ্যাস।

তিনি বললেন, মোটেই ভাল অভ্যাস না। কারণ সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পরই আমি আবার ঘুমুতে চলে যাই। শুটিং না থাকলে— দশটা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমুই।

'আজ ঘুমুতে পারবেন না। আজতো শুটিং।'

'আজো পারব। আজ শুটিং হবে না।'

'শুটিং হবে না ? প্যাক আপ হয়ে গেছে ?'

'না। তবে হবে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে হবে। আমার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল।'

'আপনি কি সব কিছু আগে ভাগে বলতে পারেন ?'

'আরে না। হঠাৎ কোন একদিন একটা কিছু মনে হয় তারপর দেখি তাই হয়েছে। আজ ঘুম থেকে উঠেই মনে হল শুটিং হবে না। এবং আমি জানি হবে না।'

আমি বললাম, এই গ্রামে একটা বৌ আছে। সেও না-কি ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

তিনি হালকা গলায় বললেন, ও আচ্ছা জাহেদা। তার কথা শুনেছি। একদিন যাব, দেখে আসব। অবশ্যি পীর-ফকির, ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার খুব আগ্রহ নেই। তুমি ঘুরে বেড়াও— আমি যাচ্ছি।

'এখন ঘুমুতে যাবেন ?'

'হুঁ।'

'আপনার মেয়েকে সবুজ বলপয়েন্টে একটা চিঠি লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেই চিঠি লেখা হয়েছে ?'

পাপিয়া ম্যাডাম হেসে ফেলে বললেন, আমার সবুজ বল পয়েন্টের খবর মনে হয় দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ চিঠি লেখা হয়েছে। এখনো পোস্ট করি নি। আচ্ছা ঠিক আছে চিঠি পোস্ট করার আগে তোমাকে পড়াব। পড়লে তোমার মজা লাগবে।

সকালের নাশতা খাবার সময় সোহরাব চাচা বললেন, মিস রুমাল তুমি মেকাপে বসে যাও। দেরি করবে না। আমি বললাম, চাচা, শুটিং কি হবে ? সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, শুটিং হবে না কেন ?

'এম্নি বললাম।'

'শুটিং অবশ্যই হবে। স্যার বলে দিয়েছেন— হেয়ার স্টাইল তোমাকে মনে রাখতে। যেদিন যেদিন শাড়ি পরবে, চুল খোলা থাকবে। শাড়ি ছাড়া আর যাই পরবে— দু'বেণী করবে।'

'জ্বি আচ্ছা মনে রাখব। মেকাপ কোথায় দেয়া হবে ?'

'তাওতো জানি না—আচ্ছা দাঁড়াও জেনে এসে বলছি। এই ফাঁকে দ্রুত চা শেষ করে ফেল। তুমি টুকটুক করে চা খাও কেন ? এক চুমুক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা, আবার আরেক চুমুক।'

চা শেষ করার আগেই সোহরাব চাচা ফিরে এসে বিরক্ত মুখে বললেন, আজ শুটিং প্যাক আপ হয়েছে।

ছবির জগতে 'প্যাক আপ' বাক্যটি আনন্দময়। স্কুলে উপস্থিত হবার পর হেড স্যার যদি এসেম্বলীতে বলেন, তোমাদের জন্যে দুঃখের খবর আছে— ক্লাস এইটের একজন ছাত্রী মায়া হালদার যে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল, আজ খবর এসেছে সে মারা গেছে। আজ তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করা হবে। এবং আজ আর কোন ক্লাস হবে না। তখন ছাত্রীরা খুব চেষ্টা করে চোখে মুখে মনখারাপ ভাব ফুটিয়ে রাখতে। শেষ পর্যন্ত পারে না। মৃত্যুর শোকের চেয়ে ক্লাস হবে না এই আনন্দই বড় হয়ে ওঠে। প্যাক আপেও তাই হয়— সবাই ভাব করে— আহা একটা দিন মাটি হল, কিন্তু সবাই খুশি। সবচে খুশি আমার মা। তিনি আনন্দ ঝলমল গলায় বললেন, বকু! আমার সঙ্গে চল এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চল।

'কোথায় যাচ্ছি না জেনেই বললি—'চল'।'

'তুমি যেখানেই নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। তুমি যদি লাযাতে নিয়ে যাও, সেখানেও যাব।'

'লাযাটা কোথায় ?'

'লাযা হচ্ছে একটা দোজখের নাম। সাতটা দোজখের একটার নাম লাযা।'

'আমি তোকে লাযাতে নিয়ে যাব কেন ? এটা কি ধরনের কথা। পাগলামী ছাগলামী কথা আমার সাথে বলবি না। আমার কাছে জ্ঞান ফলাবি না। আমি তোর পেটে জন্মাইনি, তুই আমার পেটে জন্মেছিস।'

মা রাগে গরগর করতে লাগলেন, আমি মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছি। এই হাসিতে মা'র রাগ আরো বাড়বে। তবে রাগটা কনট্রোলের ভেতর থাকবে। লাগামছাড়া হবে না। এই হাসি উনুনে অল্প অল্প তুষ ছড়িয়ে দেয়া হাসি। আমার আরেকটা হাসি আছে পেট্রল ঢেলে দেয়া টাইপ। ধুম করে আগুন।'

'বকু!'

'জ্বি মা।'

'কাপড় বদলা, ভাল কিছু পর।'

'তুমি যা বলবে তাই পরব। তুমি আগে সেজে গুজে আস। তারপর আমি। আমার চেয়ে তোমার সাজটা বেশি দরকার।'

'তার মানে ?'

'না সাজলেও আমাকে সুন্দর দেখাবে মা। বয়সের সৌন্দর্য। তোমার সেই সৌন্দর্যতো নেই। সাজগোজ করে সেটা কাভার দিতে হবে। তবে মা শোন, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে তুমি ঠোঁটে এত কড়া করে লিপস্টিক দিও না।'

আমি আবারো মিষ্টি মিষ্টি করে হাসলাম। মা রাগে কাঁপতে কাঁপতেই দোতলায় উঠে গেলেন। সেজে গুজে তাঁর নীচে নামতে এক ঘন্টার মত সময় লাগবে। এই এক ঘন্টা আমি নিজের মনে ঘুরতে পারি। হাফিজ আলির বাড়ি যদি আশে পাশে হয় তাহলে চট করে তার বৌকেও দেখে আসা যায়। তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎটা জেনে আসা যায়। যিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন তাঁর অতীতও বলতে পারার কথা। আমি তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জানতে চাইব না। আমি জানতে চাইব অতীত। আমার প্রশ্নগুলি হবে এ রকম—

বলুনতো ছোটবেলায় আমি কার সঙ্গে ঘুমুতাম ? মার সঙ্গে না বাবার সঙ্গে ? না-কি দু'জনের সঙ্গেই— মাঝখানে আমি, এক পাশে বাবা আর এক পাশে মা।

উত্তরটা হল আমি দু'জনের কারোর সঙ্গেই ঘুমুতাম না। আমি ঘুমুতাম আমার দাদীজানের সঙ্গে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে— বলুনতো আমি এই পর্যন্ত ক'বার পানিতে ডুবেছি ?

উত্তর হচ্ছে তিনবার। প্রতিবারই মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। প্রথমবার পানিতে ডুবি আমাদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনায়। পানি থেকে যখন আমাকে তোলা হয় তখন না-কি আমার সমস্ত শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। চোখের মণি উলটে গিয়েছিল। চোখের মণি উলটে যাওয়ার মানে কী আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোন ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর আগে আগে কিংবা মৃত্যুর সময় চোখের এই ঘটনাটা হয়ত ঘটে। যাই হোক আমাকে উঠোনে শুইয়ে রেখে সবাই যখন মরাকান্না শুরু করে তখন হঠাৎ করে আমি সামান্য নড়ে উঠে, ছোট্ট করে শ্বাস ফেলি। আমাকে নিয়ে ছোটাছুটি পড়ে যায়। এবং গ্রামের এক কবিরাজ আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এই ঘটনার পর আমার পানি-ভীতি হবার কথা। তা হয় নি উল্টোটা হয়েছে। পানি দেখলেই ছুটে কাছে যেতে ইচ্ছা করে। পানি হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই কারণে আরো দু'বার আমাকে পানিতে ডুবতে হল, প্রতিবারই জীবন সংশয়ের মত অবস্থা। আমাকে সাঁতার সেখানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি সাঁতার শিখলাম না। কারণ আমার মনে হল— সাঁতার শিখে ফেললেই আমার আর পানি ভাল লাগবে না। শান্ত সুন্দর কোন দিঘি দেখলে তার কাছে যেতে ইচ্ছা করবে না। কেন এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব ? আমার চারপাশে আনন্দময় ব্যাপারতো খুব কম। আচ্ছা দিলু যেমন দিঘির নীল জলে ডুবে মারা গেছে আমার বেলাতেও কি তাই হবে ? শুটিং এর শেষ পর্যায়ে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে আমি সাঁতার না জেনেও দিঘিতে ভাসছি। দিঘির চারপাশের গাছের অসংখ্য পাখি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে আর ভাবছে— ব্যাপারটা কী ? একটা হলুদ রঙের পাখি হয়ত আমার ভাসন্ত শরীরটার উপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে উড়ে যাবে। তার চোখে থাকবে বিস্ময়।

'কেমন আছেন ?'

আমি তাকালাম। সেলিম ভাই। উনিও কি আমার মায়ের মত নিঃশব্দে হাঁটা প্র্যাকটিস করছেন ? কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেই পারি নি। সেলিম ভাইকে দেখে চমকে ওঠার কোন মানে হয় না। কাজেই চমকালাম না। হাসি হাসি মুখে বললাম,

'আপনার খবর কী সেলিম ভাই ?'

'জ্বি ভাল।'

'চোখ লাল হয়ে আছে কেন ? রাতে ঘুম হয় নি ?'

'জ্বি না। টেনশনে ঘুম হয় নি। আজ শুটিং, স্যার কী করতে বলবেন আর কী করব এই টেনশনে..।'

'শুটিং যে প্যাক আপ হয়েছে সেই খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন।'

'জ্বি পেয়েছি।'

'তাহলেতো টেনশন কমে যাবার কথা।'

'জ্বি না, টেনশন কমে নি আরো বেড়েছে আজ সকালে নাশতা খেতে পারি নি। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম ঘুম থেকে উঠেই কাউকে কিছু না বলে ঢাকা চলে যাব।'

'সেটা করলেন না কেন ? যেটা ভাববেন সেটা করবেন। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে পড়বেন না। ঢাকায় পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা কি এখনো আপনার মাথায় আছে?'

'জ্বি আছে।'

'তাহলে এক কাজ করুন আগামীকাল ভোরে ঢাকায় চলে যান। আজ খোঁজ নিয়ে আসুন ঢাকার দিকের প্রথম বাস কখন ছাড়ে। বাস ভাড়া কত। আপনার কাছে কি ঢাকায় ফিরে যাবার মত টাকা আছে ?'

'জ্বি না।'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন আমার সঙ্গে একটু চলুন।'

'কোথায় ?'

'তেমন কোথাও না, একটু হাঁটা হাঁটি করব। একটু পরেই মা দোতলা থেকে নামবেন। নেমে শুনবে আমি আপনার সঙ্গে কোথাও গেছি। মা'র ব্রেইন ডিফেক্টের মত হয়ে যাবে। তিনি ভাব দেখাবেন যে খুব নরম্যাল আছেন। আসলে থাকবেন খুব এবনরম্যাল অবস্থায়। খুব মজা হবে।'

'মজা হবে কেন ?'

'আপনি বুঝবেন না। চলুনতো যাই। কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। মা যদি এখন হুট করে নেমে যায় তাহলে পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

'দাঁড়ান একটা ছাতা নিয়ে আসি— খুব রোদ।'

'আপনাকে ছাতা আনতে হবে না। চলুনতো।'

আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি— সেলিম ভাই আসছেন আমার পেছনে পেছনে। খুব যে উৎসাহের সঙ্গে আসছেন তা মনে হচ্ছে না। মানুষ অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, উনাকে দেখে মনে হচ্ছে উনি অনুরোধে রাইস-মিল গিলে ফেলেছেন। বেচারার মন থেকে অস্বস্তি ভাবটা কাটানো দরকার। কী করে কাটাব বুঝতে পারছি না। হালকা ধরনের গল্প টল্প করা যেতে পারে।

'সেলিম ভাই!'

'জ্বি।'

'বলুনতো দেখি চন্ডিগড় গ্রামটার বিশেষত্ব কী ?'

'কোন বিশেষত্ব নেই। বাংলাদেশের সব গ্রাম একরকম।'

'হয় নি। এই গ্রামের একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। দেখবেন এই গ্রামে একটু পর পর শিমুল গাছ। গাছে ভর্তি কড়া লাল রঙের ফুল। মনে হয় যে পুরো গ্রামটায় আগুন ধরে গেছে। ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে।'

'জ্বি।'

'চন্ডিগড় গ্রামটা দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনি শুনে দেখুনতো আইডিয়াটা কেমন ? আইডিয়াটা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যদি একটা করে শিমুল গাছ লাগিয়ে দি তাহলে কেমন হয় ? যখন ফুল ফুটবে তখন মনে হবে পুরো বাংলাদেশে আগুনের ফুল ফুটেছে। কোন বিদেশি বাংলাদেশে এলে হতভম্ব হয়ে বলবে— একী ? কোন দেশে এলাম ? আমার আইডিয়া কেমন ?'

'অদ্ভুত আইডিয়া।'

'খুব কি অদ্ভুত ?'

'না খুব অদ্ভুত না, তবে শিমুল গাছ না, লাগাতে হবে কৃষ্ণচুড়া গাছ আর রাধা চূড়া গাছ।'

'এমন কোন গাছ আছে যার ফুল নীল।'

'জারুল গাছ। থোকা থোকা নীল ফুল ফোটে।'

'তাহলে আসুন আমরা একটা কাজ করি— বাংলাদেশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে একটা করে কৃষ্ণচূড়া গাছ আর একটা করে জারুল গাছ লাগিয়ে দি। পাঁচ ছ' বছর পর গাছগুলি যখন বড় হবে তখন একটা ভয়ংকর কান্ড ঘটে যাবে।'

সেলিম ভাই কিছু বলছেন না। অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। মনে মনে হয়ত ভাবছেন— আচ্ছা এক পাগলী মেয়ের হাতে পড়লাম।

বৈজ্ঞানিকরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার করেন, এমন একটা আবিষ্কার করতে পারেন না যাতে অন্যের মনের কথা পরিষ্কার শোনা যাবে। ক্যালকুলেটারের মত ছোট্ট যন্ত্র। পকেটে লুকানো থাকবে। যন্ত্রের বোতাম টিপে দিলেই পাশের মানুষটার মনের কথা শোনা যাবে।

'সেলিম ভাই।'

'জ্বি।'

'কথা বলুন। এত চুপচাপ কেন ? না-কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না।'

সেলিম ভাই কিছু বললেন না। মাথা আরো নীচু করে ফেললেন। মনে হচ্ছে লজ্জা পাচ্ছেন।

'কাল ভোরে ঢাকা চলে যাবার প্রোগ্রামটা কি আপনার ঠিক আছে ?'

'জ্বি ঠিক আছে।'

'ঢাকা গিয়ে কী করবেন কিছু ঠিক করেছেন ?'

'জ্বি-না। প্রাইভেট টিউশনি করব।'

'প্রাইভেট টিউশনিই ভাল। স্বাধীন ব্যবসা। চেষ্টা করবেন বড়লোক কোন মেয়ের প্রাইভেট টিউটার হতে। মেয়েটার বয়স চৌদ্দ পনেরো হলে ভাল হয়। এই বয়সের মেয়েরা দ্রুত প্রেমে পড়ে। কোন রকমে বরশি দিয়ে একটা প্রেম গেঁথে ফেলতে পারলে আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপনি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন নাতো ?'

'জ্বি-না।'

'আপনি কেমন কাজের মানুষ এইবার দেখি— হাফিজ আলির বাড়িটা খুঁজে বের করুন।'

'কোন হাফিজ আলি ? যার স্ত্রী ভবিষ্যৎ বলতে পারে ? জাহেদা ?'

'আপনি তাহলে জানেন ?'

'জ্বি। ইউনিটের সবাই জানে!'

'আপনি কি তার কাছ থেকে আপনার ভবিষ্যৎ জেনে এসেছেন ?'

'উনি পুরুষদের সঙ্গে কথা বলেন না।'

'তাহলে ভবিষ্যৎ জানতে পারেন নি ?'

'জ্বি না।'

'এই সব কি বিশ্বাস করেন ?'

'জ্বি করি। আমাদের গ্রামেও এ রকম একটা ছেলে আছে। যা বলে লেগে যায়। তার নাম মতিন। কানা মতিন। কঞ্চির খোঁচা লেগে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

'এ রকম মানুষ সব গ্রামেই থাকে। বাংলাদেশের যে গ্রামেই যাবেন সে গ্রামেই একজন পাগল থাকবে, একজন জ্বীনে ধরা মানুষ থাকবে, একজন নজর খারাপ মানুষ থাকবে, নজর খারাপ মানুষের শুধু নজর লাগবে। সবই ভুয়া। ভুয়া পাগল, ভুয়া জ্বীন, ভুয়া নজর। পৃথিবীটা চলছেই ভুয়ার উপরে। জাহেদা মেয়েটাও বিরাট ভুয়া। ভুয়া ভাব মেয়েদের মধ্যে কম থাকে। হাফিজ আলির স্ত্রীর মধ্যে কী ভাবে চলে এল সেটাই আমার দেখার ইচ্ছা। সেলিম ভাই আপনি কি জানেন জাহেদা কী কী ভবিষ্যৎ বাণী করেছে ? আমি সব ক'টা লিখে রাখব। পরে মিলিয়ে দেখব।'

'উনি বলেছেন—চন্ডিগড়ে ছবির শুটিং কোনদিন হবে না। বিরাট গন্ডগোল লাগবে। পানিতে ডুবে একটা মানুষ মারা যাবে।'

'এই কথা বলেছে ?'

'জ্বি। খুব জোর দিয়ে বলছে।'

'আপনি কি এই ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছেন ? শুটিং করতে এসে পানিতে ডুবে মরার চেয়ে ঢাকায় প্রাইভেট টিউশনি করা ভাল। তাই না ? প্রাইভেট টিউশনি এম্নিতে খুব বোরিং ব্যাপার কিন্তু কোন মতে পড়া পড়া খেলার সঙ্গে যদি প্রেম ঢুকিয়ে দিতে পারেন তাহলে পুরো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে।'

সেলিম ভাই মাথা নীচু করে হাঁটছেন, মাঝে মধ্যে চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। পৃথিবীর সব মেয়েদের ভেতর অলৌকিক একটা ক্ষমতা থাকে। কোন পুরুষ তার প্রেমে পড়লে মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারে। এই ক্ষমতা পুরুষদের নেই। পুরুষদের কানের কাছে মুখ নিয়ে কোন মেয়ে যদি বলে— শোন আমার প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি মরে যাচ্ছি। তারপরেও পুরুষ মানুষ বোঝে না। সে ভাবে মেয়েটা বোধ হয় এ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথায় মরে যাচ্ছে। সেলিম ভাইকে দেখে এখন মনে হচ্ছে— তাঁর খবর হয়ে গেছে। কাল ভোরে তিনি কিছুতেই ঢাকা যেতে পারবেন না। তাঁকে থেকে যেতে হবে— শুধু মাত্র আমার আশে পাশে থাকার আনন্দের জন্যে।

হাফিজ আলির বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মাটির দু'টা ঘর। জরাজীর্ণ অবস্থা। বাইরের উঠোন খুবই নোংরা। ঝোপ ঝাড়ে একাকার। কেউ কোনদিন উঠোন ঝাঁট দেয় নি। একটা মুরগী মরে পড়ে আছে। তার উপর রাজ্যের মাছি। বাড়ির সামনে খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা আছে। সেই ছাগলটাও

মনে হচ্ছে অসুস্থ। হাফিজ আলি উঠোনে বসে আছে। সে যে হাফিজ আলি তা বুঝলাম কারণ সেলিম ভাই বললেন, হাফিজ ভাল আছ ? হাফিজ আলি তার জবাব দিল না। ছাগলটার মত হাফিজ আলিও মনে হল অসুস্থ। চোখ টকটকে লাল। খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে বসে আছে—পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে। তার দৃষ্টি মরা মুরগীটার দিকে। এই মুরগীটা বোধ হয় তার প্রিয় ছিল। কিংবা পচাগলা মুরগীর উপর মাছি ওড়ার দৃশ্যে সে মুগ্ধ। বিকট গন্ধে আমার নাড়ি ভুড়ি উল্টে আসার মত হচ্ছে।

সেলিম ভাই বললেন, হাফিজ আলি তোমার কি শরীর খারাপ ?

'না।'

'ইনি এসেছেন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দু'টা কথা বলার জন্যে।'

'যান কথা বলেন। আপনে এইখানে থাকেন। পুরুষ মানুষের অন্দরে যাওয়া নিষেধ। পর্দা পুষিদার বিষয় আছে।'

'আমি যাব না। আমি এইখানেই থাকব।'

সেলিম ভাই দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি ভেতরে চলে গেলাম। বাড়ির ভেতরটা বাইরের মত নয়। ঝকঝক তকতক করছে। মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগে ঝাঁট দেয়া হয়েছে। সবচে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে উঠোনে গম্ভীর মুখে একটা বক হাঁটাহাঁটি করছে। বক খালে বিলে ধানের ক্ষেতে থাকে। মানুষ দেখলে উড়ে যায়। এ দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে হাঁস চলে গেল। মুরগী তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলে গেল সে ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু দেখল। আমি মুগ্ধ হয়ে বকের কাণ্ডকারখানা দেখছি তখনই হাফিজ আলির স্ত্রী জাহেদার গলা শুনলাম—'ভইনডি পালা বক পাখি।"

আমি পোষা বক পাখি দেখে যেমন বিস্মিত হলাম, জাহেদাকে দেখেও তেমনি বিস্মিত হলাম। নিতান্তই কিশোরী একটা মেয়ে। গায়ের রঙ কাল। কালো রঙ যে কত মিষ্টি হতে পারে মেয়েটাকে না দেখলে আমার জানা হত না। কী মায়াকাড়া মুখ। মনে হচ্ছে শাড়ি পরাও ঠিকমত শেখে নি। শাড়ি গা থেকে নেমে নেমে যাচ্ছে। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। পায়ে আলতা।

আমি বললাম, বক পোষ মানে ?

'জ্বে ভইনডি মানে। খুব ছোটবেলায় বকের বাসা থাইক্যা ধইরা আনতে হয়। চউখ ফুটনের আগেই ধইরা আনতে হয়। চউখ ফুইট্যা হে দেখে মানুষ। তহন হে মানুষরেই জানে তার বাপ-মা।'

'এই বক কে ধরে এনেছে, আপনি ?'

'জ্বে না। মায়ের বুক খালি কইরা বকের বাচ্চা আনা মেয়েছেলের কাম না ভইনডি।'

'বক যে পোষ মানে মানুষের সঙ্গে থাকে এই প্রথম দেখলাম।'

'ভইনডি মানুষ পারে না এমন কাম নাই। মানুষ সব পারে।'

'এই বকটার কি কোন নাম আছে?'

'এর নাম ধলা মিয়া। ধলা মিয়া কইয়া ডাক দেন অফনের বগলে আসব।'

আমি ধলামিয়া বলে ডাক দিলাম। আশ্চর্য কান্ড—বকটা গম্ভীর মুখে হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসছে। আমি চমকে দু'পা পেছনে গেলাম। জাহেদা কিশোরীর মতই খিলখিল করে হেসে উঠল। এই মেয়ে ভবিষ্যৎ বলবে কী নিতান্তই সহজ সরল গ্রাম্য বধু।

'ভইনডি পান খাইবেন?'

'হ্যাঁ খাব। আর আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করব।'

'আমি কোন গল্প জানি নাগো ভইনডি।'

'আপনি না জানলেও আমি জানি। আমি গল্প বলব আপনি শুনবেন।'

মেয়েটা আমার এই কথাতেও খিল খিল করে হেসে উঠল। তার হাসির মধ্যে সামান্য অস্বাভাবিকতা আছে। গ্রামের মেয়ে এত শব্দ করে হাসে না। আমি তার হাসির মাঝখানেই বললাম, আপনি নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?

'গেরামের মানুষ এইগুলোন বানাইছে। আমি কিচ্ছু বলতে পারি না।'

'আপনি না-কি বলেছেন— এখানে শুটিং হবে না। একটা মানুষ মারা যাবে।'

'জ্বে বলেছি।'

'কেন বলেছেন?'

জাহেদা আবারো শব্দ করে হাসছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে মেয়েটা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পারে। মেয়েটার হাসির শব্দে বক উড়ে গেল—দু'টা চক্কর দিয়ে বসল জাহেদার মাথায়। জাহেদা খুব স্বাভাবিক। এই ব্যাপারটায় সে যেন অভ্যস্ত। আমি অবাক হয়ে দেখছি, একটা মেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে তার মাথায় গম্ভীর মুখে একটা বক বসে আছে।

ঢাকায় ফিরে গিয়ে যদি এই গল্প বলি— কেউ বিশ্বাস করবে না। এটা কোন কথা হল— একটা তরুণী মেয়ে ঘরের কাজ কর্ম করছে তার মাথায় গম্ভীর মুখে একটা বক বসে আছে! বকটার নাম ধলা মিয়া।

জাহেদা আমাকে পাটি এনে দিল। পান সুপারি এনে দিল। আমি পা ছড়িয়ে এমন ভাবে বসলাম যেন কত দিনের পরিচিত এই বাড়ি। জাহেদা আমার পাশে বসল না। সে ঘরের কাজ কর্ম করে যাচ্ছে এবং আমার কাছে তা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। অতিথি এসে অতিথির মত আরাম করে বসে থাকবে। গৃহকর্ত্রী তার কাজ করতে থাকবে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথা বলবে।

'ভইনডি আমার পুরুষ মানুষটারে দেখছেন ?

'হাফিজ আলির কথা বলছেন ? যে বাইরে বসে আছে ?

'হ। গাঞ্জা খাইয়া শরীরটা কী বানাইছে। বেশি দিন বাঁচব না। তার মৃত্যু ঘনাইছে।'

'গাজা খায় ?'

'নিশার জিনিস সব খায়। চরস খায়, ভাঙ্গের সরবত খায়। যখন খাওনের কিছু পায় না তহন কেরোসিন খায়। তয় গাঞ্জাটা খায় বেশি।'

জাহেদা আবারো হাসছে। আমি বললাম, স্বামী নেশা করে বেড়াচ্ছে এটাতো কোন মজার কথা না। আপনি এ রকম করে হাসছেন কেন ?

'ভইনডি আমার হাসি রোগ আছে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার পিতা মারা গেল। সন্ন্যাস রোগে ধড়ফড় কইরা মৃত্যু। হে উঠানে ধড়ফড় করে আর আমি হাসি। হাসি থামে না। কত মাইর যে হাসির কারণে খাইছি। এখন আর কেউ মারে না, কিছু কয়ও না। স্বামী গাঞ্জাখোর— তার সামনে হাসলেও যা কানলেও তা।

'আপনার ধারণা এই গ্রামে শুটিং হবে না ?'

'এম্নে এম্নে বলছি। এইটা নিয়া চিন্তা কইরেন না। আল্লাহপাক মানুষরে অধিক চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। অবশ্য মানুষ অধিক চিন্তা করেও না—ভাব দেখায় হে অধিক চিন্তা করে। হি হি হি।'

আমি মুগ্ধ হয়ে জাহেদার হাসি দেখছি। তার মাথার উপর বসে থাকা বকটা উড়ে গাছের দিকে চলে গেছে। হাসতে হাসতে জাহেদার চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখের পানি শাড়ির আঁচলে মুছছে। বকটা গাছে গিয়ে বসল না। জাহেদার মাথার উপর চক্কর খেতে লাগল। আচ্ছা এরা এই বকটার নাম ধলা মিয়া রাখল কেন ? বকটা কি পুরুষ ?

আমাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে মায়ের কী অবস্থা হবে তা আন্দাজ করেছিলাম। আন্দাজের চেয়েও বেশি হয়ে গেল। মা'কে দেখলাম বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মুখ নীল। বুকে নিশ্চয়ই ব্যথা হচ্ছে—বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। হার্ট এ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ সবই দেখা যাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু

ঘাম। আমি সহজ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলাম। মা'র দিকে না তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে— চোখে-মুখে পানি দিলাম। আমি জানি ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মা আমাকে দেখতে পেয়েছেন এখন দ্রুত তাঁর শারীরিক সমস্যা কেটে যেতে শুরু করবে। তিনি বিছানায় উঠে বসে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করবেন। কঠিন কঠিন সব কথা হাউইয়ের মত মার মুখ থেকে বের হয়ে আমার দিকে ছুটে আসবে। যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই আমি চোখে মুখে পানি দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখছি।

'কোথায় গিয়েছিলি ?'

'কাছেই একটা বাড়িতে।'

'আমিতো পুরো এলাকা চষে ফেলেছি— তোকেতো দেখি নি।'

'ভাল মত চষ নি। চষলে পেতে।'

'তোর সঙ্গে ঐ হারামজাদাটা ছিল— সেলিম ?'

'হ্যাঁ এই হারামজাদাটা অবশ্যি ছিল।'

'তুই কি জানিস ইউনিটে তোকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে।'

'ছিঃ ছিঃ পড়ার কী আছে ? আমি একজনকে নিয়ে বেড়াতে বের হতে পারব না ?'

'যার তার সঙ্গে বের হয়ে যাবি ? একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে তোর বয়সী একটা মেয়ে যদি বের হয় তাহলে সবাই কী ভেবে নেয় তুই জানিস ?'

'কী ভেবে নেয় ?'

'যা ভাবার তাই ভাবে ?'

'সেই তাইটা কী ?'

মা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, সবাই ভাবে ছেলেটা তোকে নিয়ে গেছে পাট ক্ষেতে।'

'পাট ক্ষেত দেখতে নিয়ে যাওয়াটা কি মা খুব দোষনীয় কিছু ?

ন্যাকা সাজবি না। আমার সঙ্গে ন্যাকা সেজে পার পাবি না। বদ মেয়ে কোথাকার।'

'এত জোরে চিৎকার করো না মা ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে যাবে। বাকি জীবন হাঁসের মত ফ্যাস ফ্যাস করতে হবে।'

'তুই এতক্ষণ ধরে মুখ ধুচ্ছিস কেন ?'

আমি হাসলাম। বেসিনের উপরে পারা নষ্ট হয়ে যাওয়া আয়না বসানো। সেই আয়নায় সব কিছুই ঢেউ খেলানো দেখায়। আমি আয়নায় দেখলাম একটা মেয়ে ঢেউ খেলানো হাসি হাসছে। আয়নাতেই দেখা যাচ্ছে মা নেমে আসছেন। তিনি

ধাক্কা দিয়ে আয়নায় আমার মাথা ঠুকে দেবেন। ঝনঝন শব্দে আয়না ভাঙ্গবে। ভাঙ্গা কাচ ঢুকে যাবে কপালে। অভিনয় করতে হবে কপালে কাটা দাগ নিয়ে। না-কি তিনি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ফাঁসির আসামীকে ছোট্ট ঘরে আটকে রাখলে তার কী হয় আমি জানি। আমার যদি কখনো ফাঁসি হয়—তাহলে সলিটারী কনফাইনমেন্টে থাকার সময়টা আমার খুব খারাপ কাটবে না।

মা ঈগলের মত ছুটে আমার কাঁধ ধরে ফেললেন আর তখনি ঘরে ঢুকলেন পাপিয়া ম্যাডাম। মা'র মুখ সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি হয়ে গেল। তাকে দেখে এখন মনে হবে তিনি তার অতি আদরের কন্যার সঙ্গে বাথরুমে কিছু অন্তরঙ্গ আলাপ করছেন। মা বললেন, কেমন আছেন ?

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ভাল।

মা বললেন, মেয়ের মাথার চুল ঠিক করে দিচ্ছিলাম। এমন পাগলী মেয়ে, সারা সকাল কোথায় কোথায় ঘুরেছে— দেখেন না চুলের অবস্থা। একা একাই রওনা হয়েছিল, আমি বললাম, একা যাবি না। সেলিমকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

আমি মা'র স্ট্র্যাটিজি দেখে হাসলাম। তিনি সবাইকে বলে বেড়াবেন সেলিমকে আমার সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে তিনিই পাঠিয়েছেন। আমি নিয়ে যাই নি।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, বকুল একটু বারান্দায় এসো। আমি বারান্দায় চলে এলাম।

মেয়েকে লেখা চিঠি তোমাকে পড়াব বলেছিলাম— নাও পড়ে দেখ।

বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি।

মা,

ও আমার মা। আমার সোনা মা, ময়না মা, গয়না মা। কত দিন তোমাকে দেখি না। রাতে যখন ঘুমুতে যাই, আমার পাশে তোমার বালিশটা রেখে দি। বালিশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমুতে যাই। আমার মনে হয় বালিশে মাথা রেখে তুমি ঘুমুচ্ছ। মা তোমাকে না দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আবার আমি তোমাকে কবে দেখব ?

তোমার

মা।

চিঠি পড়তে পড়তে কেন জানি আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি পাপিয়া ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

রাজকীয় ব্যাপার। প্রায় শ'খানেক মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছি। আমার মাথার উপর শুটিং এর বিশাল রঙ বেরঙের ছাতা। আমি মেকাপ নিচ্ছি। মেকাপম্যান সুবীরদা আমার মুখে প্যানকেক ঘষছেন। মেকাপের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এই হল শুরু। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে— শুটিং এর সবচে খারাপ অংশ কোনটি ? আমি বলব, মেকাপ নেয়া। ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর এবং মাঝেমধ্যে গ্লানিকরও। একজন পুরুষ মানুষ মুখে হাত ঘষছে— ব্যাপারটা কেমন না ?

তবে সুবীরদার কাছে মেকাপ নিতে কোন গ্লানিবোধ হয় না। তিনি শুরুই করেন 'মা' ডেকে। মেকাপের পুরো সময়টা টুকটুক করে গল্প করেন। যখন মেকাপ শেষ হয়ে যায় তখন মনে হয়—আহা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন ? আরও খানিকক্ষণ থাকলে কী হত! মজার মজার গল্প শোনা যেত।

আমি মেকাপ নিচ্ছি গাছতলায়। ঘরের ভেতর নেয়া যাচ্ছে না— ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আপাতত নেই। যখন আসে তখন বাল্বগুলি এমন মিটিমিটি করে জ্বলে যে মনে হয় ইলেকট্রিসিটি না থাকাটাই ভাল ছিল।

গাছের নীচে রাণী রাণী ভাব ধরে মেকাপ নিতে আমার ভালই লাগছে। সুবীরদা মাথার উপর ছাতা দিয়ে ভাল করেছেন। পাখিরা এখন আর মাথায় বাথরুম করতে পারবে না। পরশু বিকেলে পাপিয়া ম্যাডাম গাছের নীচে বসে কফি খাচ্ছিলেন হঠাৎ তার মাথায় পাখি বাথরুম করে দিল। আমি খুব ভদ্র ভাষা ব্যবহার করলাম। আসলে আমার বলা উচিত— পাখি 'গু' করে দিল। তিনি পাখিদের কাণ্ডে হতভম্ভ হয়ে গেলেন। কফি খাওয়া তাঁর মাথায় উঠল। সাবান শ্যাম্পু নিয়ে ছোটাছুটি পরে গেল। মাথা ধোয়া হল কয়েকবার। মাথায় আয়না ধরা হলো। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন— এখনো পরিষ্কার হয় নি।

ম্যাডামের শুচিবায়ুর মতো আছে। যতবার ধোয়া হচ্ছে ততবারই বলছেন— পরিষ্কার হয় নিতো— এখনো দুর্গন্ধ আসছে। আমার বমি এসে যাচ্ছে।

পাপিয়া ম্যাডামের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই ভাবল এটা আর কিছুই না—নায়িকার নখরা। বড় নায়িকা হলেই নখরামি করতে হয়। তিনি খানিকটা করছেন—এর বেশি কিছু না। কিন্তু আমি জানি উনার এটা নখরামি না। কিছু কিছু মানুষ এরকম থাকে।

আমি নিজেওতো এরকম। শুয়োপোকা দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আমার সবচে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে শুয়োপোকা হেঁটে যাচেছ। গোঁফওয়ালা পুরুষ মানুষ এই কারণেই আমার অপছন্দ। গোঁফটাকে আমার শুয়োপোকার মতো মনে হয়। নাকের নীচে একটা শুয়োপোকা নিয়ে একজন পুরুষের মুখ আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। ভাবতেই আমার শরীর যেন কেমন করতে থাকে।

সমস্যা হচ্ছে—আমাদের এই ছবির যিনি জামিল হয়েছেন তাঁর পুরুষ্টু গোঁফ আছে। আমাকে এই গোঁফো মানুষটার প্রেমে পড়তে হবে। আমি জানি তিনি কাছাকাছি এলেই আমার চোখমুখ শক্ত হয়ে আসবে। সহজ স্বাভাবিক অভিনয় আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। আজ যদি আমার পাপিয়া ম্যাডামের মতো ক্ষমতা থাকতো আমি বলতাম—গোঁফ আছে এমন কারোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। হয় উনাকে গোঁফ ফেলে দিতে হবে কিংবা গোঁফ নেই এমন অভিনেতা আমার জন্যে আনতে হবে। আমার মা'র ধারণা একদিন এরকম ক্ষমতা আমার হবে। অটোগ্রাফের জন্যে পাগল হয়ে লোকজন আমার পেছনে পেছনে ছুটবে। আমাকে নিউ মার্কেটে কিছু কিনতে গেলে বোরকা পরে যেতে হবে। মা আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন—বুঝলি বকু, আমরা দু'টা সৌদি বোরকা কিনে ফেলব। তোর জন্যে একটা, আমার জন্যে একটা। সারা শরীর ঢাকা, শুধু চোখ বের হয়ে আছে। চোখ দেখেতো আর আমাদের চিনতে পারবে না। বোরকার জন্যে আমরা পার পেয়ে যাব। মজা করে শপিং করব।

আমি বললাম, তোমার বোরকার দরকার কী মা ? তোমাকেতো কেউ চিনবে না।

'চিনবে না কেন ? তোকে চিনলেই আমাকে চিনবে। তোর ইন্টারভ্যুর পাশাপাশি আমার ইন্টারভ্যুও ছাপা হবে।'

'আমার সুন্দর শান্তির সংসার হোক এটা তুমি চাও না মা ?'

'চাব না কেন ? অবশ্যই চাই। আমার সংসার হলো না বলে তোরও হবে না, এটা কেমন কথা ! তোর বাবুগুলিকে কে মানুষ করবে ? আমিই করব। তুই তোর মত অভিনয় করে যাবি আমি দেখব তোর সংসার...।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ও আচ্ছা।

সুবীরদা মেকাপের প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন। এখন যে কাজটা তিনি করবেন সেটা আমার খুব পছন্দের। একটা ভেজা টাওয়েল আমার মুখের উপর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলবেন। ফাউন্ডেশন বসার ব্যবস্থা। আমাকে ভেজা টাওয়েলের আড়ালে রেখে সুবীরদা এক কাপ চা খাবেন। সিগারেট খাবেন। দশ মিনিট এই ভাবে যাবে তারপর শুরু হবে ফিনিশিং কাজ। সুবীরদার মেকাপের হাত অসাধারণ। তিনি যখন কাজ শেষ করে আমার হাতে আয়না ধরিয়ে দিয়ে বলবেন— মা দেখতো। তখন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠব। কারণ আয়নাতে যে বসে আছে তাকে আমি চিনি না। সে অন্য কোন মেয়ে। পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে সে রাঙ্গা রাজকন্যাদের মত বসে আছে।

'বকুল।'

'জ্বি সুবীরদা।'

'আমি তোমাকে মা ডাকি আর তুমি আমাকে সুবীরদা ডাক এটা কেমন কথা মা?'

'আর ডাকব না। এখন থেকে আপনাকে চাচা ডাকব।'

'মা তোমার যা ইচ্ছা ডাকবে। আমার তোমাকে মা ডাকতে ইচ্ছে করে আমি মা'ই ডাকব।'

আমি আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছি। আমার মুখের উপর ভেজা টাওয়েল। মুখটা ঠান্ডা হয়ে আছে। সুবীরদা শব্দ করে চা খাচ্ছেন। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে চা-টা খুব মজা হয়েছে। আমার নিজেরো চা খেতে ইচ্ছে করছে। যদিও আমার এত চায়ের তৃষ্ণা নেই। কাউকে মজা করে কিছু খেতে দেখলে আমারো খেতে ইচ্ছে করে। কাউকে পান খেতে দেখলে আমার পান খেতে ইচ্ছে করে।

চোখ বন্ধ করেই টের পেলাম পাপিয়া ম্যাডাম এসেছেন। সুবীরদা চা খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি মিষ্টি সুবাস পাচ্ছি। পাপিয়া ম্যাডামের গা থেকে এই সুগন্ধ আসছে। তিনি নিশ্চয়ই খুব দামী কোন পারফিউম ব্যবহার করেন।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'তুমি কি ঘটনা শুনেছ?'

আমি শংকিত গলায় বললাম, কোন ঘটনার কথা বলছেন?

'আমাদের ডিরেক্টর সাহেব রাস্তার একটা ছেলেকে এত বড় রোলে দাঁড়া করিয়ে দিচ্ছেন।'

'উনি যা করছেন— নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে করছেন।'

'না। ও সব কিছু ভেবে চিন্তে করে না। ঝোঁকের মাথায় হুট-হাট ক'রে করে। ও এখন যা করছে রাগের মাথায় করছে। ফরহাদ আসেনি—রাগে ডিরেক্টর সাহেবের ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। কাজেই হাতের পাশে রাম-শ্যাম-যদু-মধু-কদু যা পেয়েছে—দাঁড়া করিয়ে দিয়েছে। সবাই অভিনয় জানলেতো কাজই হত।'

'উনি নিশ্চয়ই অভিনয় আদায় করে নেবেন।'

'কাচকলা আদায় করে নেবে।'

সুবীরদা আমার মুখের উপর থেকে ভেজা তোয়ালে সরিয়ে দিলেন। পাপিয়া ম্যাডাম সুবীরদার দিকে তাকিয়ে বললেন—সুবীরদা আপনি একটু যানতো আমি বকুলের সঙ্গে দু'টা কথা বলব। সুবীরদা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি বসুন।

পাপিয়া ম্যাডাম বিরক্ত গলায় বললেন, আমি বসব না। যা বলার বলে যাচ্ছি। তুমি মন দিয়ে শোন।

আমি ভীত গলায় বললাম, বলুন। পাপিয়া ম্যাডামের ভাব ভঙ্গি দেখে আমার কেন জানি ভয় ভয় লাগছে। রাগে উনার শরীর কাঁপছে। উনাকে এত রাগতে আমি কখনো দেখি নি।

'শোন বকুল— রাস্তার একজন মানুষের সঙ্গে আমি অভিনয় করব না। আমার বাছ বিচার আছে। ও ক্যামেরা ওপেন করছে করুক। আমি কিচ্ছু বলছি না। আজ বিকেলে নাকি ঐ গাধাটার সঙ্গে আমার কাজ হবে। সেই কাজ আমি করব না। আমি বিকেলে চলে যাব। আমার গাড়ির চাকা লিক হয়েছে। ড্রাইভারকে চাকা সারিয়ে আনতে বলেছি।'

'ডিরেক্টর সাহেবকে বলেছেন ?'

'না বলি নি। বলার দরকার দেখছি না।'

'আগে থেকে উনাকে বলে রাখলে—উনি হয়ত শুটিং বন্ধ রেখে বিকল্প ব্যবস্থা করবেন। নয়ত শুধু শুধু ফিল্ম নষ্ট হবে।'

'হোক ফিল্ম নষ্ট।'

'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিও উনাকে বলতে পারি।'

'তোমাকে বলতে হবে কেন ? কথা বলার জন্যে আমার পীর ধরার দরকার নেই।'

পাপিয়া ম্যাডাম হন-হন করে চলে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। তাঁর রাগ কমে নি। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন রাগ কমানোর জন্যে— রাগ না কমিয়েই চলে যাচ্ছিলেন— আবার এসেছেন। আমি কি তাঁর রাগ কমানোর চেষ্টা করব না আরো রাগ বাড়িয়ে দেব ? দু'টা কাজই আমি পারি। ভালভাবেই

পারি। মা'র সঙ্গে থেকে শিখেছি— কী করে কত দ্রুত কাউকে রাগানো যায়। কিংবা রাগ কমানো যায়। আমি ঠিক করলাম পাপিয়া ম্যাডামের রাগ বাড়িয়ে দেব।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'ইডিওটিক কাজ আমার পছন্দ না। একটা কাজ হবে তার পেছনে কোন প্ল্যানিং থাকবে না, হোয়াট ইজ দিস?'

'আমি কি উনার পক্ষ হয়ে একটা কথা বলব?'

পাপিয়া ম্যাডাম তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারছি তাঁর চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। মনে মনে খানিকটা ভয়ও পাচ্ছি। আমি যার পক্ষ হয়ে কথা বলব তাঁর উপরের রাগের ভাগটা আমাকেই নিতে হবে।

'মঈনের পক্ষ হয়ে তুমি কথা বলবে?'

'জ্বি।'

'কী কথা?'

'নতুনদের যদি ছবিতে না নেয়া হয় তাহলে তারা সুযোগ পাবে কীভাবে? এখন যারা অভিনয় করছেন তাঁরা সবাইতো এক সময় নতুন ছিলেন।'

'নতুনদের নেয়ার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। তাই বলে তুমি একটা প্রোডাকশান বয়কে ছবির নায়ক বানিয়ে দেবে? হাউ কাম! সেলিম বলে যে ছেলেটাকে নেয়া হয়েছে— তুমি কি জান সে একজন প্রোডাকশান বয়।'

'ও।'

'সে সেদিন পর্যন্ত ফুট ফরমাশ খেটেছে— আমাকে চা এনে দিয়েছে তার সঙ্গে হঠাৎ করে প্রেমের ডায়ালগ আমি বলব কী করে? আমরা কেউ রোবট না যে ডিরেক্টর সাহেব যা বলবেন তাই করে যাব। অভিনয় পেশা হিসেবে নিয়েছি বলেই অভিনয়ের স্বার্থে আমার বাসার কাজের ছেলেটিকে আমি জড়িয়ে ধরে চুমু খাব না-কি?'

আমি অবাক হয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম— পাপিয়া ম্যাডামকে আমি রাগাতে চাচ্ছিলাম— এখন দেখি উল্টোটা হচ্ছে, তাঁর রাগ পড়ে যাচ্ছে। মা'কে দিয়ে সবাইকে বিচার করলে হবে না, একেকজন মানুষ একেক রকম।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'সরি তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম। তুমি মেকাপ শেষ কর। আমি যাচ্ছি।'

'আপনার মেয়েকে লেখা চিঠি কি পোস্ট করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'ওর নাম কী?'

'ওর ডাক নাম খুব ইন্টারেস্টিং— এক অক্ষরের নাম— 'নি'। আমি ইচ্ছা করে রেখেছি যেন আর কেউ এই নাম রাখতে না পারে। আমি চাচ্ছি যেন পৃথিবীর কেউ আমার মেয়ের নামে তার নাম না রাখে।'

'নি নাম আর কেউ রাখবে বলে মনে হয় না।'

পাপিয়া ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, তাদের নামও সে রকম আলাদা হওয়া উচিত।

'এত নাম পাওয়াওতো মুশকিল।'

'কোন মুশকিল না, ইচ্ছা থাকলেই হয়। কম্পিউটারে সব নাম ঢুকানো থাকবে। কেউ তার ছেলেমেয়ের নাম রাখার আগে কম্পিউটার সার্চের ব্যবস্থা করবে।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, পাপিয়া ম্যাডামের চোখে মুখে রাগ, বিরক্তি কিছুই নেই। শান্ত মা মা একটা ভাব। মেয়ের প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর মুখ বদলে গেছে। একজন মায়ের কাছে তাঁর মেয়ে কি এত প্রিয়?

'বকুল, আমি যাচ্ছি। ডিরেক্টর সাহেবের নতুন অভিনেতার শট নেবার সময় আমি উপস্থিত থাকব। দেখব নতুন অভিনেতার কাণ্ড কারখানা।'

ম্যাডাম চলে গেলেন। সুবীরদা আবার মেকাপ শুরু করেছেন। আর কতক্ষণ লাগবে কে জানে। আমি চাচ্ছি— দ্রুত শেষ হোক। সেলিম ভাইয়ের প্রথম শটের সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

সেলিম ভাইয়ের শট নেয়া হচ্ছে। তাঁর জীবনের প্রথম শট। কে জানে হয়তোবা শেষ শটও। তিনি যেমন নার্ভাস, ডিরেক্টর সাহেবও নার্ভাস। আমি পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছটা হল কাঠবাদামের গাছ। আমি একজনকে নাম জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। এই কাঠবাদাম কিন্তু খাওয়া যায় না।

পাপিয়া ম্যাডাম মাথায় স্কার্ফ বেঁধে নিয়েছেন যেন মাথায় পাখি 'গু' করতে না পারে। ডিরেক্টর সাহেবও গাছের নীচেই আছেন। এতক্ষণ ছিলেন না, এই মাত্র এসেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী খবর? কাকে বললেন, আমাকে না পাপিয়া ম্যাডামকে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় কাউকেই না। জিজ্ঞেস করার জন্যে জিজ্ঞেস করা। প্রচণ্ড টেনশনে তাঁর ভুবন ছোট হয়ে গেছে। তিনি হাত ইশারা করে সেলিম ভাইকে ডাকলেন।

সেলিম ভাইকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। কাঠবাদামের বাদাম খাওয়া যায় না কেন ? এই বাদাম গাছটার পাতা এমন ঘন যে সূর্যের আলোর ছিটেফোঁটাও নীচে আসছে না। পিন পিন শব্দে মশা উড়ছে। খুব ছোট মশা—চোখে দেখা যায় না এমন। ছোট হলেও এরা কামড়াতে ওস্তাদ। কামড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফুলে যায়। আমি একটু শংকিত বোধ করছি। মশার কামড়ের ভয়ে শংকিত না। মশা যদি মুখে কামড়ায়— মুখ ফুলে উঠবে। ক্যামেরায় তা ধরা পড়বে। ডিসকনটিনিউটি হয়ে যাবে। দেখা যাবে একই দৃশ্যে একবার থুতনির কাছটা মশার কামড়ে ফুলে আছে— আরেকবার ফুলে নেই।

সেলিম ভাইকে দেখে মায়া লাগছে। মনে হচ্ছে উনি পুরোপুরি দিশা হারিয়ে ফেলছেন। নৌকায় করে শান্ত হ্রদ পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে হ্রদে ফেলে দিয়ে নৌকা উধাও হয়ে গেছে। ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না, তারপরেও প্রাণপনে চেষ্টা করছেন ভেসে থাকতে। ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন ঠিকই কিন্তু মনে মনে ভাবছেন— ভেসে থাকার দরকার কী ডুবে গেলেই হয়। সেলিম ভাইয়ের গেটাপ খুব ভাল হয়েছে। জিনসের প্যান্ট। প্যান্টের উপর স্ট্রাইপ দেয়া হাফ হাওয়াই সার্ট। সার্টে বেমানান সাইজের দু'টা প্রকান্ড পকেট। পকেট ভর্তি জিনিস পত্র। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। পায়ে কাপড়ের জুতা। কোমড়ে চামড়ার বেল্টে একটা হালকা নীল রঙের ফেস টাওয়েল গুঁজে দেয়া হয়েছে। তার চুলগুলিকে কিছু একটা করা হয়েছে— ফুলে ফেঁপে আছে। প্রাম করা হয়েছে কি ? সুবীরদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। চুলের এই কায়দাটা দরকার ছিল। সুবীরদা আরেকটা খুব ভাল কাজ করেছেন— সেলিম ভাইয়ের গালে নীলচে আভা নিয়ে এসেছেন। যাদের মুখ ভর্তি ঘন দাড়ি তারা শেভ করলে মুখে নীলচে আভা দেখা যায়। পুরুষের ফরসা মুখ থেকে নীলচে জ্যোতি বের হয়ে আসছে— এই দৃশ্যটা আমার খুব ভাল লাগে।

ডিরেক্টর সাহেব সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। দৃশ্য বুঝিয়ে দেবেন। বুঝিয়ে দেবার এই কাজটি ভদ্রলোক ভাল করেন। শুধু ভাল না, খুব ভাল। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। ডিরেক্টর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন— কেমন আছ সেলিম ?

'জ্বি স্যার ভাল।'

'জ্বি স্যার ভাল— এমন মিন মিন করে বলছ কেন ? শক্ত করে বল। এমন ভাবে বল যেন ইউনিটের সবাই শুনতে পায়।'

সেলিম ভাই আবারো বললেন—জ্বি স্যার ভাল।

এবার আগের চেয়েও নিচু গলায়।

' হয় নি। আরো ফোর্সফুলি বলতে হবে। তুমি এক কাজ কর— নাও মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বল—'জ্বি স্যার ভাল।'

তিনি সেলিম ভাইয়ের হাতে ডিরেক্টরের হ্যান্ড মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিলেন।

'সেলিম বটগাছটার দিকে তাকাও। বটগাছে কয়েকটা হরিয়াল পাখি বসে আছে দেখতে পাচ্ছ ? তুমি হ্যান্ড মাইক্রোফোনটা পাখিদের দিকে তাক করে বলবে—"জ্বি স্যার ভাল।" তোমার কথা শুনে যদি একটা পাখিও আকাশে ওড়ে তাহলে তুমি পাশ।'

সেলিম ভাই বটগাছের দিকে হ্যান্ড মাইক্রোফোন তাক করলেন। উপস্থিত সবার মধ্যে চাপা কৌতূহল এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আগ্রহ নিয়ে বটগাছের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি উড়বে কি উড়বে না ? সেলিম ভাই তার বাক্য শেষ করতেই এক সঙ্গে চারটা পাখি গাছ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল। আমরা সবাই হাততালি দিতে শুরু করলাম। শুধু পাপিয়া ম্যাডাম হাততালি দিচ্ছেন না। তাঁর হাতে কফির মগ। তিনি কফিতে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বকুল একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছ। আমাদের ডিরেক্টর সাহেব মানুষ হিসেবে অসম্ভব শার্প। তিনি কী সহজ উপায়ে এই ছেলেটার ইনহিবিশন কাটিয়ে দিয়েছেন দেখলে। এখন সে পুরোপুরি ফ্রী। অভিনয় ভাল করবে। আমি কিছু বললাম না। আমি কান পেতে আছি ডিরেক্টর সাহেব দৃশ্যটা কীভাবে বুঝান তা শোনার জন্যে।

'সেলিম দৃশ্যটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি— তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি কে তা-কি তুমি জান ?'

সেলিম ভাই প্রায় বিড় বিড় করে বললেন, আমি একজন ফটোগ্রাফার। দেশের বাইরেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। এখন কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছি। আবার চলে যাব।

'দ্যাটস রাইট। তুমি দিলু-নিশাতের ফ্যামিলির সঙ্গে সুসং দুর্গাপুরে বেড়াতে এসেছ। এই পরিবারটির সঙ্গে তোমার তেমন কোন পরিচয় নেই। তারাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। কেন বলতো ? না লজ্জার কিছু নেই বল।'

'তারা চাচ্ছে এই পরিবারের বড় মেয়েটিকে আমি যেন পছন্দ করি।'

'ভেরী গুড। বড় মেয়েটি কে ?'

'আমাদের পাপিয়া ম্যাডাম।'

'দ্যাটস রাইট। পছন্দ করলে তারা মেয়েটিকে বিয়ে দিতে পারেন। নিশাতের স্বামী রোড এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। তাদের ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে। নিশাত যদি অতীত ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে করে তাহলে তার জীবন আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। সেই শুরুটা আমেরিকার মত বিশাল দেশে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বুঝতে পারছ ?'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি একজন ফটোগ্রাফার। সামান্য কোন ফটোগ্রাফার না। তুমি আমেরিকার মত দেশে নামকরা ফটোগ্রাফার। তোমার তোলা ছবি দিয়ে দু'টা ফটোগ্রাফীর বই প্রকাশিত হয়েছে, একজন লেখক এবং একজন ফটোগ্রাফারের মধ্যে পার্থক্য কী জান ?'

'জ্বি না।'

'একজন লেখক সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন এবং সেই সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন। একজন ফটোগ্রাফারও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেন না। ক্যামেরায় বন্দি করে ফেলার চেষ্টা করেন। বেশির ভাগ সময়ই তারা তা পারেন না। কারণ সৌন্দর্য কখনো বন্দি করা যায় না। ফটোগ্রাফাররা এই তথ্য জানেন না বলে ক্রমাগত ছবি তুলে তুলে এক সময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। একজন লেখক বা একজন কবি কখনো হতাশাগ্রস্থ হন না, কারণ তাঁরা কখনো সৌন্দর্য বন্দি করতে চান না। তাদের আগ্রহ ব্যাখ্যায়। আমার বক্তৃতা কেমন লাগছে সেলিম ?'

সেলিম ভাই কিছু বলার আগেই পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, তোমার বক্তৃতা খুব ভাল হচ্ছে। I am impressed.

ডিরেক্টর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শোন পাপিয়া, ইচ্ছা করলেই আমি যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দন তত্ত্বের শিক্ষক হতে পারতাম। পৃথিবীর সেরা পাঁচজন ডিরেক্টরের একজন হতে পারতাম, ঔপন্যাসিক হতে পরতাম। কবি হতে পারতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয়েছি— হাতির লাদ। হাতির বিশাল বড় বিষ্ঠা। সাইজে যত বড়ই হোক— 'শিট ইজ শিট।' আচ্ছা ঠিক আছে— সেলিম এসো, মূল দৃশ্যটি তোমাকে বুঝিয়ে দি। কাছে আস।

সেলিম ভাই কাছে এগিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁর বাঁ হাতটা তুলে দিলেন সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। হাত কাঁধে তুলে দিয়ে তিনি আসলে নিঃশব্দে বলার চেষ্টা করছেন— ভয় পেও না, আমি আছি তোমার সঙ্গে। আমি তোমাকে যেভাবে খেলাব— তুমি সেই ভাবে খেলবে। আর কিচ্ছু লাগবে না। সেলিম ভাই কি না বলা কথাগুলি বুঝতে পারছেন ?

'সেলিম !'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি ক্যামেরা হাতে ঘুরতে বের হয়েছ। হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল বটগাছটা। বিশাল গাছ ঝুড়ি নামিয়ে দিয়েছে। দেখে তোমার ভাল লাগল। একবার ভাবলে দৃশ্যটার ছবি তুলবে, তারপর ঠিক করলে— না। ছবি তোলার দরকার নেই। আবার মত পরিবর্তন করলে— ছবি তোলার জন্যে এগুলে। কোন এংগেলে ছবিটা তুলবে, একটু ভাবলে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যের পজিশন চট

করে দেখে নিলে। তারপর ছবিটা তুললে। ছবি তোলার আগমুহূর্ত পর্যন্ত দৃশ্যটির প্রতি তোমার ছিল সীমাহীন মমতা। যেই ছবিটা তোলা হয়ে গেল, ওম্নি তোমার সমস্ত আগ্রহের অবসান হল। তুমি চলে যাচ্ছ। যে অপূর্ব দৃশ্যটির ছবি তুমি তুললে তার প্রতি এখন তোমার আর কোন মমতা নেই। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি।'

'তোমাকে আরো সহজে ব্যাখ্যা করি— মনে কর যে দৃশ্যটি তুমি দেখছিলে সেটা আসলে কোন দৃশ্য না। রক্ত মাংসের একজন মানুষ। ধরা যাক অপূর্ব রূপবতী কোন তরুণী। মেয়েটি তোমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তোমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে আছে আপন মনে। তুমি প্রচন্ড অস্থিরতায় ভুগছ। তুমি ভেবে পাচ্ছ না, কেন সে তোমার দিকে তাকাচ্ছে না। দুঃখে কষ্টে তোমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এমন সময় ম্যাজিক্যাল একটা ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি গভীর আবেগ এবং গভীর ভালবাসায় তোমার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব আগ্রহ শেষ হয়ে গেল। তুমি হেঁটে চলে এলে। মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকানোর ইচ্ছা পর্যন্ত হল না।'

সেলিম ভাই কিছু বলছেন না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি তাকালাম পাপিয়া ম্যাডামের দিকে। তিনি চাপা গলায় বললেন, রুমালী, তুমি আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের সব কথা বিশ্বাস করবে না। ভালবাসার দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা কোন পুরুষকে দেয়া হয় নি। সে তখনি যেতে পারে যখন তাকে যেতে দেয়া হয়। মেয়েরা তাদের চলে যেতে দেয় বলেই তারা যেতে পারে অথচ পুরুষরা ভাবে নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি। এতে তারা এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমরা তাদের সেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেই।

ডিরেক্টর সাহেব সেলিম ভাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর একটা হাত এখনো সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। তিনি কী বলছেন— আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার কান খুব তীক্ষ্ণ।

'সেলিম শোন— তুমি কোথায় দাঁড়াবে, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাবে সব মার্ক করা আছে। কখন তুমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যের পজিশন দেখবে— সব বলে দেয়া হবে। একটা ফুল রিহার্সেল হবে। তারপর হবে ক্যামেরা রিহার্সেল। আমরা ট্রলী এবং জুম লেন্স ব্যবহার করছি। শট কাটব না। নার্ভাস বোধ করছ নাতো? নার্ভাস বোধ করার কিছু নেই।

সোহরাব চাচা ছুটতে ছুটতে আসছেন। ভদ্রলোক সাধারণ ভাবে হাঁটতে পারেন না। যেখানে যাবেন দৌড়ে যাবেন। তাঁর দৌড়ে আসার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। আমি নিশ্চিত আসলে কিছু ঘটে নি।

'মিস রুমাল!'

'জ্বি চাচা।'

'আজ তোমার শট হবে না। স্যার তোমাকে মেকাপ তুলে ফেলতে বলেছেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

পাপিয়া ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, প্ল্যানিং গুলি ঠিকঠাক মত করলে হয় না? দু'ঘন্টা নষ্ট করে মেকাপ নেবার পর বলা হল শট হবে না!

সোহরাব চাচা অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন। ভাবটা এ রকম যেন মজার একটা গল্প হচ্ছে। আনন্দময় পরিবেশে— আনন্দময় গল্প। গল্প শুনে তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

'ম্যাডাম তরমুজের সরবত খাবেন?'

'না।'

'একটু খেয়ে দেখুন, আমার ধারণা খুব ভাল হয়েছে। এক চুমুক খেয়ে দেখুন ভাল না লাগলে ফেলে দেবেন। আমি নিয়ে আসছি।'

সোহরাব চাচা আবার ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছেন। পাপিয়া ম্যাডাম এখন বটগাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকানো। কে জানে তিনি কী ভাবছেন। আজ বিকেলে তাঁর ঢাকা চলে যাবার কথা। সেই পরিকল্পনা কি এখনো আছে? তাঁর গাড়ির চাকার লিক কি সারানো হয়েছে?

'বকুল!'

'জ্বি আপা।'

'তোমার মা'কে দেখছি না কেন? তুমি আছ অথচ তোমার মা নেই এটাতো ভাবা যায় না।'

'মা'র শরীর ভাল না। শুয়ে আছেন।'

'শরীর ভাল না কেন? কী হয়েছে?'

'কাল রাতে এক ফোঁটা ঘুমান নি— সকালে শরীর খারাপ করেছে। তাঁর হাঁপানির মত আছে। অনিয়ম করলেই হাঁপানী বাড়ে।'

'তুমি যাও মেকাপ তুলে মা'র কাছে গিয়ে বস। ও শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মেকাপম্যান সুবীর বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ করে তাই না?'

'জ্বি আমাকে মা ডাকেন।'

'সে যে তোমাকে খুব পছন্দ করে এটা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। সে তোমাকে যত্ন করে মেকাপ দিয়েছে। তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

' সব মানুষের চেহারায় লুকানো সৌন্দর্য থাকে। মেকাপ ম্যানের প্রধান দায়িত্ব সেই সৌন্দর্য বের করে আনা। সবাই তা পারে না। সুবীর পারে। তোমাকে সত্যি সত্যি অপূর্ব লাগছে।'

আমার লজ্জা লাগছে। কী বলব বুঝতে পারছি না। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ও আচ্ছা— তোমাকে দেখানোর জন্যে আমি আমার মেয়ের ছবি এনেছি। এই দেখ ছবি। তার ফিফথ বার্থডের ছবি।

আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটা নিলাম। এবং ছবিটার দিকে মন খারাপ করে তাকিয়ে রইলাম। কী বিশ্রী চেহারা মেয়েটির। উঁচু কপাল, পুতিপুতি চোখ, গায়ের রঙ মিশমিশে কাল। সব বাচ্চাদের চোখে মুখে বুদ্ধির ঝলক থাকে— এই মেয়েটার চেহারার ভেতরও হাবা হাবা ভাব। মাথাভর্তি নিগ্রোদের মত কোকড়ানো চুল। মোটা মোটা ঠোঁট।

পাপিয়া ম্যাডাম ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার মা দেখতে ভাল হয় নি কিন্তু ওর খুব বুদ্ধি। তোমাকে একদিন তার বুদ্ধির গল্প বলব।

'এখনি বলুন।'

' না এখন না। অন্য একদিন। এখন আমি তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশনের কথা বলি। মঈন যখন দৃশ্য বুঝাচ্ছিল তুমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে। একবারও তুমি সেলিমের দিকে তাকাও নি। তুমি মঈনের দিকে তাকিয়ে ছিলে। আমি দেখলাম তোমার ঠোঁট এবং হাতের আঙ্গুল কাঁপছে। ব্যাপারটা কী ?'

আমি চুপ করে আছি। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ঠিক করে বলতো তুমি কি এই মানুষটির প্রেমে পড়েছ ?

আমি হকচকিয়ে বললাম, জ্বি না। জ্বি না।

'মাটির দিকে তাকিয়ে জ্বি না জ্বি না করছ কেন ? আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অসুবিধা কোথায় ? তাকাও আমার দিকে।'

আমি তাকালাম, এবং দীর্ঘ কিছু সময় দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনিও কিছু বললেন না, আমিও না।

সোহরাব চাচা জগ এবং গ্লাস নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছেন। এই সব কাজ প্রোডাকশন বয়দের করার কথা। সোহরাব চাচার তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। জগে গাঢ় লাল রঙের সরবত দেখতে এত সুন্দর লাগছে।

সোহরাব চাচা একটা মাত্র গ্লাস এনেছেন। তরমুজের সরবত আমার জন্যে আসে নি— শুধু ম্যাডামের জন্যে। মা থাকলে তাঁর ভুরু কুঁচকে যেত। উনি ম্যাডামের সামনে কিছু বলতেন না, কিন্তু সোহরাব চাচাকে ঠিকই ধরতেন— আমার মেয়ে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে পড়ে নি। সে ফেলনা না। সে এই ছবির দু' নম্বর নায়িকা। তার জন্যেও তরমুজের সরবত লাগবে।

পাপিয়া ম্যাডাম সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন— 'বাহ্ ভাল হয়েছেতো। লেবু লেবু গন্ধ আসছে কেন?'

'সামান্য লেবু দেয়া হয়েছে।'

'ভাল। বেশ ভাল। আমি আরেক গ্লাস খাব।'

'জ্বি ম্যাডাম— এই জগটা আপনার জন্যে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন, একটা প্রবলেম হয়েছে?

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, কী প্রবলেম? ফরহাদ সাহেব এসে পৌঁছেছেন?

সোহরাব চাচা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। আমি পাপিয়া ম্যাডামের অনুমান শক্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। সোহরাব চাচা যেই বললেন, একটা প্রবলেম হয়েছে উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রবলেম ধরে ফেললেন। আমি কখনো পারতাম না।

'শুটিং কি হচ্ছে না বন্ধ?'

'ক্যামেরা এখনো ওপেন হয় নি।'

'ডিরেক্টর সাহেব কী জানেন যে ফরহাদ সাহেব এসেছেন?'

'জ্বি জানেন। আমি আসামাত্র খবর দিয়েছি।'

'ডিরেক্টর সাহেব এখন কি করবেন? সেলিমকে নিয়ে কাজ করবেন, না ফরহাদ সাহেবকে নিয়ে?'

'আমি জানি না ম্যাডাম— আমি হলাম আদার ব্যাপারি। এসব বড় বড় ব্যাপার।'

পাপিয়া ম্যাডামের গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। তিনি খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখি আরেকটু দিন।

সোহরাব চাচা গ্লাস ভর্তি করে দিলেন।

ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, আমি আর খাব না। জগের সরবত অন্য কাউকে দিয়ে দিন।

'জ্বি আচ্ছা।'

ম্যাডাম গ্লাস হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন। একটু আগে যে মগ দিয়ে কফি খাচ্ছিলেন সেই মগটা গাছের নীচে পড়ে আছে। সেই দিকে ফিরেও তাকালেন না। মগটা খুব সুন্দর। নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে আনানো। ধবধবে শাদা মগে টকটকে লাল অক্ষরে লেখা— KISS ME.

আমি মগটা তুলে সোহরাব চাচার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, চাচা একটু সরবত দিয়ে মগটা ধুয়ে আমাকে দিনতো। আমার খুব লোভ লাগছে।

'তোমার খাওয়ার দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন ?'

'এটা প্লেইন সরবত না। এখানে ভদকা মেশানো আছে।'

'ভদকা মেশানো সরবতই খেয়ে দেখি কেমন লাগে। বেশি না— সামান্য।'

সোহরাব চাচা বললেন, না।

তাঁকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। ফরহাদ সাহেব হঠাৎ এসে পড়ায় তিনি মনে হয় দারুণ চিন্তায় পড়ে গেছেন। এতটা চিন্তিত হবার মত কিছু ঘটেছে কি?

'মিস রুমাল!'

'জ্বি চাচা ?'

'শুধু শুধু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ঘরে চলে যাও। মেকাপ উঠিয়ে বিশ্রাম কর। তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। তাঁর জ্বরতো ভাল বেড়েছে। একশ তিন। মাথায় পানি দিয়ে জ্বর কমাতে বলেছি। সিটামল খাওয়ানো হয়েছে। একজন ডাক্তার খবর দিয়েছি— সন্ধ্যাবেলা আসবেন।'

'ভাল। আপনি কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? কিছু বলবেন ?'

'হুঁ।'

'উপদেশ ?'

'উপদেশ না— আদেশ। তুমি ফরহাদ সাহেবের কাছ থেকে সব সময় একশ হাত দূরে থাকবে।'

'কেন উনি কি ঘাতক ট্রাক ?'

'কেন টেনো না, তোমাকে দূরে থাকতে বলছি— তুমি দূরে থাকবে।'

'আচ্ছা— জামিল আহমেদের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন, মিজানুর রহমান। উনার কাছ থেকে কত হাত দূরে থাকব ?'

'উনার কাছ থেকে দূরে থাকার দরকার নেই। উনি দিন রাত মদ খান। এইটাই তার একমাত্র দোষ। মদ খাওয়ার দোষটা না থাকলে তাকে ফেরেশতা বলা যেত। আল্লাহপাকতো মানুষকে ফেরেশতা বানিয়ে পাঠান না— দোষ ত্রুটি দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান। মিজান সাহেবকে নেশারু বানিয়ে পাঠিয়েছেন।'

'একজন মদ খাচ্ছে সেই দোষও আল্লাহ্‌র ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আল্লাহ্ নেশারু বানিয়ে পাঠিয়েছেন বলে নেশা করছে!'

'আচ্ছা বাবা যাও আল্লাহ্ বানিয়ে পাঠায় নি। সে নিজে নিজে হয়েছে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমাদের ডিরেক্টর সাহেব সম্পর্কে বলুন, উনার কাছ থেকে কত হাত দূরে থাকতে হবে তাতো বললেন না। মজার ব্যাপার কী জানেন চাচা— উনার কাছ থেকে কত হাত দূরে থাকতে হবে তা আপনি

জানেন। তাঁর ভেতরে মন্দ কী আছে তাও আপনি খুব ভাল জানেন। জানলেও আপনি কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারবেন না। কারণ আপনার সেই ক্ষমতা নেই।

সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন— 'ব্যাপারটা কী ? হড়বড় করে এত কথা বলছ কেন ? এত তর্ক কোথায় শিখলে ?'

'আমি তর্ক শিখেছি আমার মা'র কাছে। মা যে কথাই বলেন আমি তার উল্টোটা বলি ; উল্টো যুক্তি দাঁড়া করাই। এমনও হয়েছে যে শেষটায় এসে হাল ছেড়ে দিয়ে মা কাঁদতে বসেছেন। তাই বলে আমি কথা থামাই নি। আমি আমার কথা বলেই গিয়েছি।'

আমার হঠাৎ আক্রমণে সোহরাব চাচা হকচকিয়ে গিয়েছেন। কেঁদে ফেলার আগমুহূর্তে মা'কে যেমন দেখায় তাকে এখন তেমনই দেখাচ্ছে। কাজেই আমি থাকলাম না। আমি আমার কথা বলেই যেতে লাগলাম—

'সোহরাব চাচা শুনুন। আপনি আমাকে তরমুজের সরবত খেতে দিলেন না। কারণ এখানে ভদকা মিশানো। আপনি পিতৃসুলভ একটা ভাব ধরলেন। আপনাদের ডিরেক্টর সাহেব যদি এখন একটা গ্লাসে এই সরবত ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে বলেন— "বকুল নাও খাও।" আর তখন যদি আপনি সামনে থাকেন। আপনি কি বলতে পারবেন, মিস রুমাল সরবত খেও না। এর মধ্যে ভদকা মেশানো আছে।'

'স্যার এই জাতীয় কথা কখনো বলবেন না।'

'কখনো বলবেন না ?'

'না কখনো বলবেন না। তুমি তাকে কতদিন ধরে দেখছ ? এই অল্প কিছু দিন। আমি বৎসরের পর বৎসর তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আমি তাঁকে চিনি।'

'আপনার ধারণা তিনি একজন মহাপুরুষ ?'

'আমার কাছে অবশ্যই মহাপুরুষ।'

'সোহরাব চাচা শুনুন। মহাপুরুষ টুরুষ কিছু না, উনি একজন প্রতিভাবান মানুষ, তবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। মাঝে মাঝে খুব নিম্নশ্রেণীর মানুষও অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। উনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।'

'এইসব কী বলছ ?'

'সত্যি কথা বলছি।'

'আমার কাছে বলছ ভাল কথা, আর কারো কাছে এই জাতীয় কথা ভুলেও বলবে না।'

'বললে কী হবে ? ডিরেক্টর সাহেব আমাকে শাস্তি দেবেন ? নীল-ডাউন করে রাখবেন ? কানে ধরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ?'

'তোমার হয়েছেটা কী বলতো ?'

'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন খারাপ লাগছে ?'

আমি নিঃশ্বাস ফেলে সহজ ভঙ্গিতে প্রায় হাসি হাসি মুখে বললাম, ফরহাদ সাহেব এসে পড়েছেন এই জন্যেই আমার খারাপ লাগছে।

'তোমার খারাপ লাগার কী আছে ?'

'যেহেতু বিখ্যাত অভিনেতা মেগাস্টার, গ্যালাক্সিস্টার মিস্টার ফরহাদ চলে এসেছেন— সেহেতু সেলিম নামের মানুষটি এখন বাদ পড়ে যাবে। আপনার মহাপুরুষ ডিরেক্টর সাহেবের এত ক্ষমতা নেই যে ফরহাদ সাহেবকে বাদ দিয়ে পথের মানুষকে দিয়ে অভিনয় করাবেন। যদিও ইচ্ছা করলেই তিনি তা পারেন। সেলিম নামের এই পথের ছেলেটিকে মেগাস্টার, গ্যালাক্সিস্টার বানানো তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই না।'

সোহরাব চাচা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— ও আচ্ছা এই ব্যাপার। যেন তাঁর বুক থেকে পাষান ভার নেমে গেছে। আমি বললাম, সোহরাব চাচা শুনুন সেলিম নামের মানুষটাকে উনি বাদ দিয়ে দেবেন। বেচারা এম্নিতেই ছোট হয়ে থাকে— এখন আরো ছোট হয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবে— আমাদের সঙ্গেই ঘুরবে। ভাবতেই খারাপ লাগছে।

'খারাপ লাগার কিছু নেই মা। সবই ভাগ্য। ভাগ্য ব্যাপারটা যে কী তা ছবির লাইনের লোক ছাড়া কেউ বুঝবে না। দু'শ টাকা শিফটের এক্সট্রা মেয়েকে আমি নিজে কোটিপতি হতে দেখেছি। আবার দেখেছি কোটিপতি থেকে দুশ টাকা দামের এক্সট্রা হয়েছে। সবই ভাগ্য। সেলিমের ভাগ্যে যে জিনিস নাই সে জিনিস তার হবে না।'

'সবই ভাগ্য ?'

'অবশ্যই ভাগ্য। তোমার নিজের কথাই ধর। দিলু চরিত্র তোমার করার কথা ছিল না। অন্য একজনকে সাইনিং মানি দেয়া হয়েছিল। হঠাৎ স্যার একদিন কোন এক ম্যাগাজিনে তোমার ছবি দেখলেন। আমাকে বললেন, তোমাকে খবর দেয়ার জন্যে। আমি তোমাকে খবর দিলাম। স্যারের পছন্দ হল না। তোমরা চলে গেলে। যেদিন দুর্গাপুর রওনা হব তার একদিন আগে— বললেন, বকুল মেয়েটাকে খবর দাও। এটা ভাগ্য না ?'

আমি চুপ করে রইলাম। সোহরাব চাচা গম্ভীর গলায় বললেন, আমরা নিজের মনে খেলে যাচ্ছি। খুব আনন্দ, ভাল খেলা হচ্ছে। সুতা কিন্তু অন্যের হাতে।

আমি ঘরের দিকে রওনা হলাম। সোহরাব চাচা আমার পেছনে পেছনে আসছেন। হঠাৎ আমার মনে হল— সোহরাব নামের এই মানুষটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তার ছেলেমেয়ে কয়জন। কার কী নাম— কিছুই জানা নেই। অথচ কত ঘনিষ্ট ভাবে মিশছি। ছবি শেষ হয়ে যাবে আর তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না।

'সোহরাব চাচা ?'

'মা বল।'

'যে গাছটার নীচে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেই গাছটার নাম কী ?'

'ছাতিম গাছ। গাছের নাম দিয়ে কী হবে ?'

'এম্নি। জানতে ইচ্ছে করল। একজন অবশ্যি বলেছে— কাঠবাদাম গাছ। আপনারটা ঠিক, না তাঁরটা ঠিক কে জানে।'

সোহরাব চাচা গাছ প্রসঙ্গে কিছু বললেন না, চিন্তিত গলায় বললেন— রোদের মধ্যে হেঁটে যেও না। আমি লোক দিয়ে দিচ্ছি। মাথার উপর ছাতি ধরবে।

'কিচ্ছু ধরতে হবে না।'

আমি সোহরাব চাচাকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। হাঁটার গতি আরো বাড়ালাম। আমাকে এই ভাবেই দৌড়ে পুকুর ঘাটে যেতে হবে। তারপর হঠাৎ পুকুরের পানিতে নিজের ছায়া দেখে চমকে যেতে হবে। শাড়ি পরে দৌড়ানো মুশকিল। দৌড়টা ভাল হচ্ছেতো ? নকল দৌড় মনে হচ্ছে নাতো ? স্যান্ডেল পায়ে দৌড়ানো যাচ্ছে না। খালি পায়ে দৌড়াতে হবে। খালি পা হব কী ভাবে ? পা থেকে স্যান্ডেল ফেলে দেয়ার পেছনে কী যুক্তি দাঁড় করাব ?

আশ্চর্য, ফরহাদ সাহেব মেকাপে বসেছেন। সুবিরদা গম্ভীর মুখে কাজ করে যাচ্ছেন। ফরহাদ সাহেব টেবিলে পা তুলে প্রায় আধশোয়া হয়ে আছেন। তার চোখ বন্ধ। টেবিলের উপর বিয়ারের ক্যান। ক্যানের উপর মাছি উড়ছে। বিয়ার খেতে কি মিষ্টি ? মিষ্টি না হলে মাছি উড়বে কেন ? সেলিম ভাইকে তাহলে বাদ দেয়া হয়েছে। সাব্বিরের চরিত্র করছেন— মেগাস্টার ফরহাদ খাঁন। যার যা ইচ্ছা করুক। আমাদের খেলার কথা আমরা খেলছি। কেউ ভাল খেলছি, কেউ মন্দ খেলছি। সুতাতো আমাদের হাতে নেই।

মা শরীর এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথার চুল ভেজা। মাথায় পানি ঢালা মনে হয় কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। আমি পাশে দাঁড়াতেই চোখ মেললেন। মা'র প্রথম বাক্যটা হল— ঠোঁটের লিপস্টিক ভাল হয় নিতো।

আমি বললাম, তোমার শরীর এখন কেমন ?

মা বললেন, শরীর কেমন সেটা পরের কথা। মেকাপ কেমন হল তুই আমাকে দেখিয়ে যাবি না ? মেকাপ শেষ হল আর তুই চলে গেলি ?

'আমি এসেছিলাম, তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে জাগাই নি।'

'আবার মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা বলতে তোর মুখে একটু আটকাল না— ফাজিল মেয়ে—'

মা উঠে বসলেন এবং আমি কিছু বোঝার আগেই প্রচন্ড চড় বসালেন। চড়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না বলে বিছানায় কাত হয়ে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলাম। কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে বললাম, সকালে কিছু খেয়েছ মা ?

'না। তুই কি আয়না দিয়ে দেখেছিস তোকে কেমন বিশ্রী মেকাপ দিয়েছে ? নাকটা মোটা লাগছে।'

'মোটা নাকতো মা মেকাপ দিয়ে চিকন করা যাবে না। ব্লেড দিয়ে কেটে ঠিক করতে হবে।'

'আমার কাছে জ্ঞান ফলাবি না। নাকে শেড দিয়ে মোটা নাকও চিকন করা যায়। তুই এক নম্বর নায়িকা হলে ঠিকই করত। দুই নম্বর নায়িকাতো, নাক মোটা থাকলেই বা কী, চিকন থাকলেই বা কী ? কী ব্যাপার তুই যাচ্ছিস কোথায় ?'

'মেকাপ তুলতে যাই।'

'শট হবে না ?'

'না।'

'আমি জানতাম আজ তোর শট হবে না।'

'কীভাবে জানতে ?'

'আজ মঙ্গলবার না ? মঙ্গলবার তোর জন্যে অশুভ। আমি সব সময় দেখেছি মঙ্গলবার হলেই তোর কোন একটা সমস্যা হয়।'

'তোমার জন্যে কোনবারটা অশুভ মা ?'

'তোর জন্যে যে বার অশুভ, আমার জন্যেও সে বার অশুভ। তুই আর আমি— আমরাতো আলাদা না।'

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। মেকাপ দেয়া যেমন কষ্টের মেকাপ তোলাও তেমন কষ্টের। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। গ্লিসারিণ দিয়ে ঘষে ঘষে তুলতে হয়। জোরে ঘষা লাগলে চামড়া উঠে যায়— যন্ত্রণা হয়। সবচে কষ্ট চোখের মেকাপ তোলা। চোখ জ্বালা করে।

মেকাপ তোলার পর আয়নায় নিজেকে দেখলাম। বাহ্ সুন্দর লাগছেতো। মিষ্টি একটা মুখ। সহজ সুন্দর এবং সরল। এই মুখের দিকে তাকিয়ে কারোর কি কোন দিন বলতে ইচ্ছে করবে—

'আমি এনে দেব
তোমার উঠোনে সাতটি অমরাবতী।'

ডান গাল লাল হয়ে আছে। মা'র চড় গালে বসে গেছে। আগে ব্যথা করে নি এখন চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথায় উঠে যাবে।

আমি খুব শিগগিরই একদিন কঠিন গলায় মা'কে বলব— মা তুমি আর কখনো আমার গালে হাত দেবে না। কখনো না। সেই শিগগিরটা কবে ?

'বকু ! বকু!'

আমি বাথরুম থেকেই মিষ্টি গলায় বললাম, কী হয়েছে মা ?

'তুই নিজে নিজে মেকাপ তুলছিস কেন ? সুবীরকে বল। তুই দুই নম্বর নায়িকা হয়েছিস বলেই সব কাজ নিজে নিজে করবি ?'

'সুবীরদা ব্যস্ত। ফরহাদ সাহেবকে মেকাপ দিচ্ছেন।'

'ও আচ্ছা ভুলেই গেছি ফরহাদ সাহেবতো চলে এসেছেন। সেলিম গাধাটা গালে জুতার বাড়ি খেয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে। পিপিলিকার পাখা উঠলে যা হয়।'

'মা এইসব তুমি কী বলছ ?'

'ঠিকই বলছি। যে চামড়া দিয়ে জুতার শুকতলা বানানো হয়—সেই চামড়া দিয়ে কখনো মানিব্যাগ হয় না।'

আমি বাথরুম থেকে বের হলাম। মা'র দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মিষ্টি করে হাসলাম। ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় 'দেখি হাসতো' বললে যে ভঙ্গিতে দাঁত বের না করে মুখ টিপে হাসা হয়, সেই ভঙ্গির হাসি। তারপর মা'কে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

জালালের মা আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে। তার এগিয়ে আসার মধ্যে কেমন ভিজে বিড়াল ভিজে বিড়াল ভাব। গোপন কোন ঘটনা সে বোধ হয় জেনে ফেলেছে। গোপন ঘটনায় নতুন কিছু ডালপালা লাগিয়ে সে এখন বলবে।

'বকুল আপা!'

'হুঁ।'

'সরবত খাবেন?'

'কিসের সরবত?'

'তরমুজের সরবত।'

'হ্যাঁ খাব।'

'এর মধ্যে একটু ইয়ে দেওয়া আছে। সরবত মিজান ভাই বানিয়েছেন। উনি আবার ইয়ে ছাড়া কিছু বানাতে পারেন না।'

'ইয়ে টা কী?'

'ভদকা। খুবই সামান্য দিয়েছেন যাতে মেয়েরাও খেতে পারে। নেশা হবে না। খাবেন আপা?'

'হুঁ খাব।'

'ভদকার মজাটা কী জানেন আপা?'

'না জানি না— কী মজা?'

'খেলে মুখে গন্ধ হয় না।'

'তাহলেতো খুবই ভাল। চলুন যাই ভদকা খাই।'

'ছিঃ ছিঃ ভদকা না। সরবত। পাঞ্চ। সামান্য ইয়ে দেওয়া।'

'চলুন আজ মজা করে সামান্য ইয়ে মেশানো সরবত খাব। মা জানবে নাতো?'

'পাগল হয়েছেন আপা? কাকপক্ষী জানব না। আপনি পুকুর ঘাটে যান— আমি আসতেছি।'

আমি পুকুরঘাটের দিকে রওনা হলাম। পুকুরটা বিশাল। তবে পুকুরের পানির দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। ময়লা পানি। নানান জায়গায় বাঁশ পোতা হয়েছে। মাছের চাষ করলে নাকি সারা পুকুরে বাঁশ পুততে হয়। একটা ঘাট আছে—সেই ঘাটও ভাঙ্গা। তবে পুকুরের চারদিকে গাছ পালা। পুকুরের মালিক আসলাম খাঁ। পীর মানুষ। তাঁর কথা পরে বলব। তিনি খুব আনন্দিত গলায় অদ্ভুত ধরনের শুদ্ধ ভাষায় বলেছিলেন— আপা দেখেন এমন কোন গাছ নাই যাহা আমি 'রুপন' করি নাই। যেখানে যত বৃক্ষ পেয়েছি 'রুপন' করিয়াছি।

আমি বললাম, কী কী গাছ রুপন করেছেন একটু বলুনতো। ভদ্রলোক গড়গড় করে পড়া মুখস্ত করার মত বললেন—কাঁঠাল, আম, জলফই, জামরুল, জাম্বুরা, কৎবেল, আতা, লেচু। বসতবাড়িতে লেচু গাছ রুপন করা ঠিক না। নির্বংশ হয়, তারপরেও শখ করে লাগিয়েছি। লেচু যখন পাকে তখন খুবই বাদুরের উৎপাত হয়।'

'লিচু কখন পাকে ?'

'জ্যৈষ্ঠমাসের আগে এখন ফুল ফুটেছে এই দেখেন ফুল।'

আমি মুগ্ধ চোখে লিচু গাছের ফুল দেখলাম। সবুজ ফুল। গাছ ছেয়ে আছে সবুজ রঙের ফুলে। আমের মুকুলও সবুজ হয় কিন্তু সবুজের মধ্যেও হলুদ ভাব থাকে। লিচু ফুলে সেই হলুদ ভাব নেই।

আমি লিচু গাছের নীচে বসলাম। বসার জায়গাটা সুন্দর। ঘাস আছে। গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসা যায়। পুকুরের পানি আরো পরিষ্কার হলে বসে থাকতে খুব ভাল লাগত। জালালের মা টিনের একটা জগ এবং দু'টা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হল। তার চোখ চকচক করছে। কথা বলার ধরনও পাল্টে গেছে। ফিস ফিস করে কথা বলছে। আমি এক চুমুকে গ্লাস শেষ করলাম। তিতকুট একটা ভাব আছে কিন্তু খেতে ভাল।

'আফা কেমন লাগতাছে ?'

'খুব ভাল। নেশা হচ্ছে।'

'কী যে কন আফা এক কাপে কী হইব।'

'দাও আরেক কাপ দাও।'

জালালের মা খুব আগ্রহ করে আরেক কাপ দিল। তারপর আরেক কাপ, আবার আরেক কাপ।

'আফা আর খাইয়েন না।'

'কেন আর খাবো না কেন ?'

'আচ্ছা মনে চাইলে খান। সিগারেট খাবেন ? মদের উপরে সিগারেটের ধোঁয়া পড়লে নিশা ভাল হয়।'

'সিগারেট ? হুঁ খাব।'

শাড়ির আঁচলের ভাজ থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের হল। দেয়াশলাই বের হল। আমি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ সরবত নিলাম। মাথা সামান্য ঝিম ঝিম করছে। এর বেশিতো কিছু হচ্ছে না। এই ঝিম ঝিমটা সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যেও হতে পারে। আমি পুরোপুরি মাতাল হতে চাচ্ছি। মাতাল হলে কেমন লাগে দেখতে চাই। মাতাল কি হব ?

'আফা!'

'হুঁ।'

'কাল রাতের ঘটনা কিছু শুনেছেন ?'

'না, কী ঘটনা ?'

'খুব লইজ্জার ব্যাপার।'

জালালের মা এম্নিতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। এখন ভদকার ঝোঁকেই হয়ত 'গেরাইম্যা' ভাষা বের হচ্ছে। লজ্জাকে বলছে—লইজ্জা। আমি বললাম লইজ্জার ব্যাপারটা কী ?

'বাদ দেন। সব শোনা ভাল না।'

'তাহলে বাদই থাক।'

আমি মনে মনে হাসছি। জালালের মা 'লইজ্জার' ব্যাপারটা বলার জন্যে মরে যাচ্ছে। আমি বাদ দিতে বললেও সে বাদ দেবে না।

'ফিলিম লাইনে সুখ নাই আফা।'

'কোন লাইনে সুখ ?'

'সব লাইনে সুখ—ফিলিম লাইন বাদ। কাল রাতে যে লইজ্জার ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা ফিলিম লাইন ছাড়া ঘটে না। আপনের বয়স অল্প আপনেরে বলা ঠিক না।'

'থাক তাহলে বলবেন না।'

'ঘটনা ঘটেছে রাত তিনটায়।'

'থাক থাক বলবেন না।'

জালালের মা'র মনটা খারাপ হয়ে গেল। জগের সরবত শেষ হয়ে গেছে। সে আরো সরবত আনতে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। ভদকার নেশায় কি ঘুম পায় ? শরীরও কেমন অবশ অবশ লাগছে। ভ্যাপসা গরমটাও আরামদায়ক মনে হচ্ছে। দূরের গারো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছে। পাহাড় খুব উঁচু না— তারপরও মনে হচ্ছে শাদা শাদা মেঘ পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। নজরুলের একটা গান আছে না ? পাহাড়ে হেলান দিয়ে আকাশ ঘুমায় ঐ। গানটা ঠিক হয় নি। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে আকাশ ঘুমুচ্ছে না— আসলে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমুচ্ছে। জালালের মা আসছে না। আমি কুন্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছি। রোদ আমার গায়ে পড়ছে। আমার নড়তে ইচ্ছে করছে না। রোদটাও ভাল লাগছে। ভদকা খেলে কি সবই ভাল লাগে ? আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমার কেন জানি মনে হল— ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখব আমি অন্য এক মানুষ। আমার নাম রুমালী না— অন্য কিছু। আমি দুর্গাপুরের এক গন্ডগ্রামে লিচু গাছের নীচে শুয়ে নেই। আমি শুয়ে আছি ঝাউ গাছের নীচে— একটু দূরেই সমুদ্র। সমুদ্র খুব অশান্ত। বড় বড় ঢেউ উঠছে। আমার চারপাশে কেউ নেই। সমুদ্রে প্রবল জোয়ার এসেছে। পানি বাড়ছে। পানি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল একটা ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যাক ভাসিয়ে নিয়ে যাক। আমি কেয়ার করি না। I don't care.

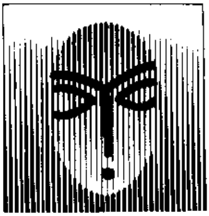

আমি বিছানায় কুন্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে আছি। আমার চুল ভেজা— অর্থাৎ মাথায় প্রচুর পানি দেয়া হয়েছে। মা পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিচ্ছেন। অচেতন রুগীদের ক্ষেত্রে এই কাজটি করা হয়। যা চলছে তার নাম জ্ঞান আনানোর প্রক্রিয়া।

আমার জ্ঞান আছে। ভালই আছে। অনেকক্ষণ হল মটকা মেরে পড়ে আছি। ঘটনাটা কী বোঝার চেষ্টা করছি। দুর্বোধ্য কোন ঘটনা ঘটে নি। নানান ধরনের কথা বার্তা শুনে যে ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে— জলিলের মা ছুটে এসে খবর দেয়, বকুল আপা অজ্ঞান হয়ে লিচু গাছের নীচে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অজ্ঞান হবার আগের অংশ— 'সরবত অংশ' বাদ দিয়ে যায়। আমাকে লিচু গাছের নীচ থেকে ধরাধরি করে আনা হয়। তখন সাময়িক ভাবে আমার জ্ঞান ফেরে এবং আমি ভূতে ধরা রুগীর মত কিছুক্ষণ হাসাহাসি করে প্রচুর বমি করতে থাকি। তখনই সরবত অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরে বাতি জ্বলছে, কাজেই রাত। কত রাত জানি না। একজন ডাক্তার এসে আমাকে দেখে গেছেন। ডাক্তার বলে গেছেন— ভয়ের কিছু নেই। ইউনিটের লোকজন আমাকে দেখতে আসছে। মা তাদেরকে অতি দ্রুত ঘর থেকে বের করে দিচ্ছেন। সেলিম ভাই যখন এলেন তখন আমি পুরোপুরি জেগে। সেলিম ভাই ক্ষীণ গলায় বললেন, এখন ওর অবস্থা কেমন ? মা বললেন, অবস্থা ভাল, ঘুমুচ্ছে। তুমি এখন যাওতো কথা বার্তা শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেলে অসুবিধা। ডাক্তার বলেছে প্রচুর ঘুম দরকার।

আমি বুঝতে পারছি সেলিম ভাই যাচ্ছেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

'বকুলের হয়েছে কী ?'

'সারাদিন রোদে ঘোরাঘুরি করেছে। রোদ মাথায় চড়ে গিয়ে এই অবস্থা। ডাক্তার বলেছেন সর্দি গর্মি, যাই হোক এখন ভাল। তুমি যাওতো।'

আমি বুঝতে পারছি সরবতের অংশ প্রকাশিত হলেও পুরোপুরি প্রকাশিত হয় নি। সবাই জানে না। আমার বুদ্ধিমতী মা ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মেয়ে ভদকা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে এটা জীবন থাকতে তিনি প্রকাশিত হতে দেবেন না।

দরজায় টুক টুক শব্দ হল। মা যেভাবে আমাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তা থেকেই বুঝলাম ডিরেক্টর সাহেব এসেছেন। আমি এখন বিছানায় উঠে বসব কি-না বুঝতে পারছি না।

ডিরেক্টর সাহেব ঘরে ঢুকলেন। চেয়ার টেনে আমার মাথার কাছে বসলেন।

'এখন অবস্থা কী ?'

মা কান্না কান্না গলায় বললেন, বুঝতে পারছি না।

'জ্ঞানতো ফিরেছে ?'

'জ্বি জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার সাহেব ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। এখন ঘুমুচ্ছে।'

'জ্বর আছে ?'

'একটু মনে হয় আছে।'

তিনি হাত বাড়িয়ে আমার কপালে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ একটা ব্যাপার হল। আমার সমস্ত শরীর জমে গেল। মনে হল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমার মাথার ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। কান্না আটকে রাখলে গলার কাছে শক্ত ডেলার মত জমে থাকে— তেমনি কিছু একটা জমে আছে।

'জ্বরতো নেই।'

তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। আমার শরীর স্বাভাবিক হল— শুধু গলার কাছে শক্ত ডেলাটা থেকে গেল। চিৎকার করে কিছুক্ষণ না কাঁদলে এটা মনে হয় যাবে না।

'হয়েছিল কী ?'

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, মঈন ভাই আমি কিছুই জানি না। জালালের মা হঠাৎ এসে বলল, লিচু গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শুনেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা।

'শুধু শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে কেন ? ওর কি মৃগী রোগ আছে ?'

'ছি! ছি! মঈন ভাই কী বলেন, মৃগী রোগ থাকবে কেন? রোদে সারাদিন ঘুরেছে ...। মনে হয় রোদ মাথায় চড়ে কিছু একটা হয়েছে।'

'ঘুম ভাঙ্গলে আমাকে খবর দেবেন আমি কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা, ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার যদি বলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেব।'

'সেটা আমি জানি মঈন ভাই। আপনি আছেন বলেইতো আমি নিশ্চিত।'

মা তাঁর বিখ্যাত তেলতেলানি হাসি হাসছেন। ডিরেক্টর সাহেব বের হয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি— আমার অজ্ঞান হবার খবর সবাই জানলেও সরবত বিষয়ক জটিলতার খবর জানে না। এই অংশটা ভালমতই গোপন করা হয়েছে। মা, জালালের মা, সোহরাব চাচা এবং সুবীরদা হয়ত জানেন। যখন বমি করছিলাম সুবীরদা পাশে ছিলেন। তিনি হতভম্ব গলায় বলেছিলেন— একী রক্ত বমি করছে নাকি? সোহরাব চাচা বললেন, রক্ত না। তরমুজের সরবত বের হয়ে আসছে। যত বের হয় ততই ভাল। তারপরই শুনলাম সোহরাব চাচা জালালের মা'কে বলছেন, একে সরবত কে খাইয়েছে?

জালালের মা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমারে জিগান ক্যান? কে খাওইছে আমি জানি না।

'আচ্ছা ঠিক আছে। খাওয়াও নি ভাল করেছ। চেঁচিও না। চেঁচানোর কিছু হয় নি।'

'আমার দিকে এমন গরম চোখে চাইবেন না। জালালের মা গরম চোখের ধার ধারে না।'

সোহরাব চাচার সঙ্গে জালালের মা'র কথাবার্তা এই পর্যন্তই আমার কানে গেছে তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অনুভূতিটা খুব যে খারাপ ছিল তা না।

আমি বিছানায় উঠে বসে সহজ গলায় বললাম, মা পানি খাব। মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। তিনি সম্ভবত ভাবতেই পারেন নি— আমি এত সহজে বিছানায় ওঠে বসে পানি খেতে চাইব। মা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দ্রুত ভাবছেন— মেয়ের উপর কঠিন আক্রমণ এখনই শুরু করবেন, না দেরি করবেন। আমি বললাম, মা দেখতো ক'টা বাজে।

'ন'টা বাজে?'

'তোমাদের রাতের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'না।'

'খাওয়ার ডাক পড়েছে?'

'না।'

'চল যাই খোঁজ নিয়ে আসি আমার খুব ক্ষিধে লেগেছে।'

মা কঠিন গলায় বললেন, তুই সন্ধ্যাবেলা কী খেয়েছিলি?

আমি আগের মতই সহজ স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভদকা খেয়েছিলাম। তরমুজের সরবতের সঙ্গে মেশানো ভদকা।

'কেন খেয়েছিলি?'

'ওমা খাবার জিনিস খাব না? আমি হচ্ছি ছবির দু'নম্বর নায়িকা। এক নম্বর নায়িকা খেতে পারলে দু'নম্বর নায়িকা পারবে না কেন? কী ব্যাপার মা কতক্ষণ আগে তোমাকে পানি দিতে বললাম, এখনোতো দিচ্ছ না।'

মা পানি আনতে গেলেন। তাঁর শুকনো মুখ দেখে আমারই মায়া লাগছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন তাঁকে কাঁদানো হয় না, আজ কাঁদিয়ে দিলে কেমন হয়?

'বকু নে পানি নে।'

পানির গ্লাস হাতে নিলাম। ইচ্ছা করছে মাতালের ভূমিকায় কিছুক্ষণ অভিনয় করি। উল্টো পাল্টা কথা বলি। মা'র আক্কেলগুড়ুম করে দেবার এটাই হবে সহজ বুদ্ধি। একটু টেনে টেনে কথা বলতে হবে। বেশির ভাগ কথাই হবে অর্থহীন তবে কথা যা বলা হবে তার সবটাই হতে হবে সত্যি। মাতালরা মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মিথ্যা বলার জন্যে মস্তিষ্কের যে নিয়ন্ত্রণ দরকার মাতালের তা থাকে না। এটা আমার শোনা কথা। সোহরাব চাচার কাছ থেকে শুনেছি।

পানির গ্লাসে একটা চুমুক দিলাম। পানিটা খেলাম না। মুখের ভেতর রেখেই গার্গলের মত করে বললাম, কেমন আছ মা?

মা থমথমে গলায় বললেন, তুই মুখে পানি নিয়ে কথা বলছিস কেন?

'গার্গল করতে করতে কথা বলছি। কথা বোঝা যাচ্ছে না?'

'পানি গিলে ফেলে স্বাভাবিক ভাবে কথা বল।'

'ডিরেক্টর সাহেবকে তুমি এখনো খবর দিচ্ছ না কেন? উনি না বলে গেলেন জ্ঞান ফিরলেই তাকে খবর দিতে হবে?'

'তুই জানলি কীভাবে?'

'আমিতো জেগেই ছিলাম মটকা মেরে পড়েছিলাম। তোমরা কে কী বলছ সবই শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে বকু।'

'কথাতো বলছি, কথা বলছি না?'

'তোর কাণ্ডকারখানা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে তোর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।'

'সর্বনাশের সবে শুরু। তুমি শুরু দেখেই ঘাবড়ে গেলে? আসল যখন হবে তখন কী করবে?'

'আসল মানে?'

'এখনতো মদ খেয়েছি নির্জনে। পুকুর পাড়ে লিচু গাছের নীচে। তখন মদ খাব ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে। দরজা থাকবে ভেজানো। ঘর আধো আলো, আধো অন্ধকার।'

আমি খিল খিল করে হাসছি এবং প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এই বুঝি মা আমার উপর ঝাপিয়ে পড়েন। মা তা করলেন না। তিনি তাকিয়েই আছেন। তার চোখে পানি জমছে, কিন্তু কেঁদে ফেলার স্তরে এখনো আসেন নি। হয়ত ভাবছেন তাঁর আদরের কন্যা এখনো মাতাল।

'বকু তুই শুয়ে থাক। সকালে কথা বলব।'

'ওমা ভাত টাত না খেয়ে শুয়ে পড়ব কেন? রাতে ভাত না খেলে এক চড়ুইয়ের রক্ত কমে যায়, তাছাড়া আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। আজ আমি সারা রাত জেগে থাকব।'

'বকু।'

'হুঁ।'

'তোর ছবিতে কাজ করার দরকার নেই। চল আমরা চলে যাই।'

'খুব ভাল কথা। চল তাই করি। তুমি যাও ডিরেক্টর সাহেবকে বুঝিয়ে বল— বুঝিয়ে বললে তিনি বুঝবেন। আর তুমি যদি বুঝিয়ে বলতে না পার, আমি বলছি।'

আমি বিছানা থেকে নামার উপক্রম করতেই মা এসে আমাকে ধরে ফেললেন। অসম্ভব আদুরে গলায় বললেন, বকু শুয়ে থাক। আয় আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

আমি শুয়ে পড়লাম। মা আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছেন। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে দ্রুত আমার বয়স কমে যাচ্ছে। এই কাজটা আর কেউ পারে

না শুধু মায়েরা পারেন। সন্তানের বয়স আদর করে করে কমিয়ে দিতে পারেন। আমার এখন ইচ্ছে করছে গুটিশুটি মেরে মায়ের বুকের কাছে শুয়ে থাকি।

'বকু!'

'হুঁ।'

'তোর মধ্যে একটা অস্থির ভাব চলে এসেছে। তুই একদন্ড স্থির থাকতে পারছিস না। কারণটা কী বলতো ?'

'আমার মনে হয় আমি কারো প্রেমে পড়েছি।'

মা হাসি মুখে বললেন, কার প্রেমে পড়েছিস ?

'ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হয় ডিরেক্টর সাহেবের।'

মা হো হো করে হেসে ফেললেন। আমি মা'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছি—যেন এমন হাস্যকর কথা এর আগে আমরা কেউ শুনি নি।

'ডিরেক্টর সাহেবের প্রেমে কেন পড়েছি শুনতে চাও মা ?'

মা হাসি চাপতে চাপতে বললেন, কেন ?

উনার জ্ঞানী ধরনের কথাবার্তা শুনে। হিরোশিমায় বোমা পড়েছিল আটই আগস্ট সকাল আটটা পনেরো মিনিটে এই জ্ঞানের কথা উনি না থাকলে আমি শুনতেই পেতাম না। উনাকে দেখলে কী মনে হয় জান মা ?

'কী মনে হয় ?'

'মনে হয় জ্ঞান ঘামের মত টপ টপ করে পড়ছে।'

মা হাসি চাপতে চাপতে বললেন, খবর্দার এইসব বাইরে আলোচনা করবি না। উনার কানে গেলে উনি মনে কষ্ট পাবেন।

'পাগল হয়েছ এইসব আমি আলোচনা করব ? আমার ৪৬টা ক্রমোজমের ২৩টা আমি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। এই ২৩টা ক্রমোজম ভর্তি বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি আমার আছে না ? উনাকে দেখলে আমি কী করি জান ? আমি হতাশ একটা ভাব ধরে এক দৃষ্টিতে উনার দিকে তাকিয়ে থাকি। যাতে উনি মনে করেন আমি উনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'এ রকম করিস কেন ?'

'মজা লাগে এই জন্যে করি।'

মা আমাকে আরো কাছে টানলেন। তাঁর মুখে কেমন শান্তি শান্তি ভাব। মেয়ে সম্পর্কে তাঁর মনে যে দুঃশ্চিন্তা ছিল তা ঝড়ের মত উড়ে গেছে।

'বকু!'

'বল মা।'

'ভদকা মেশানো সরবতটা তুই কী মনে করে খেলি বলতো মা ?'

'রাগ করে খেয়েছি। সোহরাব চাচা পাপিয়া ম্যাডামকে এই সরবত দিলেন, আমাকে দিলেন না, তখনই রাগ লাগছিল। তাছাড়া মাতাল হয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল কেমন লাগে।'

'আর কখনো এরকম করবি না।'

'আচ্ছা করব না। মা শোন, আমার ক্ষিধে লেগেছে।'

'আমাদের খাবার ঘরে দিয়ে যাবে।'

'ইউনিটের খাবার সবার সঙ্গে মিলে খেতে ইচ্ছা করে— চল নীচে গিয়ে হৈ হৈ করে খেয়ে আসি।'

'সত্যি খেতে চাস ?'

'হুঁ চাই।'

'তারপর সেখানে গিয়ে তুই যদি উল্টোপাল্টা কোন কথা বলিস ?'

'কোন উল্টোপাল্টা কথা বলব না।'

মা বিছানা থেকে নামলেন। তিনি চুল আঁচড়াবেন, শাড়ি পাল্টাবেন। হয়তোবা ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিকও দেবেন। আমরা মা-মেয়ে হাসি মুখে নীচে খেতে যাব। মা খেতে খেতেই জেনে নেবেন আজ সারাদিনে কোথায় ইন্টারেস্টিং কী ঘটনা ঘটল।

আমাদের খেতে যাওয়া হল না। সোহরাব চাচা দু'জনের খাবার নিয়ে চলে এলেন। আমি আহ্লাদী গলায় বললাম, কী খবর সোহরাব চাচা ?

সোহরাব চাচা হাসি মুখে বললেন, খবর খুবই ভাল। তুমি আছ কেমন ?

'আমি ভাল আছি।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আগামীকাল শুটিং আছে। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়। লম্বা একটা ঘুম দাও।'

মা কৌতূহলী গলায় বললেন, আজকের শুটিং কেমন হয়েছে ?

'ভাল হয়েছে বলেইতো শুনেছি।'

'সেলিমকে কি রাখা হচ্ছে, নাকি ফরহাদ সাহেব অভিনয় করবেন ?'

'এখনো জানি না। স্যার স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না।'

মা গম্ভীর মুখে বললেন, ছবি চলে স্টারদের নামের উপর। ফরহাদ সাহেবকে ছবির স্বার্থেই রাখা উচিত। আপনি মঈন ভাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

'কিচ্ছু বলতে হবে না। এইসব ব্যাপার স্যার খুব ভাল জানেন।'

রাতের খাবার আমি আরাম করেই খেলাম। মুরগীর গোশত, ভাজি, ডাল আর কালিজিরা ভর্তা। কয়লার মত কাল একটা বস্তু। ভাত মাখলেই কাল হয়ে যাচ্ছে। খেতেও ভাল না, তিতকুটে তিতকুটে ভাব।

মা বললেন, এই ভর্তাটা তোর বাবার খুব প্রিয়। তোর বাবা খুব আগ্রহ করে খেত। এখন আর খেতে পারে না।

আমি বললাম, এখনো নিশ্চয়ই খায়। নতুন মা রেঁধে রেঁধে যত্ন করে খাওয়ান।

মা বললেন, ঐ ধুমসী সেজেই কূল পায় না রেঁধে খাওয়াবে কী ? তোর বাবার কী পছন্দ, কী অপছন্দ ঐ ধুমসী তার কিছুই জানে না।

'তুমি জানলে কী করে ?'

'একদিন ঐ বাসায় গিয়েছি ধুমসী নাস্তা দিয়েছে নুডলস। নুডলস তোর বাবার দু'চক্ষের বিষ। তার কাছে না-কি দেখতে কৃমির মত লাগে। বাসায় আমি কোনদিন এই কারণে নুডলস রান্না করি নি। ধুমসী সমানে রাঁধছে।'

'নতুন মা'র নুডলসই হয়ত এখন বাবার কাছে অমৃতের মত লাগছে। বাবা সোনামুখ করে খাচ্ছেন। বাটিরটা শেষ হয়ে গেলে বলছেন, ওগো কৃমি ভাজা আরেকটু দাও খেতে মজা হয়েছে।'

মা কঠিন গলায় বললেন, তুই নতুন মা নতুন মা করছিস কেন ?

আমি বললাম, বাবার স্ত্রীকে মা ডাকব না ? তাছাড়া তিনি নতুনতো বটেই। তুমি পুরানো মা উনি নতুন মা।

মা থালা সরিয়ে উঠে পড়লেন। আমি সাধ্য সাধনা করলাম না, কারণ তাতে লাভ হবে না। মা'র "ভাত-রাগ" কঠিন রাগ। সহজে এই রাগ ভাঙ্গে না।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় বললেন, তুই দূরে সরে ঘুমো গায়ের উপর এসে পড়বি না। গরম লাগে।

আমি বললাম, গরম কোথায় তুমিতো কম্বল গায়ে দিচ্ছ।

'সরে ঘুমুতে বললাম, সরে ঘুমো।'

আমি সরে গেলাম। খুব ভাল করেই জানি আমাকে দূরে সরিয়ে মা বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই আমার কাছে সরে আসবেন। আমি যেমন মায়ের গায়ের গন্ধ ছাড়া ঘুমুতে পারি না, মা'র বেলাতেও তাই। তিনিও আমার গায়ের গন্ধ ছাড়া ঘুমুতে পারেন না।

'বকুল!'

'কী মা।'

'আমি একজন দুঃখী মহিলা। দুঃখী মহিলাকে কি আরো বেশি দুঃখ দিতে আছে?

'দুঃখী মহিলা বলেইতো তোমাকে দুঃখ দি।'

'ও আচ্ছা।'

'মা ঘুম আসছে না। একটা গল্প বল। গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আমি গল্প জানি না।'

'নিজের জীবনের গল্প বল। এইগুলি শুনতে আমার ভাল লাগে।'

মা জবাব দিলেন না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি মা'র কাছে এগিয়ে এলাম। তার গায়ে একটা হাত তুলে দিলাম। মা ঝটকা মেরে সেই হাত সরিয়ে দিলেন না।

'মা!'

'কী?'

'তোমার বিয়ের গল্প বলতো মা। এই গল্প আমি যতবার শুনি ততবার ভাল লাগে।'

'আজ থাক আরেকদিন বলব। আজ শরীরটা ভাল লাগছে না। মনে হয় জ্বর আসছে।'

'জ্বর নেই মা, তোমার গা ঠাণ্ডা। গল্পটা বল— রিকশা থেকে ধুপ করে পড়ে গেলে— সেখান থেকে শুরু কর। জায়গাটা যেন কোথায়? কাওরান বাজার না?'

'বকু, ঘুমো। আমার শরীরটা আসলেই ভাল লাগছে না।'

'অসাধারণ এই গল্পটা তুমি বলবে না?'

মা আবারো নিঃশ্বাস ফেললেন। আজ আর গল্প হবে না। আমি ঘুমুবার আয়োজন করছি। আয়োজন মানে চোখ বন্ধ করে ফেলা। চোখ বন্ধ করে মজার মজার কিছু দৃশ্য কল্পনা করা।

'বকু!'

'কী মা?'

'ঘটনাটা কাওরান বাজারে ঘটে নি। কাকরাইলে ঘটেছে। ট্রাফিক সিগন্যাল আছে না— ঐ জায়গায়।'

'তুমি যাচ্ছিলে রিক্সা করে তাইতো? সময় যেন কত?'

'দুপুর। নিউ মার্কেটে স্যান্ডেল কিনতে গিয়েছিলাম। কোনটাই পছন্দ হয় না। বলতে গেলে সব একই ডিজাইন। থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর। সেখান থেকে গেলাম নিউ এলিফেন্ট রোড এই ভাবে দেরি হয়ে গেল।'

‘তারপর ?’

‘একটা রিকশা নিলাম।’

‘রিকশা নিলে কেন মা। তোমার উচিত ছিল বেবী টেক্সি নেয়া।’

‘বেবী টেক্সিই নিয়েছিলাম। বেবী টেক্সিতে বসে আছিতো বসেই আছি— টেক্সি আর স্টার্ট নেয় না। শেষে বিরক্ত হয়ে নেমে পড়েছি। বেবী টেক্সি থেকে নেমে যেই রিকশায় উঠেছি— ওম্নি বেবী টেক্সিটা স্টার্ট নিল।’

‘মা একেই বলে ভবিতব্য। তুমি ধৈর্য ধরে আর দু'মিনিট অপেক্ষা করলে ঘটনাটা ঘটত না। তারপর কী হল বল।’

মা গল্প থামিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীরটা আসলেই ভাল লাগছে না। ভালমত দেখতো জ্বর আছে না-কি।

আমি কপালে হাত দিলাম। হ্যাঁ জ্বর আসছে। দ্রুতই আসছে। কপাল গরম।

মা'র জ্বর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব বাড়ল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কাল আমার শুটিং। শুটিং এর দৃশ্য মা দেখতে পাবেন না। জীবনের প্রথম তাঁর কন্যা ছবিতে অভিনয় করবে। তিনি জ্বর গায়ে বিছানায় ছটফট করবেন।

‘মা মাথায় পানি ঢালব ?’

‘না।’

‘মাথা টিপে দেব মা ?’

‘না। বাতিটা জ্বালিয়ে রাখ। কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।’

‘কিসের ভয় ?’

‘জানি না কিসের ভয়। বাতি জ্বালাতে বললাম, বাতি জ্বালা।’

আমি বাতি জ্বালিয়ে থার্মোমিটারে মা'র জ্বর মাপলাম। একশ তিন পয়েন্ট পাঁচ। তবে জ্বর মনে হয় কমছে। গা ঘামছে।

‘কাল তোর শুটিং আছে না ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি দেখতে পারব না।’

‘তুমি খুব ভালই দেখতে পাবে। সকালের মধ্যে তোমার জ্বর সেরে যাবে। পানি খাবে মা ? পানি এনে দি ?’

‘না।’

‘ঘরের বাতি নিভিয়ে বাথরুমের বাতি জ্বেলে দি। আলো চোখে লাগছে।’

‘না না, ভয় লাগে। তুই আমার আরো কাছে আয়।’

আমি মা'র বুকের কাছে চলে এলাম। তাঁর শরীরের গরমে মনে হয় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুম আনানোর চেষ্টা করছি। কাল সারাদিন শুটিং হবে আমার ভাল ঘুম দরকার। চোখের নীচে যেন কালি না পড়ে। মা জ্বরে ছটফট করছেন। আমাকে ঘুমুতে হলে সুন্দর একটা স্বপ্ন তৈরি করতে হবে। এই অবস্থায় সুন্দর কোন স্বপ্ন তৈরি করা সম্ভব হবে কি ? আচ্ছা চেষ্টা করা যাক।

'নৌকায় করে আমরা যাচ্ছি। আমি, আমার স্বামী এবং আমাদের ছোট্ট বাবু। বাবুটার জ্বর উঠেছে। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছি। আকাশে খুব মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। বাবুর গায়ে জ্বর না থাকলে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতাম। আহা বেচারা হঠাৎ জ্বর এসে গেল। মুখ শুকিয়ে কী হয়েছে ! ব্যাটা পানি খাবি ?

'উহুঁ। বাবার কোলে যাব।'

'বাবার কোলে যাবি কী ? তুই থাকবি আমার কোলে।'

'গল্প বল না।'

'ওমা শখ কত। জ্বর গায়ে গল্প শুনতে চায়। কিসের গল্প শুনতে চাস ?'

'ভূতের গল্প।'

'দিনে দুপুরে ভূতের গল্প কিরে বোকা ছেলে ?'

'ভূতের গল্প বল।'

'কুণি ভূত আর বুনি ভূতের গল্প শুনবি ?'

'হুঁ শুনব।'

'ঘরের কোণায় যে ভূত থাকে তাকে বলে কুণি ভূত। আর যে ভূত থাকে বনে তার নাম বুনি ভূত।'

গল্প বলা হল না, বৃষ্টি এসে গেল। আমি বাবুকে নিয়ে নৌকার ছইয়ের নীচে চলে গেলাম। বাবুর বাবা এখনো নৌকার পাটাতনে বসে আছে। মনে হয় ভদ্রলোকের বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছা।

'রুমালী বাবুকে শুইয়ে চলে এসতো আমরা বৃষ্টিতে ভিজি।'

আচ্ছা মানুষটার কি কান্ডজ্ঞান নেই ? বাচ্চাটার এমন জ্বর— তাকে একা একা বিছানায় শুইয়ে আমরা মজা করব ! বৃষ্টিতে ভিজব ! বৃষ্টিতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। সবে শ্রাবণ মাসের শুরু। সারা মাসতো পড়েই আছে।

'কই রুমালী এসো।'

'উহু। বাবুকে একা ফেলে কীভাবে আসব ?'

'ওকে নিয়েই এসো। বৃষ্টিতে ভিজলে ওর জ্বর সেরে যাবে। একে বলে জল চিকিৎসা।'

'লাগবে না আমার জল চিকিৎসা।'

বাবু কোলের ভেতর নড়ে চড়ে উঠল। ওর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না। বাবার কথা কানে গেছে এখন কি আর আমার কথা শুনবে। এমন নিমকহারাম ছেলে। এত আদর করি— তারপরেও শুধু বাবা, বাবা, বাবা।

বাবু ঠোঁট ফুলিয়ে ডাকল, মা।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কী হল আবার ?

'বৃষ্টিতে ভিজব মা।'

'অসম্ভব— এই বৃষ্টিতে ভিজলেই নিউমোনিয়া হবে।'

'হবে না।'

'তুই জানলি কী করে তুই কি ডাক্তার ?'

'আমি ডাক্তার না হলেও বাবাতো ডাক্তার।'

কল্পনার গল্প এইখানে থেমে গেল। হঠাৎ যেন ছন্দপতন হল— কারণ বাবুর বাবাতো ডাক্তার নন। বাবুর বাবা হলেন ..... ।

আশ্চর্য কল্পনাতেও মানুষটার কথা ভাবতে লজ্জা লাগছে কেন ? এত লজ্জা করলেতো আমার চলবে না। কল্পনার এই গল্পটা আপাতত বাদ থ'ক। আমি বরং অন্য কোন গল্প শুরু করি। যে গল্পে বাবুর বাবার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হবে। বাবুর বাবা প্রথম আমার হাত ধরে, বলবেন— ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি।

আচ্ছা জাহেদাকে জিজ্ঞেস করে একবার কি জেনে নেব আমার বর কী হবে, ডাক্তার না অন্য কেউ ? ভবিষ্যৎ জানতে পারার সত্যি সত্যি কোন ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। বিশাল একটা যন্ত্র থাকবে। সেই যন্ত্রে কম্পিউটারের পর্দার মত পর্দা। টিকিট কেটে যন্ত্রটার কাছে যেতে হবে। ভবিষ্যতে কী হবে প্রশ্ন করা মাত্র যন্ত্রটা জবাব দিয়ে দেবে। প্রশ্ন উত্তরের ধরনটা কেমন হবে ?

'স্যার বলুনতো আজ আমি রিকশা করে নিউমার্কেটে যাব। যাওয়া এবং ফেরার পথে কোন ঘাতক ট্রাকের সঙ্গে কলিশন হবে ?'

'না।'

'আজ রাতে আমি কী দিয়ে ভাত খাব ?'

'এক পিস ইলিশ মাছ ভাজা, আলু ভর্তা আর ডাল।'

'কোন তরকারি থাকবে না ?'

'থাকবে। তবে তুমি খাবে না।'

'খাব না কেন ?'

'দুপুরে রান্না করা তরকারি। জ্বাল দেয়া হয় নি টকে গেছে এই জন্যে খাবে না'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'ইউ আর ওয়েল কাম ইয়াং লেডি।'

'স্যার একটা শেষ প্রশ্ন।'

'বল।'

'একটা ভয়ংকর ব্যাপার আমার জীবনে ঘটে গেছে। আমি একজন বুড়ো মানুষের প্রেমে পড়ে গেছি। ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারছি না। যতই দিন যাচ্ছে আমি ততই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছি। আমার মাথা কি কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে যাবে?'

'না। তোমার ঘোর কেটে যাবে। অল্প দিনের ভেতর ঘোর কেটে যাবে।'

'সেই অল্প দিন মানে কত দিন?'

'এক মাস।'

'মাত্র এক মাস?'

'ঘোর যত প্রবল হয়, তত দ্রুত কাটে।'

'ও আচ্ছা ধন্যবাদ।'

'তোমাকেও ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি।'

আমি ঘুমুতে চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। ভয়ংকর একটা খারাপ ইচ্ছা করছে। পৃথিবীর সবচে খারাপ মেয়েদের মনেই বোধ হয় এরকম ইচ্ছা হয়। মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সবচে খারাপ একটা মেয়ে। আমার ইচ্ছা করছে— চুপিচুপি মায়ের পাশ থেকে উঠে একতলায় নেমে যেতে। তারপর ডিরেক্টর সাহেবের ঘরের দরজায় আলতো করে নক করতে। উনি জেগে উঠে ঘুম জড়ানো গলায় বলবেন, "কে?" আমি বলব— "রুমালী।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙলে মানুষের জগৎ এলোমেলো থাকে তাঁর জগতটাও তখন থাকবে এলোমেলো। "রুমালী" শব্দটার মানে তিনি ধরতে পারবেন না। তিনি বলবেন, রুমালী কে? আমি বলব, রুমালী হল মিস হ্যান্ডকারচিফি কিংবা মিস ন্যাপকিনি। তিনি অবাক হয়ে দরজা খুলে বলবেন, ও তুমি। এত রাতে কী ব্যাপার?

'আমার জ্ঞান ফিরলে আপনাকে খবর দেয়ার কথা বলেছিলেন। খবর দেয়া হয় নি। এখন খবর দিতে এলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার ঘুম আসছে না। আমি যদি কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন ?'

'না রাগ করব না।'

আমি তখন আহ্লাদী গলায় বলব, কেউ দেখে ফেললে খুব সমস্যা হবে। এত রাতে আপনার সঙ্গে গল্প করছি। দুষ্ট লোক নানান কথা ছড়াবে।

'তাহলে কি গল্প করার পরিকল্পনা বাতিল ?'

'না বাতিল না। আমরা বাতি নিভিয়ে গল্প করব। বাতি নেভানো থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'তা ঠিক।'

'অবশ্যি কথা বলতে হবে ফিস ফিস করে।'

'হুঁ।'

'হুঁ বলে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান। এবং দয়া করে বাতি নিভিয়ে দিন।'

তিনি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াবেন এবং বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দেবেন।

ছিঃ আমি এসব কী ভাবছি ? আমার মাথা কি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে ? আমি বিছানায় উঠে বসলাম এবং মা'কে ডেকে তুললাম। মা উঠে বসে ভয় ধরানো গলায় বললেন, কে ? কে ?

আমি বললাম, কেউ না মা। আমি। মিস ন্যাপকিনি।

'কী হয়েছে ?'

'গল্পটা শেষ কর মা ?'

'কিসের গল্প ?'

'ঐ যে কাকরাইল ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে তুমি ধপাস করে রিক্সা থেকে পড়ে গেলে।'

'কী বলছিস তুই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাবার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হবার বিখ্যাত গল্পটা। তুমি শুরু করেছিলে; শেষ কর নি। আমি শেষটা শুনতে চাই।'

মায়ের চোখ থেকে ঘুম এখনো কাটে নি। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি বসে আছি শিমুল গাছের নীচে। আগুনরাঙা ফুলে গাছ ঢেকে আছে। আমার চারদিকেও রাশি রাশি ফুল। আমার হাতে একটা কাগজ এবং কলম। কাগজে আমি একটি চিঠি লিখছি। তিন লাইনের চিঠি।

জামিল ভাই,
আমি আপনাকে ভালবাসি।
ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি।

আমার চোখ ভর্তি পানি। চিঠি শেষ হওয়া মাত্র আমার গাল বেয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। এবং আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম কারণ জামিল ভাই চুপিচুপি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি হাতের কাগজটা মুঠোর ভেতর লুকিয়ে ফেললাম।

না, বাস্তব কোনো ব্যাপার না। এই আমি রুমালী নই—এই আমি হচ্ছি ছবির দিলু, যে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র লিখেছে। যে প্রেমপত্র সে তার প্রেমিককে দিতে পারছে না। সে তার গোপন ভালবাসার কথা পৃথিবীর কাউকেই জানাবে না। জানানো সম্ভব নয়।

জামিল ভাইয়ের সঙ্গে দিলুর কিছু কথা হবে। কথা শেষ হবার পর দিলু ছুটে চলে যাবে। চিত্রনাট্যটা এরকম।

শট ওয়ান।
(টপ শট। ক্যামেরা প্যান করবে।)
শিমুল গাছের শিমুল ফুল থেকে দিলু। দিলু কাগজে চিঠি লিখছে।
দিলুর চারপাশে শিমুল ফুল।

শট টু।
(ক্যামেরা চার্জ করে দিলুর মুখের উপর। ক্লোজ শট।)
দিলুর চোখে জল। জল গড়িয়ে গালে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

শট থ্রি।

(ও এস শট। ক্যামেরা দিলুর পেছনে। ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে চিঠির লেখাগুলি পড়া যাচ্ছে। ক্যামেরা ওয়াইড হবে। ফ্রেমে ঢুকবে জামিল। দিলুর পাশে দাঁড়াবে। দিলু চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বে।)

শট ফোর।

(টু শট। মিড ক্লোজ। দিলু ও জামিল।)

জামিল ঃ তুই এখানে ? চারদিকে তোকে খোঁজা হচ্ছে। কী করছিলি ?

দিলু ঃ কিছু করছিলাম না।

জামিল ঃ কাগজ-কলম নিয়ে বসে আছিস, চোখ ভেজা .... ব্যাপার কী ? কবিতা লিখছিলি ?

দিলু ঃ হুঁ।

জামিল ঃ দেখি কী লিখলি ?

দিলু ঃ না।

জামিল ঃ না কেন ? তুই সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে গোপনে মহিলা কবি হয়ে যাবি আমরা কেউ জানব না, তা হবে না। দেখি। একী, কাগজটা কচলাচ্ছিস কেন ?

শট ফাইভ।

(ক্লোজ শট। দিলুর হাত। হাতের মুঠোয় কাগজ। কাগজটা সে কচলাচ্ছে। জামিল কাগজটা নিতে হাত বাড়াল।)

শট সিক্স।

(লং শট। দিলু জামিলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। বাতাসে দিলুর চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে।)

শট সেভেন।

(মিড ক্লোজ শট। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে জামিল।)

শট এইট।

(দিলু নদীর পার ঘেঁষে দৌড়াতে দৌড়াতে কাশবনের ভিতর ঢুকে গেল। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে শুধু কাশবনের ফুল কাঁপছে।)

সাত নম্বর শট পর্যন্ত নেয়া হয়ে গেল। আট নাম্বার শট — কাশবনের দৃশ্য বাকি রইল। কাশবনের জন্যে যেতে হবে সোমেশ্বরী নদীর পারে। কাশবন

যেখানে পাওয়া গেছে সেই জায়গাটাও অনেক দূরে। হেঁটে যেতে হবে। দু'তিন ঘণ্টা লাগবে যেতে। এই শটটা অন্যদিন নেবার কথা। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আজই শটটা নিয়ে নেব। পরে কনটিনিউইটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্যামেরা চলে যাক। আমরা একটু পরে যাই।

ক্যামেরা ইউনিট সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। ক্যামেরাম্যান আজিজ আংকেল আমাকে বললেন, বকুল শুনে যাও।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি কী বলবেন তা আমি জানি বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যি যে কথাগুলি মানুষ বলবে বলে ভেবে রাখে সব সময় তা বলতে পারে না। শেষ মুহূর্তে অন্য কথা বলে। আজিজ আংকেলের ব্যাপারে এই সমস্যা হবার কথা না।

'বকুল আজ গরমটা কেমন পড়েছে বল তো?'

'খুব গরম।'

'শেষ বিচারের দিন সূর্য যেমন মাথার উপর চলে আসবে— মনে হচ্ছে আজও সূর্য মাথার উপর চলে এসেছে।'

'জ্বি।'

'খুব বেশি করে পানি খাবে। শরীর ঠিক রাখার একটামাত্র পথ, বেশি করে পানি খাওয়া। সারা দিনে মাঝারি সাইজের এক কলসি পানি খেলে তুমি শরীর নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'আচ্ছা, এখন থেকে সারা দিনে এক কলসি পানি খাব। আর কোনো উপদেশ?'

'না, আর কোনো উপদেশ না। তোমার অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। মঈন ভাই তোমাকে নিশ্চয়ই বলবেন। আমি আগেই বললাম। তোমার অভিনয় তো আমি আগে দেখি নি— এই প্রথম দেখছি। যতবার তুমি পর্দায় আসবে— ততবার পর্দা ঝলমল করে উঠবে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমাকে ছোট্ট একটা টিপস্ দেই। তোমার চোখ যেই মুহূর্তে ক্যামেরা লেভেলের সঙ্গে চলে আসবে সেই মুহূর্তে তুমি তোমার থুতনি একটু ভেতর দিকে টেনে নেবে। নেবে খুব আস্তে। ঝট করে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'একটু করে দেখাও তো!'

আমি দেখালাম। আজিজ আংকেল বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন যাও। এক জগ ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ফেল।

আমি যাচ্ছি আমার মা'র দিকে। মা'র জ্বর নেই তবে শরীর এখনো সারে নি। ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। বুকের ভেতর থেকে কেমন ঘড়ঘড় শব্দও হচ্ছে। তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার কথা, কিন্তু তিনি শুটিং দেখতে এসেছেন। বড় ছাতার নীচে বসে আছেন। গরমে ঘেমে চপচপ করছেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটু পরে পরে কাশছেন। তাঁর চোখমুখ লালচে হয়ে আছে। আবার বোধহয় জ্বর আসছে।

মা'র হাতে পাখা। তিনি প্রবল বেগে নিজেকে হাওয়া করছেন। তাতে লাভের মধ্যে লাভ এই হচ্ছে যে তিনি আরো ঘামছেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়ানো মাত্র মা গলা নিচু করে বললেন— বকু, তুই যখন দৌড়াচ্ছিলি তখন তোর শাড়ি উঠে গিয়েছিল!

'তাই?'

'হ্যাঁ, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে।'

'পায়ের বড় বড় লোম সব দেখা গেছে?'

'উদ্ভট কথা বলছিস কেন? তোর পায়ে লোম আছে নাকি?'

'ও আচ্ছা আমি ভুলেই গেছি আমার পায়ে লোম নেই।'

'বকু, তুই ফাজিল ধরনের হয়ে যাচ্ছিস।'

'কী করব মা বল— ছবির লাইনের এই সমস্যা। একটা ভাল মেয়ে ঢোকে, ফাজিল মেয়ে হয়ে বের হয়ে যায়। তোমার শরীর কেমন মা?'

'ভাল।'

'তুমি কি যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?'

'কাশবনে। এখন কাশবনের শুটিং হবে। এখান থেকে সাত কিলোমিটার দূর। নদীর পার ঘেষে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, পারবে?'

'কাশবনের শুটিংতো আজ হবার কথা না।'

'হবে, আজই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রওনা হব।'

'তোকে আমি একা ছাড়ব কীভাবে?'

'একা ছাড়তে তো বলছি না। তুমি সঙ্গে চল। পালকি তো পাওয়া যাবে না— ডিরেক্টর সাহেবকে বল উনি একটা খাটিয়া জোগাড় করে আনবেন। তুমি খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে যাবে। আমরা তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

'তোর কী হয়েছে বকু?'

'কিছু হয় নি তো!'

'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বল।'

'এখন বলব না— রাতে বলব।'

মা উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি দেখলাম তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে ডিরেক্টর সাহেবের দিকে যাচ্ছেন। তিনি তাঁকে কী বলবেন কে জানে ! তাঁর প্রধান চেষ্টা থাকবে আজ যেন কাশবনের শুটিংটা না হয়। কারণ তিনি সুস্থ না— তিনি অতদূর যেতে পারবেন না। তবে তিনি নিজের কথা বলবেন না, অন্য কোনো অজুহাত বের করবেন। আমি ছাতার নীচে বসলাম। তৃষ্ণা পেয়েছে। আজিজ আংকেলের কথা মত সারা দিনে এক কলসি পানি খাওয়া দরকার। আমার ইচ্ছা করছে এখনি এক কলসি পানি খেয়ে ফেলতে। টেবিলের উপর জগ আছে, গ্লাস আছে। আমি ইচ্ছা করলেই পানি খেতে পারি। কিন্তু খাচ্ছি না, তৃষ্ণাটা আরো বাড়ুক। তৃষ্ণা বাড়তে বাড়তে যখন সারা শরীরে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়বে তখন পানি খাব।

মা ডিরেক্টর সাহেবের কাছে পৌঁছেছেন, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। ডিরেক্টর সাহেব গভীর মনোযোগে চিত্রনাট্যের পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর পাশে গম্ভীর মুখে ফরহাদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ধারণা ডিরেক্টর সাহেব ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না বলেই এত মনোযোগ দিয়ে চিত্রনাট্য দেখছেন। এইবার ফরহাদ সাহেব কী যেন বলছেন। হাত-পা নেড়ে নেড়ে বলছেন। ডিরেক্টর সাহেব একবার শুধু তাকালেন, তারপর আবার চিত্রনাট্য পড়া শুরু করলেন। এখন মনে হচ্ছে মা কিছু বললেন। মা বললেন ফরহাদ সাহেবকে। মা'র সঙ্গে ফরহাদ সাহেবের কী কথা থাকতে পারে ? ফরহাদ সাহেব আবার কী যেন বললেন। এখন মা চলে আসছেন। মা'র মুখ হাসিহাসি। মনে হয় ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে ডিরেক্টর সাহেবের ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া না হলে মা'র মুখ এমন হাসিহাসি হত না।

ছুটে আসার কারণে মা হাঁপাচ্ছেন। হাঁপানি সামলে উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালেন।

'বকু।'

'বল।'

'ফরহাদ সাহেব অশ্রাব্য গালাগালি করছে। আমি দেখলাম এর মধ্যে থাকা ঠিক না। চলে এসেছি।'

'চলে এলে কেন ? ইন্টারেস্টিং ঝগড়া সবটা শোনা উচিত ছিল।'

'তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন ?'

‘রোদে মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে বলে যা মনে আসছে বলছি। মা, তুমি কি যাচ্ছ আমার সঙ্গে ?’

‘হ্যাঁ। তোকে কি আমি একা ছাড়ব ?’

‘ভাল।’

‘তুই কি চাস আমি সঙ্গে যাই না ?’

‘না না, তোমাকে যেতেই হবে। তুমি না গেলে কে দেখবে আমার শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত উঠল কি উঠল না ?’

মা তাকিয়ে আছেন। আমিও হাসি মুখে তাকিয়ে আছি। মা কাশতে শুরু করেছেন। কাশি কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই আমি বললাম, কাশি থামিও না তো মা, চালিয়ে যাও। ঝগড়ার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কাশির কোনো তুলনা হয় না।

মা কিছু একটা বলতে গেলেন, বলতে পারলেন না। তাঁর কাশি আবারো শুরু হল।

ডিরেক্টর সাহেব এবং ফরহাদ সাহেবের ঝগড়া মনে হয় ভালই জমেছে। সোহরাব চাচা দৌড়ে যাচ্ছেন। তিনি চোখে ইশারা করলেন— ইউনিটের আরো একজন দৌড়াচ্ছে। তারা ডিরেক্টর সাহেবকে গার্ড দিয়ে রাখবে। ফরহাদ সাহেব একটা ব্যাপার বোধহয় বুঝতে পারছেন না— তিনি এখন বাস করছেন ডিরেক্টর সাহেবের জগতে। এখানে কোনো উনিশ-বিশ করা যাবে না। ইউনিটের প্রতিটি মানুষ ডিরেক্টর সাহেবের মহা ভক্ত। এরা তাঁর জন্যে জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ডিরেক্টর সাহেব একবার যদি বলেন— ফরহাদ নামের এই বেয়াদবটাকে মেরে সোমেশ্বরী নদীতে ফেলে দাও, সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম তালিম হবে। ইউনিটের আরো একজন ছুটে যাচ্ছে। পাপিয়া ম্যাডামকে কোথাও দেখছি না। তিনি আজ শুটিং স্পটে আসেন নি।

‘বকু!’

‘হুঁ।’

‘চল কাছে গিয়ে শুনি কথাবার্তা কী হচ্ছে।’

‘তুমি যাও মা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি গিয়ে সব মন দিয়ে শোন— পরে আমাকে রিপোর্ট করবে।’

‘এরকম করছিস কেন, আয় না! সব বিষয়ে তোর কৌতূহল এত কম কেন ? আয় না।’

আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এগুচ্ছি। অনিচ্ছার প্রধান কারণ হচ্ছে ফরহাদ

সাহেবের কুৎসিত গালাগালি শুনে ডিরেক্টর সাহেব যদি কোনো কুৎসিত গালি দিয়ে বসেন তা হলে আমার খুব খারাপ লাগবে। ভদ্রলোক এখনো অবশ্যি মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই শান্ত ভঙ্গি কতক্ষণ থাকবে সেটাই কথা। এক সময় হয়তো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে তিনি বস্তির মানুষের মুখের কোনো নোংরা গালি দিয়ে বসবেন। তাঁর মুখে সেই গালি শুনে মা খুব মজা পেতে পারেন— আমি পাব না।

এদের দু'জনকে ঘিরে এখন অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দিন যে মওলানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনিও আছেন। মেরাজ মাস্টার। এই ভদ্রলোকের আগ্রহই মনে হচ্ছে সবচে বেশি। তিনি চোখ বড় বড় করে প্রতিটি কথা শুনছেন এবং মনে হয় বিমল আনন্দ পাচ্ছেন। আমরা দু'জন কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। যেসব কথাবার্তা শুনলাম তা হচ্ছে—

ফরহাদ ঃ (রাগে তাঁর মুখে থুথু চলে এসেছে। ঠোঁটের কোণায় থুথু। তিনি মনে হয় মদ খেয়ে এসেছেন। গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।) বাইচলামি ? আমার সঙ্গে বাইচলামি ! সারাদিন মেকাপ নিয়ে বসায়ে রেখে আরেকজনকে দিয়ে শুটিং করায়। সম্বুন্ধির বাচ্চা তুমি ভাব কী ?

ডিরেক্টর সাহেব ঃ (তাঁর মুখভঙ্গির সামান্যতম পরিবর্তন হয় নি। তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। নিজে একটা ধরালেন। প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।) ফরহাদ সাহেব, নিন সিগারেট খান। সিগারেট খেয়ে মেজাজ ঠিক করুন।

ফরহাদ ঃ সিগারেট। শালা সিগারেট আমি তোর ইয়ে দিয়ে ঢুকায়ে দিব।

ডিরেক্টর ঃ (একটু মনে হল বিস্মিত হয়েছেন।) তাই নাকি ?

ফরহাদ ঃ (রাগ এখন চরমে উঠেছে) আবার বলে তাই নাকি ? আমি দুইশ টাকা শিফটের এক্সট্রা না, আমি মেগাস্টার।

ডিরেক্টর ঃ মেগাস্টার— আমার কথা শুনুন। আপনার গালাগালি যা দেবার দ্রুত দিয়ে শেষ করুন। আমার কাজ আছে। আপনার গালাগালি আমি অনেক আগেই বন্ধ করতে পারতাম, বন্ধ করছি না কারণ সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছে এবং খুব আনন্দ পাচ্ছে, তাদের এই আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত করতে চাচ্ছি না।

ফরহাদ ঃ শুওরের বাচ্চা আমি তোর মুখে পিশাব করে দি।

ডিরেক্টর ঃ কখন করতে চান, এখন ? করুন।

মা এই পর্যায়ে খামচি দিয়ে আমার হাত ধরলেন— কারণ ফরহাদ সাহেব সত্যি সত্যি তাঁর প্যান্টের জিপারে হাত দিয়েছেন। টেনশনে মা'র কাশি ভাল হয়ে গেছে। তিনি এতক্ষণে একবারও কাশেন নি। মা ফিসফিস করে বললেন— বকু

ও তো সত্যি সত্যি প্যান্ট খুলছে। চল চলে যাই।

আমি ফিসফিস করে বললাম, না। শেষটা দেখব। তোমার লজ্জা বোধ করার কোন কারণ নেই মা। ভেবে নাও রাস্তার কোনো নগ্ন পাগল। তাছাড়া ফরহাদ সাহেব নগ্ন হবার আগেই কোনো একটা ব্যবস্থা হবে।

'কী ব্যবস্থা হবে ?'

'কী ব্যবস্থা হবে আমি জানি না, কিন্তু একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।'

ফরহাদ সাহেব টান দিয়ে জিপার পুরোপুরি খুলে ফেলেছেন। জিপারের ফাঁক দিয়ে তার লাল আন্ডারওয়ার দেখা যাচ্ছে। ছেলেরা এমন লাল টুকটুক আন্ডার ওয়ার পরে আমি জানতাম না। আমি ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকালাম। ঘটনাটা তিনি অনেক দূর এগুতে দিয়েছেন। এতদূর এগুতে দেয়া ঠিক হয় নি। আমি হলে দিতাম না।

ডিরেক্টর সাহেব সিগারেট ধরালেন। তারপর সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে মওলানা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন— মওলানা সাহেব একটু শুনুন তো। কাছে আসুন।

মওলানা সাহেব এগিয়ে গেলেন।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আপনি কি আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে পারবেন ?

মওলানা বললেন, অবশ্যই পারব জনাব।

'ফরহাদ নামের এই বদ মানুষটাকে আমি এমন এক শাস্তি দিতে চাই যা তার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। আপনি এর কানে ধরে পুরো মাঠের চারদিকে একবার চক্কর দেয়াবেন। এই দৃশ্যটা আমরা ক্যামেরায় ধরে রাখব। পারবেন না ?'

'জনাব, আপনি হুকুম দিলে পারব। ইনশাল্লাহ।'

ফরহাদ সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছু বলতে গেলেন— বলতে পারলেন না। আমি তাকালাম ডিরেক্টর সাহেবের দিকে— তাঁর মুখ হাসিহাসি। তাঁর চোখ কঠিন হয়ে আছে। এমন কঠিন চোখ সচরাচর দেখা যায় না। মা আমার হাত খামচে ধরে বললেন, কী হবে রে ? আমি জবাব দিলাম না। লক্ষ্য করলাম সোহরাব চাচা এগিয়ে এসে ফরহাদ সাহেবের কানে-কানে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদ সাহেবের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন পড়ার অবস্থা। এতক্ষণ যে মানুষটা হৈচৈ চিৎকার করছিল সে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। বেঁটেখাটো মেরাজ মাস্টার এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি কি এই মানুষটাকে কান ধরে মাঠের চারপাশে চক্কর খাওয়ানো হবে ?

ফরহাদ সাহেব তাঁর প্যান্টের খোলা জিপার টান দিয়ে তুলে বিড়বিড় করে

বললেন— মঈন ভাই, আমার ভুল হয়েছে। মাফ করে দেন। সকাল থেকে বিয়ার খাচ্ছি— যা করেছি নেশার ঝোঁকে করেছি।

ডিরেক্টর সাহেব গলা উঁচিয়ে বললেন— স্টিল ক্যামেরাম্যান কোথায় ? কানে ধরে দৌড়ানোর ছবি তুলে রাখ। ক্যামেরা ইউনিট কি কাশবনে চলে গেছে ?

সোহরাব চাচা বললেন, জ্বি স্যার।

'আর্টিস্ট ? আর্টিস্ট গিয়েছে ?'

বলেই তিনি আমাকে দেখলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন— চল যাই, দেরি হয়ে গেল তো। মেকাপম্যান কোথায় ? তাকেও যেতে হবে।

ফরহাদ সাহেবের সামনে এসে মেরাজ মাস্টার দাঁড়িয়েছেন। কানে হাত দেবেন কি দেবেন না মনস্থির করতে পারছেন না। তিনি আবারো তাকালেন ডিরেক্টর সাহেবের দিকে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মওলানা সাহেব বাদ দিন। একে এই জংলা মাঠের চারদিকে কানে ধরে ঘোরালে কিছু হবে না। একে ঘোরাতে হবে এফডিসির চারদিকে। এই কাজটা আমি ঢাকায় গিয়ে করব।

মেরাজ মাস্টার বললেন, স্যার, আমি কি শুটিং দেখার জন্যে আপনাদের সঙ্গে আসব ?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, অবশ্যই আসবেন। আপনি বিসমিল্লাহ বলে ক্যামেরায় ফুঁ দিয়ে দেবেন, তারপর ক্যামেরা ওপেন হবে। তার আগে না।

চারপাশের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। শুধু ফরহাদ সাহেব ঘামছেন। খুব ঘামছেন। তিনি যে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। সোহরাব চাচা কানে-কানে কথা বলার পর থেকে পরিবর্তনটা হয়েছে। কানে-কানে বলা কথাগুলি কী ? সোহরাব চাচা কি আমাকে বলবেন ? মনে হয় না। তিনি হড়বড় করে সারাক্ষণ কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু গোপন কথা গোপনই রাখেন। মানুষটাকে হয়তো এই কারণেই সবার ভাল লাগে। যে কথাগুলি ম্যাজিকের মত কাজ করল, সেই কথা সোহরাব চাচা আগে কেন বললেন না !

আমরা কাশবনের দিকে রওনা হয়েছি। মা যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর এমন অসুস্থ শরীর — আমি জানি আজ শুটিং শেষে তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী হবেন। না গেলে চলত, কিন্তু তিনি যাবেনই। মা লেফট রাইটের ভঙ্গিতে দ্রুত পা ফেলছেন। প্রমাণ করার চেষ্টা যে তিনি মোটেই অসুস্থ না। খুব সুস্থ। তিনি হাঁটছেন ডিরেক্টর সাহেবের পাশে পাশে। আমি পিছিয়ে পড়েছি। আমার পাশে পাশে আসছেন মেরাজ মাস্টার। ভদ্রলোক আজ সেজেগুজে এসেছেন। চোখে

সুরমা। পায়জামা ইস্ত্রি করা। আমাদের সঙ্গে দু'জন ছত্রধর যাচ্ছে। একজনের হাতে সবুজ রঙের বিশাল ছাতি। এই ছাতি ডিরেক্টর সাহেবের মাথায় ধরার কথা। ডিরেক্টর সাহেব ইশারায় নিষেধ করেছেন বলে ছাতা ধরা হয় নি। ছাতাটা ধরলে ভাল হত, মা খানিকটা ছায়া পেতেন। আমার মাথায় উপর ছাতা ধরা আছে। আমি ভদ্রতা করে নিষেধ করি নি। ছায়া আমার প্রয়োজন। কড়া রোদে মেকাপ নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্যি আমার ধারণা মেকাপ নষ্ট হলেও ক্ষতি নেই। পুরো দৃশ্যটা লং শটে ধরা থাকবে। এতদূর থেকে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাওয়ার কথা না।

'মা, আপনি কি আমাকে চিনেছেন ?'

'জ্বি চিনেছি। আপনি মেরাজ মাস্টার।'

'আপনাদের সঙ্গে যে যাচ্ছি খুবই ভাল লাগছে। সবাই কেমন হৈচৈ করতে করতে যাচ্ছেন। দলের সঙ্গে থাকার মজাই আলাদা।'

'জ্বি।'

'আপনাদের ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ হয়েছে— বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এরকম বিশিষ্ট ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না। অতি অমায়িক।'

'জ্বি।'

'স্যারের সঙ্গে কফি খেয়েছি। নানান বিষয় নিয়ে আলাপও হয়েছে। ধর্ম বিষয়েও স্যারের জ্ঞান অতি উচ্চ শ্রেণীর।'

'ধর্ম নিয়ে আপনারা আলাপ করলেন ?'

'উনিই আলাপ করলেন, আমি শুধু শুনলাম, আমার জ্ঞানবুদ্ধিও কম, পড়াশোনাও কম।'

'ও আচ্ছা।'

'শৈশবকালে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। পাক কোরান মুখস্থ করেছিলাম।'

'করেছিলাম বলছেন কেন ? এখন মুখস্থ নাই ?'

'জ্বি না। স্মৃতি শক্তির গোলমাল হয়— এক সূরা থেকে আরেক সূরায় চলে যাই— আল্লাহর কাছে গুনাহগার হই। তবে আম্মা এখনো চেষ্টা চালায়ে যাচ্ছি। রোজ এক-দেড় ঘণ্টা পড়ি। আল্লাহ পাকের যদি দয়া হয় ইনশাল্লাহ আবার মুখস্থ হবে। উনার বিশেষ দয়া ছাড়া কোরানে হাফেজ হওয়া সম্ভব না।'

'তাই না-কি ?'

'জ্বি। উনার পাক কালাম— রাম শ্যাম যদু মধু মুখস্থ করে ফেলল, আর হয়ে

গেল তা না। উনার হুকুম লাগবে।'

'উনার হুকুম ছাড়া কিছু হবে না?'

'অবশ্যই না।'

'আচ্ছা ধরুন খুব সুখী একটা পরিবার স্বামী স্ত্রী এবং কন্যা। তারা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছে। হঠাৎ একদিন স্বামীটি সবাইকে ছেড়ে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে চলে গেল। এই ঘটনাটাও কি আল্লাহ্‌র হুকুমেই ঘটল?'

'অবশ্যই মা। অবশ্যই।'

'মানুষকে তো বিচার-বিবেচনার শক্তি দেয়া হয়েছে। ভাল এবং মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না?'

'অবশ্যই করবে, কিন্তু মা শেষ পর্যন্ত সেই কাজই সে করবে যে কাজের হুকুম তাকে করা হয়েছে।'

'ও আচ্ছা। আপনি কি বিয়ে করেছেন?'

'জ্বি না।'

'বিয়ে করেন নি কেন? আপনার তো বয়স ভালই হয়েছে।'

'সংসারধর্ম পালন করার মত অর্থের সংস্থান নাই আম্মা। প্রাইভেট স্কুল, বেতন নামমাত্র। তাও সব মাসে পাওয়া যায় না। এক বাড়িতে জায়গীর থাকি। এতে দুই বেলা খাওয়াটা হয়।'

'বিয়ে করা তো ফরজ, বিয়ে না করে আপনি গুনাহ্ করছেন না?'

'জ্বি না। রসুলে করিমের একটা হাদিস আছে। স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা যাদের নাই তাদেরকে তিনি বিবাহ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।'

'আপনি কি সবকিছু হাদিস কোরান মেনে করেন?'

'জ্বি আম্মা চেষ্টা করি। তবে আমার জ্ঞান সীমিত। সব হাদিস জানিও না।'

'নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন না কেন? নাকি হাদিসে নিষেধ আছে।'

'কোনো নিষেধ নাই। চেষ্টা করতেছি আম্মা।'

'কীভাবে চেষ্টা করছেন? দোয়া করে? প্রতিদিন নামাজ শেষ করে দোয়া করছেন?'

'জ্বি করি। তার উপর লোকজনদেরকেও বলি আমার একটা চাকরির খোঁজ দিতে। ডিরেক্টর সাহেবকেও বলেছি। উনি বলেছেন— দেখবেন।'

'উনি তো আপনাকে ছবির লাইনে একটা কাজ জোগাড় করে দিয়ে দেবেন। নায়িকাদের পোশাকের কনটিনিউইটি ঠিক রাখার কাজ। সেই কাজ আপনি করবেন?'

'আল্লাহপাক যদি নির্ধারণ করে রাখেন আমাকে তো করতেই হবে।'

'আপনি খুব আল্লাহভক্ত মানুষ।'

'জ্বি আম্মা। তবে উনাকে ভক্তির চেয়ে ভয় বেশি করি।'

'দোজখের আগুনে আপনাকে পোড়াবেন সেই ভয়?'

'দোজখে শুধু যে আগুন থাকে তা না— খুব ঠাণ্ডা দোজখও আছে। বড়ই শীতল।'

'সেকী— জানতাম না তো!'

'দোজখের একটা জায়গা আছে নাম হল "জামহারীর"— বড়ই শীতল স্থান। মানুষের কল্পনাতেও আসবে না এমন শীতল। তবে সবচে ভয়ংকর হল— জুব্বুল হুযন।'

'জুব্বুল হুযনটা কী?'

'জুব্বুল হুযনের অর্থ হল আম্মা— বিষাদের ঘাঁটি। এই জায়গাটা জাহান্নাম দোজখের অতি ভয়ংকর স্থান। আমাদের নবী-এ করিম বলেছেন জুব্বুল হুযন প্রধান দোজখ— অতি ভয়ংকর সেই স্থান।'

মওলানা সাহেবের গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে। আতরের গন্ধ সাধারণত তীব্র হয়ে থাকে। গন্ধ নাকে এলেই মৃত মানুষের কথা মনে আসে। মওলানা সাহেবের আতরের গন্ধ সেরকম না। মিষ্টি গন্ধ।

কাশবনের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দু'টা লং শট নেয়া হবে দু'দিক থেকে— সময় লাগল পুরো দু'ঘণ্টা। ডিরেক্টর সাহেব একটা বাড়তি শটও নিলেন— ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ক্যামেরাম্যান কাশবনে শুয়ে পড়লেন। কাশফুলের ভেতর দিয়ে আকাশ ধরা হল। বাতাসে কাশফুল ক্যামেরার লেন্স ঢেকে দিচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এই শটটা ব্যবহার করতে পারব না। তবু নিয়ে রাখলাম। আকাশে শাদা মেঘ থাকলে ভাল হত। শাদা কাশফুল থেকে শাদা মেঘ। White to White.

এতদূর হেঁটে এসে মা'র অবস্থা কাহিল। তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। একটু পরপর পানি খাচ্ছেন। তাঁর চোখের নীচ কালো হয়ে আছে। সাধারণত রাতে ঘুম না হলে চোখের নীচে কালি পড়ে। মা'র চোখের নীচে কালি পড়েছে রোদে হেঁটে। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ঐ মওলানার সঙ্গে কী নিয়ে এত গুজগুজ করছিলি?

'ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করছিলাম মা। দোজখের শ্রেণীবিভাগ শিখছিলাম। গরম দোজখ ঠান্ডা দোজখ এইসব। তোমার তো মনে হচ্ছে অবস্থা কাহিল। ফিরবে কীভাবে?'

'ফিরব কীভাবে মানে? যেভাবে এসেছি সেইভাবে ফিরব।'

'তোমার পা ফুলে গেছে মা। ফোলা পা নিয়ে হাঁটতে পারবে না। তোমাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। কে তোমাকে কোলে নেবে সেইটা হচ্ছে কথা। দেখি তোমার হাতটা। জ্বর এসেছে কি না দেখি।'

'দূরে থাক! খবর্দার আমার গায়ে হাত দিবি না!'

'আমার দৌড় দিয়ে কাশবনে ঢোকার দৃশ্যটা কেমন হয়েছে মা?'

'জানি না কেমন হয়েছে। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না।'

আমি মা'র পাশে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাশবনের দিকে। বাতাসে কাশফুল দুলছে। অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য। ডিরেক্টর সাহেব দূর থেকে হাত ইশারায় ডাকছেন। বুকে ধক করে একটা ঝাঁকুনি লাগল। কাকে তিনি ডাকছেন? আমাকে নাতো? আমার হাত-পা শক্ত হয়ে গেল। মা বললেন, একী কাণ্ড! তুই বসে আছিস কেন? মঈন ভাই তোকে ডাকছেন।

ইচ্ছে করছে ঠিক যে ভাবে দৌড়ে কাশবনে ঢুকেছি সেভাবে ছুটে যাই। আশ্চর্য আমি হাঁটতেও পারছি না। আমি তাঁর কাছে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, খুব টায়ার্ড?

এইসব ক্ষেত্রে বলতে হয়— না, টায়ার্ড না। এই বলে মিষ্টি করে হাসতে হয়। আমি তা করলাম না। আমি বললাম— হ্যাঁ, টায়ার্ড।

'তোমার অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে।'

'দৌড় দিয়ে কাশবনে ঢুকে যাওয়া— এর মধ্যে অভিনয়ের কী আছে?'

'অনেক কিছুই আছে। একজন বড় অভিনেতা কী করেন? ইমপ্রোভাইজেশন করেন। খুব সচেতন ভাবে যে করেন তা না— সাবকনশাসলি করেন। তুমি কাশবনে ঢোকার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলে— তারপর পলকের জন্যে পেছনে ফিরে বনে ঢুকে গেলে। তোমাকে দাঁড়াতেও বলা হয় নি, পেছনে ফিরতেও বলা হয় নি। কাজটা তুমি করলে তোমার মত। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

আমি বিড়বিড় করে কিছু একটা বললাম। থ্যাংক য়্যু জাতীয় কিছু। তবে পরিষ্কার শোনা গেল না।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, তুমি আগেভাগে বল নি কী করবে। আমরাও জানতাম না কী করবে কাজেই আগের শট এন জি হয়ে গেল। নতুন করে ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে হল। আগে ক্যামেরা ফিক্সড ছিল— এখন ক্যামেরা তোমাকে অনুসরণ করেছে। আসল যে কথা সেটা মন দিয়ে শোন— আসল কথা হচ্ছে, তোমার অভিনয় আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'সেলিম ভাইয়ের অভিনয় কেমন হচ্ছে?'

'ওকে যা বলা হচ্ছে সে তা করতে পারছে। যে-কোন ভাল পরিচালক

সেলিমকে দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে পারবেন, এর বেশি কিছু না। তুমি যে-কোনো পরিচালকের সঙ্গে অভিনয় করতে পারবে। সে পারবে না।'

'এক সময় হয়তো শিখে ফেলবেন। তখন পারবেন।'

'না, তাও পারবে না। অভিনয়কলা একটা পর্যায় পর্যন্ত শেখা যায়। মিডিওকার অভিনেতা হবার জন্যে যতটুকু অভিনয় জানতে হয় ততটুকু অভিনয় শেখানো যায়। তার বেশি শেখানো যায় না।'

'আমরা রওনা হব কখন ?'

'এখনই রওনা হব। আমি চা করতে বলেছি— চা-টা হোক, চা খেয়েই রওনা দেব।'

আমি প্রোডাকশানের কাউকে চা বানাতে দেখলাম না। ইউনিটের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট আউটডোর কিচেন যায়। এখানে আসে নি। তবে ডিরেক্টর সাহেব যখন চা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন চা আসবে। আসতেই হবে। আমি মায়ের দিকে তাকালাম— তিনি দূর থেকে একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা জানার জন্যে তিনি কৌতূহলে ছটফট করছেন। মায়ের পাশে মওলানা মেরাজ মাস্টার। তিনিও নিজ মনে কথা বলে যাচ্ছেন। হয়ত দোজখ কত প্রকার ও কী কী তা বোঝাচ্ছেন।

চা চলে এসেছে। সুন্দর দু'টা কাপে চা। টি ব্যাগের সুতা বের হয়ে এসেছে। কিচেন সঙ্গে না এলেও চায়ের সরঞ্জাম এসেছে। গ্রামের কোনো বাড়ি থেকে গরম পানি এনে চা করা হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, বকুল, এখন তোমাকে খুব জরুরি একটা কথা বলব। কী বলব, মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু মন খারাপ করবে না।

'মন খারাপ করার মত কোনো কথা ?'

'না, মন খারাপ করার মত কোনো কথা না। তারপরেও মন খারাপ হতে পারে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?'

'ভয় পাচ্ছি না তো।'

'পাচ্ছ। তোমার হাত কাঁপছে।'

'সরি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! তুমি কি আমাকে ভয় পাও ?'

'জ্বি পাই।'

'কেন ?'

'জানি না কেন।'

'আমি কখনো উঁচু গলায় কাউকে ধমক দিয়েছি বলেও তো মনে পড়ে না।'

'সেই জন্যেই হয়তো ভয় পাই। আপনার উঁচু গলা একবার শুনে ফেললে— ভয় ভেঙ্গে যেত। তা ভাঙ্গেনি।'

' তুমি স্বাভাবিক হও তো! এখনো তোমার হাত কাঁপছে। আমি কখনো তোমাকে এমন কিছু বলব না যে ভয়ে তোমার আত্মা উড়ে যাবে।'

'কী বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।'

'না থাক, বাদ দাও।'

'বাদ দিতে পারবেন না, আপনি বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।'

'তুমি এমন করছ কেন বকুল ? হোয়াট হ্যাপেনড ?'

আমি চোখমুখ শক্ত করে বললাম, আপনি কী বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।

' ব্যাপারটা খুবই সাধারণ— যেহেতু তুমি অভিনয় করছ তোমার জন্যে ব্যাপারটা জানা জরুরি। যারা লম্বা মেয়ে তাদেরই এই সমস্যাটা বেশি হয়, তারা যখন হাঁটে তখন কুঁজো ভাব দেখা যায়। এরা হাঁটে মাটির দিকে তাকিয়ে— দৃষ্টি থাকে পায়ের কাছে। তুমি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁট ক্ষতি নেই, তবে দৃষ্টিটা যদি পা থেকে খুব কম হলেও দশফুট দূরে রাখ তা হলে কুঁজো ভাবটা চলে যাবে। এখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখ। হেঁটে হেঁটে মায়ের কাছে যাও। দু'ভাবে হাঁটবে— পায়ের কাছে চোখ রেখে এবং পা থেকে দশফুট দূরে চোখ রেখে।'

'আমার চা শেষ হয় নি। চা খাওয়া শেষ হোক তারপর যাব।'

'বকুল, তুমি আমার কথায় রাগ কর নি তো ?'

'রাগ করব কেন ?'

'মানুষমাত্রই তার ত্রুটি ধরিয়ে দিলে রাগ করে। পাপিয়াকে তো তুমি কাছ থেকে দেখছ — তার মস্তবড় ত্রুটি কী বল তো ?

'জানি না। মানুষের ত্রুটি দেখে বেড়ানো আমার স্বভাব না।'

'তুমি দেখি ভালই রেগেছ।'

'আপনি ভুল করেছেন। আমি রাগি নি। এই দেখুন আমি এখন হেঁটে হেঁটে দু'ভাবে মা'র কাছে যাব। এবং আর কখনোই আপনি আমার মধ্যে কুঁজো ভাব দেখবেন না।'

'একসেলেন্ট! তা হলে আমি এক কাজ করি— গতদিন তোমার যতগুলি শট নিয়েছিলাম সেগুলি আবার নেই ?'

'নিন। আজকেরটা নেবেন না ?'

' না, আজকেরটা নেব না। আজকের দৃশ্যটি ঠিকই আছে। মাথা নিচু করে

দৌড়াচ্ছিলে, দেখতে ভাল লেগেছে।'

'আমি যাই।'

'তুমি আরো কিছুক্ষণ থাক তারপর যাও। বি নরম্যাল।'

'আমি নরম্যাল আছি।'

'এসো অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি।'

'কোন প্রসঙ্গ?'

'ফরহাদকে নিয়ে যে নাটকটা হল, সেই নাটকটা তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল লাগে নি।'

'নাটকটা যখন শুরু হল তখন কি তার শেষ কী হবে তুমি আঁচ করতে পারছিলে?'

'জ্বি না। তবে বুঝতে পারছিলাম যে ভয়াবহ কিছু হবে না। আপনি তা হতে দেবেন না।'

'আমি হতে দিতাম না তা ঠিক না, আমি হতে দিতাম। আমাদের জীবনে নাটকীয় মুহূর্ততো খুব বেশি তৈরি হয় না। অল্প অল্প হয়। যখনই হয় আমি মজা করে লক্ষ্য করি।

'ও।'

'ব্যাপারটা মনে হয় তোমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমার পছন্দ-অপছন্দেতো কিছু যাচ্ছে আসছে না।'

'তারপরেও আমাদের পছন্দ-অপছন্দ থাকে। কদম ফুল অনেকের পছন্দ, অনেকের পছন্দ না। তারপরেও কিন্তু কদম গাছ থাকে এবং বর্ষায় কদম ফুল ফোটে। কদম ফুল মানুষের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করে না। ঠিক বলেছি?'

'জ্বি বলেছেন।'

'ফরহাদ যখন তার প্যান্টের জিপার খোলার উপক্রম করল তখন তোমার কী মনে হয়েছিল বল।'

'জানাটা কি খুব প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ প্রয়োজন।'

'আমার মনে হচ্ছিল জাহেদার কথাই বোধ হয় ফলে যাচ্ছে। এখানে অভিনয় হবে না। ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এবং একজন মারা যাবে।'

'তার মানে কী? জাহেদা কে?'

'জাহেদার ব্যাপার আপনি জানেন না?'

'না।'

'জাহেদা হচ্ছে হাফিজ আলির স্ত্রী। এই গ্রামের একটা বৌ। তার অসাধারণ

ক্ষমতা। জেন ডিক্সনের মত সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। সে আমাদের সম্পর্কে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছে।'

'কী ভবিষ্যৎবাণী ?'

'এখানে শুটিং শেষ পর্যন্ত হবে না। আমাদের মধ্যেই একজন কেউ মারা যাবে। সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে।'

ডিরেক্টর সাহেব আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। গ্রামের সামান্য একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ বাণীতে তিনি চিন্তিত হবেন কেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, "এখন যাই ?" তিনি হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

আমি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মায়ের কাছে চলে এলাম। মওলানা সাহেব এখন নেই। আছর নামাজের সময় হয়েছে, তিনি হয়তো মসজিদের খোঁজে গেছেন। মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, মঈন ভাই তোর সঙ্গে কী এত কথা বলছিলেন ?

'আমার খুব প্রশংসা করছিলেন মা।'

মা আনন্দিত গলায় বললেন, তাই নাকি ?

'হ্যাঁ, তিনি বললেন— আমি যে কুঁজো হয়ে হাঁটি এটা দেখতে খুব ভাল লাগে।'

মা হতভম্ব হয়ে বললেন, তুই আবার কখন কুঁজো হয়ে হাঁটিস ? কী অদ্ভুত কথা !

'অদ্ভুত হলেও কথা সত্যি।'

'আর কী কথা হল ?'

'আর কোনো কথা হয় নি।'

'বল না! বলতে অসুবিধা কী ?'

'বললাম তো মা, আর কোনো কথা হয় নি। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না উনি আমাকে প্রেমের কথাবার্তা বলছেন— লক্ষ্মীসোনা, চাঁদের কণা, কুটুস কুটুস, পুটুস পুটুস।'

'ছি বকুল! এইসব কী ধরনের কথা!'

'ফাজলামি ধরনের কথা, গুরুত্ব দিও না মা।'

'একবার দেখলাম মঈন ভাই কী একটা কথা বলে খুব হাসছেন। কথাটা কী ?'

'মা শোন, আমার মনে নেই। উনি হেসেছেন কি না তাও মনে নেই। তুমি আমাকে আর বিরক্ত করো না। উনি আমাকে কুঁজো বলেছেন, আমার মন খুবই খারাপ। তুমি অকারণ কথা বলে সেই মন খারাপ ভাবটা আর বাড়িও না।'

'তোকে কুঁজো বলবে কেন ?'

'কুঁজোকে তো কুঁজোই বলবে, অন্ধ বলবে না।'

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। আমরা মনে হচ্ছে এখন রওনা হব। মা'র পাশাপাশি আমি হাঁটতে চাচ্ছি না। মা'র পাশে থাকলেই তিনি ঘুরেফিরে জানতে চাইবেন ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার কী কথা হল।

'বকুল!'

'হুঁ।'

'কোত্থেকে এই মওলানা জুটেছে বল তো! ক্রমাগত আমার কানের কাছে বকবক করছিল। কয়টা দোজখ আছে, দোজখের নাম কী এইসব হাবিজাবি—।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ। জাহান্নাম, হাবিয়া, জাহীম, লাযা .... এইগুলি হচ্ছে দোজখের নাম।'

'ভাল তো, দোজখের সব নাম জেনে গেলে।'

'তুই চোখমুখ এমন শক্ত করে রেখেছিস কেন ?'

'আমার খুবই কান্না পাচ্ছে। কান্না আটকে রেখেছি বলে চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে।'

'কান্না পাচ্ছে কেন ?'

'উনি আমাকে কুঁজো বলবেন, আমার কান্না পাবে না ?'

মা কোমল গলায় বললেন— নদীর পারে চলে যা। লোকজন নেই, কেউ দেখবে না। সেখান থেকে কেঁদে আয়।

আমি নদীর কাছে যাচ্ছি। মাথা সোজা করে যাচ্ছি। সত্যি সত্যি কাঁদার জন্যে যাচ্ছি, কিন্তু আমার চোখে পানি নেই। জানি পানি আসবে না। আয়োজন করে কাঁদা যায় না। নির্জন একটা জায়গায় কাঁদব বলে গেলাম। সঙ্গে রুমাল নিয়ে গেলাম— এই ভাবে কি আর কেউ কাঁদে ?

সোমেশ্বরী নদী— নাম শুনলে মনে হয় বিশাল ব্যাপার, বিশাল নদী। আসলে ছোট্ট ফিতার মত নদী। হেঁটে এক পার থেকে আরেক পারে যাওয়া যায়। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভেজে।

বর্ষায় এই নদী নাকি প্রমত্তা হয়। পাহাড়ি পানি নেমে ভয়াবহ কাণ্ড করে বসে। সোমেশ্বরী নদীর ভয়ে মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। কোনো এক বর্ষায় এসে নদীটা দেখে গেলে হত।

নদীর বুক জুড়ে বিশাল চর। ধবধবে শাদা বালি চকচক করছে। এরকম কোনো নদী দেখেই কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে — বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে ..... ।

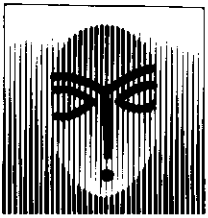

ফরহাদ সাহেব ঢাকা চলে গেছেন। যাবার আগে সবার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। নিজের কাজ কর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন। সেলিম ভাইকে বইয়ের ভাষায়, কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছেন, ছবির ভুবনে তোমার আগমন সুন্দর হোক, শুভ হোক। এখানেই শেষ না, সেলিম ভাইকে পাশে নিয়ে ছবি তুলেছেন। ছবি তোলার সময় বাঁ হাত তুলে দিয়েছেন সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। সেলিম ভাই বেচারার বিব্রত মুখ দেখার মত ছিল।

ইউনিটের গাড়ি তাঁকে ঢাকা পৌঁছে দেবার জন্যে যাচ্ছিল। তিনি তা নিলেন না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এখানে কত কাজ, শুধু শুধু একটা গাড়ি আমি ঢাকা নিয়ে যাব কেন ? বাসে উঠে চলে যাব। জনগণের সঙ্গে মেশাও হবে। মেশা তো হয় না। রাজনৈতিক নেতারা যেমন গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আমরা ছবির জগতের মানুষরাও তেমনি গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এটা ঠিক না। আমি ঠিক করেছি যখনই সুযোগ পাব— জনগণের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করব।

ফরহাদ সাহেব জনগণের সঙ্গে মেশার তেমন সুযোগ পেলেন না। সোহরাব চাচা ভাড়া করা মাইক্রোবাস এনে ফরহাদ সাহেবের কানে কানে কী যেন বললেন। ফরহাদ সাহেব হাসি মুখে মাইক্রোবাসে উঠে বসলেন। জনতার সঙ্গে মিশে যাবার কথা আর তার মনে রইল না। সোহরাব চাচা কী বলেন যে এমন মন্ত্রের মত কাজ করে ? জোঁকের মুখে লবণ পড়ার অবস্থা হয়। আমি সোহরাব চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মা শোন, মানুষও জোঁকের মতই। তাদেরও লবণ আছে। একেক মানুষের জন্যে একেক ধরনের লবণ। ফরহাদ সাহেবের জন্যে যে লবণ সেই লবণ কিন্তু অন্য কোন সাহেবের জন্যে কাজ করবে না।

আমি বললাম, আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে কী লবণ?

সোহ্‌রাব চাচা হাসলেন। আমি বললাম, আপনি জানেন না-কি জানেন না?

'আমি জানি।'

'আমাকে বলবেন?'

'না।'

'ফরহাদ্দ সাহেবের লবণটা কী তা বলবেন?'

'উহুঁ!'

'কোন মানুষের কী লবণ তা বের করা কি আপনার হবি?'

'হবি নারে মা, যে লাইনে কাজ করি এই লাইনে লবণ জানা থাকলে খুব সুবিধা হয়।'

'চাচা বলুনতো আমার লবণটা কী?'

সোহ্‌রাব চাচা হাসলেন। হাসার ভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছে তিনি জানেন। আমি বিস্মিত হলাম। আমারো যে লবণ আছে আমি তা জানতাম না। সোহ্‌রাব চাচা কি আসলেই জানেন?

আমাদের শুটিং আপাতত বন্ধ।

ফিল্মের ভাষায় প্যাক আপ হয়ে গেছে। কখন বা কবে শুরু হবে কেউ বলতে পারছেন না। পাপিয়া ম্যাডাম হুট করে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁর মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পা পিছলে পড়ে দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছে। খবরটা যখন এল তখন তাঁর শট নেয়া হচ্ছে। আমি, পাপিয়া ম্যাডাম এবং মিজান সাহেব। দৃশ্যটা এ রকম— ডাকবাংলোর বাইরে আমরা তিনজন ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছি। দূরে গারো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমার হাতে একটা পিরিচ। পিরিচে আচার। আমি আচার খেতে খেতে জামিল ভাইয়ের কথা শুনছি। আমার হাতে আচার থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। কনটিনিউইটির সমস্যা। কখন মুখে আচার থাকবে, কখন হাতের আঙ্গুলে, লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। জামিল ভাই (মিজান সাহেব) ভূতের গল্প করছেন। মূল চিত্রনাট্যে দৃশ্যটি রাতের। কিন্তু এখন করা হচ্ছে সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় দূরের গারো পাহাড় আবছা হলেও দেখা যায়।

জামিল ভাই হাত-টাত নেড়ে খুব মজা করে গল্প করছেন। আমি চোখ বড় বড় করে শুনছি। গল্পের খুব সিরিয়াস অবস্থায় হঠাৎ নিশাত আপা (পাপিয়া ম্যাডাম) উঠে দাঁড়াবেন এবং কাউকে কিছু না বলে ডাকবাংলোয় চলে যাবেন। জামিল ভাই বিস্মিত হয়ে বলবেন, দিলু ও এমন হুট করে চলে গেল কেন?

আমি বলব, "মনে হয় গল্প শুনে ভয় পেয়েছে। জামিল ভাই আপনি বলতে থাকুন। আমি শুনছি।" জামিল ভাই বললেন, আজ থাক আরেক দিন বলব।

আমি আহ্লাদী গলায় বলব, "না এখন বলতে হবে।" জামিল ভাই মোটামুটি রুক্ষ গলায় বলবেন, "বিরক্ত করো নাতো।" বলেই তিনি উঠে চলে যাবেন।

জামিল ভাইয়ের কঠিন আচরণে আমার চোখে পানি চলে আসবে। দৃশ্যটা শেষ হবে চোখের জলে।

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়ের দাঁত ভাঙ্গার খবরটা দৃশ্যের শুরুতেই এল। পাপিয়া ম্যাডামের চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, দৃশ্যটা শেষ হলে আমি ঢাকায় চলে যাব। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আচ্ছা। টেক শুরু হল। খুব সুন্দর অভিনয় করলেন পাপিয়া ম্যাডাম। মিজান সাহেবের অভিনয় আমার তত ভাল লাগল না। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মিজান তোমার অভিনয় ঠিক জমছে না। কারণটা কী ?

মিজান সাহেব বললেন, আমিতো বুঝতে পারছি না।

'টোন ডাউন করবে ?'

'আপনি বললে করি।'

'তাহলে টোন ডাউন কর। তোমার গল্প শুনে মনে হচ্ছে তুমি ছোট ছোট বাচ্চাদের ভূতের গল্প বলছ— আসলে তোমার টার্গেট শ্রোতা হচ্ছে একজনই, নিশাত। তুমি গল্পটা বলছ দিলুর দিকে তাকিয়ে কিন্তু মন পড়ে আছে নিশাতের কাছে। নিশাতের কাছে গল্পটা কেমন লাগছে এটা নিয়েই তুমি কনসার্নড।'

টেক আবার শুরু হল। মিজান সাহেব আগের মতই অভিনয় করলেন তবে হাত নাড়াটা একটু কমল। সব শেষ করে আমরা রেস্ট হাউজে ফিরলাম সন্ধ্যা পার করে। পাপিয়া ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা রওনা হলেন। কবে ফিরবেন কাউকে কিছু বলে গেলেন না। আমাকে শুধু বললেন, তোমার জন্যে কি ঢাকা থেকে কিছু আনতে হবে ?

আমি বললাম, না।

'গল্পের বই ? গল্পের বই কি আনব ?'

'আনতে পারেন। সবচে ভাল হয় যদি আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন।'

'ওকে আমি শুটিং স্পটে আনি না।'

পাপিয়া ম্যাডামের গাড়ি রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কেন জানি মনে হল জাহেদার কথা ফলে যাবে। দুর্গাপুরে আর কখনো শুটিং হবে না। উনি ফিরে আসবেন না। আমরা দু'চারদিন অপেক্ষা করে ঢাকায় ফিরে যাব।

মা'র শরীর খুবই খারাপ করেছে। নানান ধরনের অসুখ বিসুখ তাঁর হয়। একটা কমলে আরেকটা শুরু হয়। অসুখ ছাড়া অবস্থায় তিনি কখনো থাকেন না। যে সব অসুখ তার সারা বছরই থাকে সেগুলি হচ্ছে—

বুক ধড়ফড়
শ্বাস কষ্ট
আধকপালী মাথা ধরা
মাথা ঘোরা
বমি ভাব
বুক জ্বালা
কাশি
টনসিলের ব্যথা
জ্বর।

আজ তাঁর পুরানো অসুখের কোনটা তাকে ধরে নি— তার পা ফুলে গেছে। তিনি বিছানা থেকে নামতেও পারছেন না। কাশবনের শুটিং দেখতে যাওয়ায় তাকে আট কিলোমিটারের মত হাঁটতে হয়েছে। আমার ধারণা এই হাঁটাই তার কাল হয়েছে। শারীরিক কষ্ট তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অসুখ বিসুখের সময় কাউকে না কাউকে তাঁর পাশে থাকতে হবে। পাশে থাকার এই অংশটা আমার কাছে অসহ্য লাগে। মা অনবরত কথা বলতে থাকেন। সেইসব কথাবার্তার বেশির ভাগই অর্থহীন। দু'তিন মিনিট পর পর তিনি অস্থির হয়ে ডাকবেন—বকু, বকু ও বকু। ভাবটা এ রকম যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে। আমি ছুটে যাব, তিনি বলবেন— মাথার নীচের বালিশটা ঠিক করে দেতো মা। বালিশ ঠিক করার এই কাজটা তিনি নিজেই পারেন— নিজে করবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন।

পাপিয়া ম্যাডাম চলে যাওয়ায় আমার কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আমি জোনাকি পোকার আলো জ্বলা দেখার জন্যে বারান্দায় বসে আছি এবং মজার একটা কাজ করার চেষ্টা করছি—জোনাকি পোকার ঝাঁকে মোট কতগুলি জোনাকি পোকা আছে তা গোনার চেষ্টা করছি। কাজটা যত কঠিন মনে হচ্ছে আসলে তত কঠিন না। ঝাঁকের জোনাকি পোকারা জায়গা বদল করে না। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওড়ে ঠিকই কিন্তু একজনের সঙ্গে অন্যজনের

দূরত্ব ঠিকই রাখে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আলো জ্বলা-নেভা একেক জোনাকির একেক সময়ে হলেও যখন তারা স্থির হয়ে থাকে তখন আলো জ্বলা-নেভার মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলা চলে আসে। সবাই এক সঙ্গে আলো জ্বালে এক সঙ্গে নেভায়।

'বকু বকু বকু।'

আমি বিরক্ত মুখে উঠে গেলাম। জোনাকি গোনা হল না। মা নিতান্ত অকারণে ডাকছেন। তাঁর মহা উদ্বিগ্ন গলার স্বরই বলে দিচ্ছে—অকারণ ডাকাডাকি।

'বকু মা দেখতো আমার পায়ে পানি এসেছে কি-না।'

'পানি আসা বুঝব কী করে?'

'পায়ে আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে চাপ দে। দেখবি গর্ত হয়ে যাবে। আঙ্গুল সরিয়ে দে। গর্ত যদি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পানি আসে নি। আর যদি সময় বেশি নেয় তাহলে পানি এসেছে।'

আমি টিপাটিপি করে বললাম, পানি আসে নি মা। মনে হয় বরফ এসেছে। গর্তই করতে পারছি না।

মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। কন্যার রসিকতা তাঁর ভাল লাগছে না। আমি বললাম, মা যাই আমি জরুরি একটা কাজ করছি।

'জরুরি কাজটা কী?'

'জোনাকি পোকা গুনছি।'

'এইটা তোর জরুরি কাজ?'

'হুঁ।'

'অসুস্থ মায়ের কাছে বসে, ভাল মন্দ দু' একটা কথা বলা জরুরি না?'

'আচ্ছা যাও বসলাম। তুমি ভালমন্দ কথা বল আমি শুনি।'

'পাপিয়া চলে গেছে?'

'হুঁ।'

'যাবার আগে দেখলাম গুজ গুজ করে তোকে কী সব বলছে। কী বলছে?'

'গোপন একটা কথা বলে গেছেন মা। তোমার না জানলেও চলবে।'

'যন্ত্রণা করিস না, কী বলেছে বল।'

'ম্যাডাম বললেন—বকুল ডিয়ার, আমি আমার কৃষ্ণকে তোমার হাতে আপাতত দিয়ে গেলাম। তুমি তাকে দেখে শুনে রাখবে। সঙ্গ দেবে।'

'আমি তোর মা না ? আমার সঙ্গে অশ্লীল কথা বলতে তোর মুখে আটকায় না ?'

'অশ্লীল কথাতো মা কিছু না। তাছাড়া তোমার কাছে অশ্লীল লাগলেও কিছু করার নেই। পাপিয়া ম্যাডাম আমাকে যাই বলেছেন আমি তাই তোমাকে বললাম। তুমি যদি শুনতে না চাইতে তাহলে আর অশ্লীল কথাগুলি তোমাকে শুনতে হত না।'

'পাপিয়া এ রকম কোন কথাই বলে নি। সে জিজ্ঞেস করছিল— তোর জন্যে গল্পের বই আনবে কি-না।'

'তাহলেতো তুমি জানই কী জিজ্ঞেস করেছিল— তারপরে জানতে চাচ্ছ কেন ?'

'খুব দোষ করেছি। এখন কী করতে হবে ? পা ধরতে হবে ?'

মা রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেললেন। কাজেই হাসি মুখে আমি বসলাম তাঁর পাশে। এখন মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। আদুরে ভঙ্গি করা যায়। তাঁর গায়ে-মুখে নাক ঘষা যায়। আমি আদুরে গলায় বললাম, কেমন আছ মা ?

'যা ঢং করিস না।'

'ও আল্লা তোমার সঙ্গে ঢং করব নাতো কার সঙ্গে ঢং করব ? সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে ?'

'আবার ফাজলামি ? ঐ বাঁদরটার নামও মুখে আনবি না।'

'আচ্ছা যাও মুখে আনব না। পা ব্যথা করছে ? টিপে দেব ?'

'বললাম না ঢং করবি না।'

মা'র রাগ পড়ে গেছে। তার মন ভর্তি হাসি। সেই হাসি এখনো মুখ পর্যন্ত আসে নি— তবে এসে যাবে।

'বকু!'

'কি-কু ?'

'উফ আবার ঢং। এত ঢং তোকে কে শিখিয়েছে ?'

'বেশির ভাগই নিজে নিজে শিখেছি। কিছু শিখেছি পাপিয়া ম্যাডামের কাছ থেকে।'

'কী রকম বদ মেয়ে দেখলি ?'

'পাপিয়া ম্যাডামের কথা বলছ ?'

'আর কার কথা বলব ? সামান্য চক্ষুলজ্জাও মেয়েটার নেই। মানুষের চোখে সাত পর্দা লজ্জা থাকে। তার এক পর্দাও নেই। তার মেয়ের কী না কী হয়েছে সব ফেলে-ফুলে ছুটে চলে গেছে।'

'নিজের মেয়ের বিপদে ছুটে যাবে না ? তুমি ছুটে যেতে না ?'

'এতদিন পর নিজের মেয়ে বলছে কেন ? শুরুতে পত্রিকায় কত ইন্টারভ্যু এ আমার মেয়ে না। পালক কন্যা। তখন সে ভয়ে অস্থির লোকজন যদি জানে মেয়ে হয়ে গেছে তখন নায়িকার ইমেজ নষ্ট হবে। লোকজন সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখবে না।'

'এই মেয়ে তাঁর নিজের না তিনি পত্রিকায় এমন ইন্টারভ্যু দিয়েছিলেন ?'

'অবশ্যই দিয়েছে। আমি নিজে পড়েছি। বুঝলি বকু ফিল্ম লাইন বড়ই জটিল লাইন।'

'তুমি এই জটিল লাইনে তোমার মেয়েকে ঢুকাচ্ছ কেন ? এখনো কিন্তু সময় আছে।'

'কী সময় আছে ?'

'তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও। ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দাও। চাকুরিজীবি স্বামী। দশটা পাঁচটা অফিস করবে। ভেড়ুয়া টাইপ। মাঝে মধ্যে লোভে পড়ে বন্ধুর সঙ্গে তাশ-টাশ খেলতে যাবে। তখন আমি খুব বকা ঝকা করব। ঈদের বোনাস যেদিন পাবে তার পরদিনই তাকে নিয়ে ঈদের শাড়ি কিনতে যাব। কেনা কাটা শেষ হবার পর কোন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে দু'জন মিলে এক বাটি থাই স্যুপ খাব। ফুল কোর্স খাবার মত পয়সাতো আমাদের থাকবে না কাজেই শুধু স্যুপ।'

'তুই ভ্যার ভ্যার করে এইসব কী বলছিস ?'

'কেন তোমার কি শুনতে ভাল লাগছে না ?'

'অসহ্য লাগছে।'

'কফি খাবে মা ?'

'এখন কফি কোথায় পাবি ?'

'ইউনিটকে বলব কফি দিতে। এক নম্বর নায়িকার অনুপস্থিতিতে আমিইতো এক নম্বর। খাবে কফি ?'

'তুই কফির কথা বলবি তারপর ওরা দেবে না সেটাতো খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি কফি নিয়ে আসছি। তারপর আমরা মা-মেয়ে দু'জন কফির কাপ হাতে পরচর্চা করব। পাপিয়া ম্যাডামকেতো ধরা হয়েছে, কফি খেতে খেতে আমরা ডিরেক্টর সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করব। উনাকে তুলোধুনা করে ছাড়ব।'

'বকুল, ফাজলামি ধরনের কথা তুই একদম বলবি না।'

আচ্ছা যাও বলব না, তুমি ঝিম ধরে পড়ে থাক, আমি কফি নিয়ে আসছি।'

'চিনি কম দিতে বলবি, গাদাখানিক চিনি যেন না দেয়।'

আমি মা'র ঘর থেকে বের হয়ে আবার কিছুক্ষণ জোনাকি গোনার চেষ্টা করলাম। গোনা যাচ্ছে না— যতবার গুনতে শুরু করি ততবারই ওরা গাছের আড়ালে চলে যায়। এরা কি কোনভাবে বুঝতে পারছে আমি এদের গুনতে চেষ্টা করছি ? টেলিপ্যাথিক কোন যোগাযোগ ? কফির কথা বলার জন্যে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি সোহরাব চাচার সঙ্গে দেখা। তিনি মন খারাপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই হাত ইশারা করলেন। আমি হাসি মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচা মন খারাপ কেন ?

'মন খারাপ না, ব্যথা উঠেছে।'

'ব্যথা উঠেছে মানে ! কিসের ব্যথা উঠেছে ?'

'আমার একটা কলিক ব্যথা আছে— ডান পেটে হয়। মাঝে মধ্যে হয়।'

'আলসার নাকি ?'

'না— আলসার না, ডাক্তার দেখিয়েছি— তারা আলসার না এটাই শুধু বলে আর কিছু বলে না। তুমি রান্নাঘরে ঘুর ঘুর করছ কেন ?'

'কফির সন্ধানে এসেছি চাচা— কফি কি পাওয়া যাবে ?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। কেন পাওয়া যাবে না !'

'তিন কাপ কফি লাগবে।'

'তিনজন কে ?'

'মা'র জন্যে এক কাপ, আমার জন্যে এক কাপ এবং আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে এক কাপ।'

'স্যার কি কফি চেয়েছেন ? তিনি তো এই সময় কফি খান না।'

'না উনি কফি চান নি— তবু আমি ভাবছি এক কাপ কফি তাঁর কাছে নিয়ে বলব, আপনার জন্যে কফি এনেছি।'

'কেন ?'

'উনি আমার খুব প্রশংসা করেছেন। আমার প্রশংসা মানে আমার অভিনয়ের প্রশংসা। যখন প্রশংসা করছিলেন— তখন লজ্জায় কথা বলতে পারি নি। এখন লজ্জা একটু কমেছে। এখন ঠিক করেছি— কফির কাপটা উনার হাতে দিয়ে বলব —'থ্যাংক য়্যু।'

'তার কোন দরকার নেই। স্যারের সঙ্গে আমার যখন দেখা হবে তখন আমি বলে দেব।'

'কী বলে দেবেন ?'

'বলব যে মিস রুমালী আপনার প্রশংসায় খুব খুশি হয়েছে ?'

'আমি কতটা খুশি হয়েছি সেটাতো আপনি বলতে পারবেন না। কাজেই কফির কাপ নিয়ে আমাকেই যেতে হবে। তবে আপনি যদি মনে করেন উনার কাছে একা একা যাওয়া বিপদজনক তাহলে ভিন্ন কথা।'

'বিপদজনক হবে কেন ?'

'আমারওতো সেটাই কথা, তবে উনার কাছে কফি নিয়ে যাচ্ছি শুনে আপনি যে ভাবে চমকে উঠলেন সেখান থেকে ধারণা হল— হয়ত উনার কাছে যাওয়া বিপদজনক। উনি হয়তোবা ঘাতক ট্রাক। আমার মত মেয়েদের একশ' হাত দূরে থাকা দরকার।'

সোহরাব চাচা শুকনো মুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। কফি বানানো হোক তুমি নিয়ে যাবে।

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমার মা'র শরীরের অবস্থা কী ?'

'অবস্থা বেশি ভাল না, মানুষের আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়, মা'র পা ফুলে বটগাছ হয়ে গেছে।'

'যাও মা'র কাছে গিয়ে বোস। কফি তৈরি হলে তোমাকে খবর দেব।'

'আমি মা'র কাছে বসব না। উঠানে হাঁটা হাঁটি করব। আপনি মা'র কফি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

আমি উঠোনে নেমে এলাম। জোনাকি পোকার ঝাঁকের দিকে এগুচ্ছি। হাতে একটা টর্চ লাইট থাকলে হত। ওদের গায়ে আলো ফেলে দেখতাম ওরা কী করে। সব অন্ধকারের পোকাই আলোকে ভয় করে। ওরা কী করবে— আলো নিয়ে যাদের চলা ফেরা তারা আলোকে ভয় করবে কেন ?

ডিরেক্টর সাহেবের ঘরের দরজা খোলা। আমি দু'কাপ কফি হাতে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ আগে খুব ছেলেমানুষী একটা কাজ করেছি—"আই লাভ ইউ" "আই লাভ ইউ" বলে উনার কফির কাপে ফু দিয়ে দিয়েছি। ভাবটা এ রকম যেন এই কফি খেলেই উনি বুঝতে পারবেন রুমালী নামের একটা মেয়ে তাঁর জন্যে অস্থির হয়ে আছে। ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না,

আবার চলেও যেতে পারছি না হাতের কফি ঠান্ডা হচ্ছে। ঠান্ডা কফিতে চুমুক দিলে তাঁর নিশ্চয়ই মেজাজ খারাপ হবে। আমি তাঁর মেজাজ খারাপ করতে চাই না। ঘরের ভেতর গান হচ্ছে— ইংরেজি গান। সুরটা সুন্দর, কথাগুলি পরিষ্কার। এই গানটা তাঁর ঘরে আগেও বাজতে শুনেছি। নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় গান। গানটা গলায় তুলে নিতে পারলে ভাল হয়। তাঁর আশে পাশে যখন থাকব তখন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দু'লাইন গেয়ে ফেলব। তিনি চমকে বলবেন—আরে তুমি এই গান কোথায় শিখলে ? আমি জবাব দেব না, মুখ টিপে হাসব। হাসার সময় আমার থুতনিটা ভেতরের দিকে রাখব। কারণ ক্যামেরাম্যান বলেছেন আমাকে সবচে সুন্দর দেখা যায় যখন আমার থুতনি ভেতরের দিকে থাকে। মুশকিল হচ্ছে ইংরেজি গানগুলি সহজে গলায় বসতে চায় না। মনে হয় গানগুলিরও নিজস্ব জীবন আছে। এরাও গাছের মত। এক মাটির গাছ অন্য মাটিতে বাঁচে না। এক দেশের গান অন্য দেশের মেয়ের গলায় বসে না। আমি কান পেতে আছি— গানের কথাগুলি ধরতে পেরেও পারছি না।

Down the way
Where the nights are gay
And Sun Shines daily on the mountain top.
I took a trip
On a sailing ship
And When I reached Jamaica I made a stop.
But I am sad to say
I am on my way
won't be back for many a day

আমি দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি চেয়ারে বসে। তাঁর হাতে কী একটা বই। মনে হচ্ছে বইটা খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। মাথা বই-এ ঝুঁকে আছে। তিনি মাথা তুলে আমাকে দেখে বললেন—"এই যে বকুল। এসো।" যেন তিনি জানতেন আমি কফি নিয়ে আসছি। কফির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি জানি তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার হাত থেকে কফির কাপ নেবেন। ঠান্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির স্বরে বললেন— Excellent কফি। মানুষটা সব সময় স্বাভাবিক, এইটাই তাঁর বিশেষত্ব। কিংবা কে জানে এটা হয়ত কোন বিশেষত্ব না। আমি মানুষটার উপর বিশেষত্ব আরোপ করতে চাইছি বলে এরকম ভাবছি।

তিনি হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে বললেন, দেখেই মনে হচ্ছে কফিটা চমৎকার। তিনি আগ্রহের সঙ্গে চুমুক দিলেন এবং তৃপ্তির স্বরে বললেন, Excellent. তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কফির কাপে চুমুক দিলাম। মোটেই Excellent কিছু না। ঠান্ডা তিতকুটে একটা বস্তু।

'বকুল তোমার খবর কী?'

'জ্বী, খবর ভাল।'

তিনি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করতে করতে বললেন, আমার মেজাজ যে কী রকম খারাপ সেটা কি বোঝা যাচ্ছে?

'জ্বি না।'

'খুবই খারাপ। শুটিং পুরোপুরি বন্ধ করে বসে আছি। আবার কবে শুরু হবে সেটাও বুঝতে পারছি না। ফরহাদ আমাকে একটা চিঠি লিখে গেছে— সেই চিঠি পড়লে যে-কোন স্বাভাবিক মানুষের ব্রেইন ডিফেক্ট হবার কথা....।'

'আপনার হচ্ছে না?'

'মানুষ হিসেবে আমি বোধ হয় খুব স্বাভাবিক না। ফরহাদের চিঠি একবার পড়েছি—পড়ে ফাইলে রেখে দিয়েছি।'

আমার চিঠিটা খুব পড়তে ইচ্ছা করছে। পড়তে চাইলেই তিনি আমাকে পড়তে দেবেন কি-না তা বুঝতে পারছি না। মানুষটাকে আমি এখনো তত ভাল ভাবে জানি না। আমি কেন তাঁর ঘরে এসেছি তিনি কি তা জানেন? আমার অস্থিরতা কি তিনি বুঝতে পারছেন? তাঁকে কিছুই জানতে দেয়া যাবে না। কাজেই আমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে অতি দ্রুত কোন একটা অজুহাত বের করতে হবে। তাঁর ঘরে আসার পেছনে বিশ্বাসযোগ্য কোন অজুহাত। কিচ্ছু মাথায় আসছে না। সবচে বড় সমস্যা হবে তিনি নিজে থেকে যদি জিজ্ঞেস করে ফেলেন—"বকুল আমার কাছে কেন এসেছ?" এটা জিজ্ঞেস করা মানেই হল তাঁর মনে খটকা লেগেছে। আর তখন যদি আমি কোন জবাব দিতে না পারি তখন সেই খটকা আরো বাড়বে।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'আমার কাছে কি কোন কাজে এসেছ না এম্নি গল্প করতে এসেছ?'

আমি মাথা নিচু করে বললাম, আমাকে মা পাঠিয়েছে।

'ও আচ্ছা।'

'মা'র ধারণা কফি নিয়ে আপনার কাছে যদি আসি আপনি খুব খুশি হবেন। আপনি খুশি হলে আমার জন্যে খুব সুবিধা হবে। আপনার পরের ছবিতেও হয়ত আমি সুযোগ পাব। সুযোগ সুবিধার ব্যাপারগুলি মা খুব ভাল বোঝেন।'

তিনি হাসছেন। যাক, আমার কথাটা তাহলে তার বিশ্বাস হয়েছে। অবশ্যি আমি যা বলার বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই বলেছি।

'মা'কে কি তুমি অপছন্দ কর ?'

'না উনাকে খুবই পছন্দ করি। উনার কিছু কিছু বোকামি আমার কাছে অসহ্য লাগে।'

'কিছু কিছু বোকামিতো সবার মধ্যেই থাকবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুদ্ধিমান বলে কিছু নেই। সব বুদ্ধিতেই খাদ মেশানো থাকে। কারও হচ্ছে আঠারো ক্যারেট বুদ্ধি, কারো বাইশ ক্যারেট।'

'আমি যে বসে আছি আপনার কি বিরক্তি লাগছে ?'

'না বিরক্তি লাগবে কেন ?'

'লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। মা বলে দিয়েছে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে।'

'গল্প কর শুনি।'

'আমি গল্প করতে পারি না। আপনি গল্প করুন আমি শুনি। আপনার গল্প করতে ইচ্ছা না করলে গল্প করতে হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন, বই পড়ুন। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যাব—মা'কে গিয়ে বলব, মা অনেক গল্প করেছি, উনাকে গানও শুনিয়েছি। গান শুনে উনি খুব খুশি হয়েছেন।'

'তুমি গান জান ?'

'জ্বি, জানি।'

'তাহলে শোনাও একটা গান।'

'জ্বি না, আমি গান শুনাব না। আমি মোটামুটি ধরনের গান জানি। যে আমার গান শোনে সে খুশিও হয় না আবার বিরক্তও হয় না। কাজেই আমার শুনাতে ইচ্ছা করে না।

'ও আচ্ছা তাহলে থাক।'

তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আমি আমার মিথ্যা বলার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। একবার মিথ্যা বলা শুরু করলে সত্যি বলা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার বেলায় তাই হচ্ছে— আমি একের পর এক মিথ্যা বলে

যাচ্ছি। আমার গান প্রসঙ্গে আমি যা বললাম তা পুরোপুরি মিথ্যা। গান আমি ভাল জানি— শুধু ভাল না, খুব ভাল। আমি জানি আমার গান শুনলেই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। গানকে আমি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাই না।

'বকুল!'

'জ্বি।'

'চুপ করে আছ কেন ? কথা বল।'

'কথা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'পাপিয়া, পাপিয়ার সঙ্গে তোমার কেমন পরিচয় ?'

'মোটামুটি পরিচয়। উনি আমাকে পছন্দ করেন কি-না আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তুমি পছন্দ কর ?'

'না।'

'তুমি পছন্দ কর না কেন ?'

'আমি জানি না। হিংসার কারণে হতে পারে।'

'তাকে হিংসা কর ?'

'হুঁ।'

'কেন ?'

'তিনি এত সুন্দর এই জন্যেই বোধ হয়। তাকে দেখলে আমার মোমবাতির কথা মনে হয়।'

'মোমবাতি কেন ?'

'মোমবাতির মত ধবধবে সাদা শরীর। মুখটা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেন মোমবাতির শিখা।'

'মোমবাতির শিখা যত জ্বলে মোমবাতি ততই কিন্তু ক্ষয়ে যেতে থাকে সেটা জান ?'

'জানি। কিন্তু মানুষতো আসলে মোমবাতি না, সেই কারণে মানুষ ক্ষয় হয় না।'

'ভাল বলেছতো!'

'আপনি উনাকে খুব পছন্দ করেন ?'

'হুঁ।'

'কেন, সুন্দর বলে ?'

'সে যত-না সুন্দর, তার মন কিন্তু তারচেয়ে অনেক সুন্দর। যেমন ধর তার মেয়েটা ব্যথা পেয়েছে এই খবর শুনেই সে ছুটে চলে গেছে। মেয়েটা কিন্তু তার নিজের না।'

'নিজের না ?'

'না নিজের না, সে রফিক নামের একটা ছেলেকে বিয়ে করল। রফিক তখন মেরীল্যান্ডের একটা কোম্পানীতে কাজ করে। ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিল। একটা পার্টিতে পরিচয়। পরিচয় থেকে অতি দ্রুত বিয়ে। বিয়ের পর জানা গেল রফিক আমেরিকায় একটা ব্ল্যাক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাদের একটি বাচ্চাও আছে। সেই বিয়ে টেকে নি। ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটিকে মা নেয় নি। বাবাও নিচ্ছে না। মেয়েটি দারুণ কষ্টে তার গ্রান্ডমা'র সংসারে আছে। মেয়েটিকে পাপিয়া নিজের কাছে নিয়ে এল। রফিকের সঙ্গেও তার বিয়ে টিকল না। রফিক তৃতীয় আরেকজনকে বিয়ে করল। রফিকের মেয়েটি রয়ে গেল পাপিয়ার কাছে। কী আদর যে পাপিয়া মেয়েটিকে করে তা তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।'

'আর রফিক সাহেবের কাজ কি শুধু বিয়ে করে বেড়ানো ?'

'ব্যাপারটা মোটামুটি সে রকমই দাঁড়াচ্ছে।'

'উনি কি খুব হ্যান্ডসাম—তাঁকে দেখামাত্রই কি মেয়েদের মাথা আউলা হয়ে যায় ?'

'রফিক মোটেই হ্যান্ডসাম না। কাঠখোট্টা ধরনের চেহারা তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে মেয়েদের মনে একটা ঘোর অবশ্যই তৈরি হয়।'

'কেন ?'

'আমি জানি না কেন ? মেয়েরা বলতে পারে।'

'আপনার জানতে ইচ্ছা করে না!'

'না আমার জানতে ইচ্ছে করে না।'

'আমি এখন উঠি ?'

'আচ্ছা যাও। আশা করি তোমার মা মোটামুটি খুশিই হবেন যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই বললাম, আমি আপনার সঙ্গে সামান্য মিথ্যা কথা বলেছি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী মিথ্যা কথা ?

'মা আমাকে আপনার কাছে পাঠান নি। আমি নিজেই এসেছি। আমার খুব একা একা লাগছিল— মন খারাপ লাগছিল। আমার মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে কথা বললে মন খারাপ ভাব কমবে।'

'কমেছে ?'

'জ্বি না, কমে নি।'

'তাহলে বস আরো কিছুক্ষণ।'

'না।'

আমি উঠে চলে এলাম। দরজার ওপাশে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার ধারণা ছিল আমার কাণ্ডকারখানায় উনি মোটামুটি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। দেখা গেল আমার ধারণা ঠিক না। আমি ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে তাঁর ঘরের ক্যাসেট প্লেয়ার চলতে শুরু করল। দরজার ভেতর দিয়ে এক পলকের জন্যে তাকালাম— তিনি গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। কী এমন বই ? উনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন বইটার নাম আমি পড়েছি—বইটার নামা 'Sula', লেখকের (না-কি লেখিকার ?) নাম টনি মরিসন। বইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললে আমার ভাল লাগত। একটা কাজ করলে কেমন হয় ? আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি— উনি এক সময় কিছুক্ষণের জন্যে বই রেখে বাথরুমে যাবেন বা অন্য কোথাও যাবেন এই ফাঁকে আমি বই ছিঁড়ে কুচি কুচি করে চলে আসব। উনি ফিরে এসে হতভম্ব গলায় বলবেন—'একী ?' আমার পক্ষে তা করা সম্ভব না। আমরা এমন জগতে বাস করি যে জগতে যে কাজটা খুব করতে ইচ্ছে করে সেই কাজটা কখনো করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্র বীথিতে এমন কোন গ্রহ কি আছে যে গ্রহের মানুষরা যা করতে চায় তাই করতে পারে ?

আমি আবার উঠোনে চলে গেলাম। জোনাকি গোনা যাক। মা'র কী অবস্থা কে জানে ? তিনি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমার অতি আদরের ঝিনুক মা। যিনি তার ডানা খুলে রেখেছেন— আমি সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে যাব। ডালা যাবে বন্ধ হয়ে। আমি পরম নিশ্চিন্তে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ব। জগতের কোন সমস্যাই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আশ্চর্য একটাও জোনাকি পোকা নেই। বৃষ্টি হয় নি কিন্তু মাটির ভেতর থেকে ভেজা গন্ধ আসছে। এই গন্ধে শরীর ঝিম ঝিম করে।

ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। একা একা হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না, আবার অন্য কারো সঙ্গে ঘুরতেও ইচ্ছা করছে না। এই অবস্থাটাকে কী বলে ? একা থাকতে ইচ্ছা করে না, আবার দোকা থাকতেও ইচ্ছা করে না। আমি মনে মনে গুনগুন করছি—

Down the way
Where the nights are gay....

সুরটা সুন্দর, একবার শুরু করলে মাথায় চলতে থাকে—

I took a trip
on a sailing ship.

নিজের গান শুনে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছি। নিজেকেই বলতে ইচ্ছা করছে— এই মেয়ে তোমার গলা এত মিষ্টি কেন ? খবর্দার মুখ হা করে কখনো ঘুমুবে না। মুখ হা করে ঘুমুলে মুখের ভেতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে তোমার গলা খেয়ে ফেলবে।

কেউ একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পারছি না, কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে উনি সেলিম ভাই। সেলিম ভাইয়ের সাহস ভালই বেড়েছে। একটা মেয়ে একা একা হাঁটছে তিনি কেমন তার কাছে চলে আসছেন। এই ভাবে ঘন ঘন আসতে থাকলে উনি বিরাট সমস্যায় পড়ে যাবেন। আরো ভাল ভাবে বললে বলতে হয়, যে সমস্যায় পড়েছেন তা আরো বাড়বে। দেখা যাবে সোমেশ্বরী নদীতে তিনিই ঝাঁপ দিলেন।

'বকুল কেমন আছ ?'

'ভাল।'

'এখানে হাঁটাহাটি করা ঠিক না ঘরে এসো।'

'হাঁটাহাটি করা ঠিক না কেন ? ভুত আছে ?'

'ভুত না, সাপ আছে। পাহাড়ি জায়গায় সাপ খুব ভয়ংকর হয়।'

'ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আপনি কেমন আছেন সেলিম ভাই ?'

'ভাল।'

'আপনার অভিনয়তো শুনেছি খুব সুন্দর হচ্ছে।'

'সুন্দর-টুন্দর কিছু না। স্যার যা করতে বলছেন— করছি।'

'যা করতে বলছেন তা করতে পারছেন এটাই হল অভিনয়।'

'আমার কারণে ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে স্যারের এমন ঝামেলা হল এই জন্যও খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিচ্ছু নেই। গন্ডগোল হবার কথা ছিল হয়েছে। সবই কপালের লিখন। কপালের লেখা বদলানো যায় না। মওলানা সাহেব বলেছেন। মওলানা মন্তাজ মাস্টার।'

'তার সঙ্গে তোমার মনে হয় খুব খাতির ?'

'আমার সঙ্গে সবারই খুব খাতির। মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার খাতিরটা খুব কাজে লাগছে।'

'কী রকম ?'

'ধর্মের অনেক ব্যাপার তাঁর কাছ থেকে শিখছি— যেমন ধরুন আমরা যখন বেহেশতে যাব তখন আমাদের বয়স কত থাকবে বলুনতো।'

'যে যে বয়সে মারা গেছে সেই বয়স।'

'আপনি যে কী বলেন—যে মহিলা নব্বুই বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি বুঝি বেহেশতে থুড়থুড়ি বুড়ি হয়ে লাঠি হাতে ঘুরবেন ? বেহেশতে সব মেয়ের বয়স হবে ষোল। আমার এখন যে বয়স তারচে এক বছর কম।'

'তোমার বয়স সতেরো ?'

'আশ্চর্য আপনারতো খুব বুদ্ধি। চট করে আমার বয়স বের করে ফেললেন। আচ্ছা এখন বলুন দেখি বেহেশতে সব মেয়েদের বয়স যদি ষোল হয় তাহলে ছেলেদের বয়স কত হবে ?'

'পঁচিশ।'

'কিছুই হয় নি। ছেলেদের বয়স হবে চল্লিশ।'

'মওলানা সাহেব তোমাকে বলেছেন ?'

'হ্যাঁ তার কথা কী আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'বিশ্বাস হবে না কেন ? উনি তো আর না জেনে বলছেন না। জেনেশুনেই বলছেন।'

'আচ্ছা সেলিম ভাই ইংরেজি গান আপনার কেমন লাগে।'

'ইংরেজি গানতো বেশি শুনি না।'

'বেশি শোনেন না ?'

'বেশি মানে কী— একেবারেই শুনি না।'

'হিন্দি পছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ করি। হিন্দিতে সুন্দর সুন্দর গান আছে।'

'সব ভাষাতেই সুন্দর সুন্দর গান আছে। আচ্ছা শুনুন আমি এখন আপনাকে একটা ইংরেজি গান শুনাব আপনি শুনে বলবেন, কেমন লাগল।'

'তুমি ইংরেজি গান জান ?'

'শুনলেই বুঝবেন জানি কি-না। গানের কথাগুলি আগে শুনে নিন তাহলে বেশি ভাল লাগবে—ব্যাপারটা হচ্ছে কী একজন যুবক। না না যুবক না— মধ্যবয়স্ক মানুষ ধরুন চল্লিশ বছর বয়স। সে জাহাজে করে দূর দেশে রওনা

হয়েছে। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছে নিজের ছোট্ট শহরে—সে তার খুব আদরের একজনকে ফেলে এসেছে Kingstone শহরে—

I left a little girl in Kingstone town.

আমি গাইতে শুরু করেছি। জায়গাটা অন্ধকার। আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে বলে নক্ষত্রের আলোও নেই। সেলিম ভাইয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। সম্ভাবনা খুব বেশি যে তিনি তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আজকের রাতের এই ঘটনা স্থান দেবেন। আর দেয়াইতো উচিত। অন্ধকার রাত। তাঁর পাশাপাশি সতেরো বছরের একজন তরুণী হাঁটছে। তরুণীর চুলের গন্ধ এসে লাগছে তার নাকে। তরুণী গান করছে কিন্নর কণ্ঠে।

আমি গান শেষ করলাম। সেলিম ভাই গান প্রসঙ্গে কোন কথা না বলে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ঘরে চল, ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে।

আমি বললাম, পড়ুক। আপনি বরং ঘরে চলে যান। আমি একা একা বৃষ্টিতে ভিজব।

সেলিম ভাই আগের চেয়েও ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তুমি কি এই গানটা আরেকবার গাইবে ?

আমি বললাম, না।

বৃষ্টি বেশ ভালই নেমেছে। কিছুক্ষণ থাকলে ভিজে চুপসে যেতে হবে। মা খুব রাগ করবেন। আমি ঘরের দিকে রওনা হলাম। সেলিম ভাই কিন্তু উঠোনেই রইলেন। কে জানে তিনি হয়ত একা একা বৃষ্টিতে ভিজে দেখবেন ব্যাপারটা কী ?

মা'কে একগাদা কৈফিয়ত দিতে হবে। কী বলব ঠিক করা আছে। যা বলব সব সত্যি বলব। কিন্তু সেই সত্যের মাঝখানে ধুলির কণার মত একদানা মিথ্যা থাকবে। সত্য দিয়ে সেই মিথ্যা ঢাকা ব'লে— মিথ্যাটা কারোর চোখ পড়বে না। মা জানতে চাইবেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

আমি বলব, সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে ?

'তার সঙ্গে কী ?'

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলব, আমি তাঁকে গান শুনাচ্ছিলাম মা। উনি খুব গান পাগল মানুষ। উনিতো আগেই খানিকটা পাগল ছিলেন, গান শুনিয়ে আমি তাঁকে আরো পাগল করে দিয়েছি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ—একা একা বৃষ্টিতে ভিজছে।

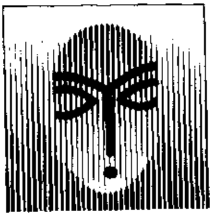

পাহাড়ি অঞ্চলের বৃষ্টি না-কি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। "এই ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি— এই নেই—" পাহাড়ি বৃষ্টির এটাই না-কি ধরন। অথচ কাল সারারাতই বৃষ্টি হয়েছে। যতবার ঘুম ভেঙ্গেছে ততবারই শুনেছি বৃষ্টির শব্দ। পাকা দালানে বৃষ্টি বোঝা যায় না। এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও হচ্ছে। পায়ের কাছের জানালা খোলা। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ছোটখাট ঝড়ের মত হচ্ছে। গাছের পাতায় সোঁ সোঁ গর্জন। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার, ইলেকট্রিসিটি নেই। টেবিলের ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। বাতাসের যে মাতামাতি, মোমবাতি জ্বলবে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুত চমকানোয় ঘরের ভেতরটা আলো হয়ে উঠছে। বিদ্যুৎ চমকানো শেষ হওয়া মাত্র অন্ধকার আরো বেড়ে যাচ্ছে। বাজ পড়ছে প্রচন্ড শব্দে। মনে হচ্ছে বাজগুলি মাথার উপর পড়ার উপক্রম করছে। এই পৃথিবীতে তিনটি জিনিস আমি প্রচন্ড ভয় পাই। শুঁয়োপোকা, মাকড়সা এবং বজ্রপাতের শব্দ। শুঁয়োপোকা এবং মাকড়সার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কাউকে বললেই ঝাঁটা এনে মেরে দূর করে দেবে, কিন্তু বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। ছোটবেলায় দু'হাতে শক্ত করে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে থাকতাম এবং একটু পর পর জিজ্ঞেস করতাম—"বাজ পড়া শেষ হয়েছে ?" ভয়ে কাতর হওয়া একটা বালিকার প্রশ্ন, কিন্তু বাবা এই প্রশ্ন শুনে খুবই মজা পেতেন। হাসি মুখে বলতেন, আমি কি করে বুঝব বাজ পড়া বন্ধ হয়েছে কি-না ? বাজগুলি কি আমার কারখানায় তৈরি হচ্ছে ?

আজো আমি ভয়ে অস্থির। শরীর গোল করে শুয়ে আছি। দু'হাতে কান ঢেকে আছি। তাতে কোন লাভ হচ্ছে না। মা'কে জড়িয়ে ধরে থাকলে লাভ

হত। সেটা করা যাচ্ছে না কারণ আমি অন্য বিছানায় শুয়েছি। ইচ্ছা করে শুই নি— মা সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি কঠিন গলায় বলেছেন, তুই আমার সঙ্গে শুবি না। ঐ খাটে যা। আমি কথা বাড়াইনি। পাশের খাটে শুয়েছি। তখন যদি জানতাম শেষ রাতে এমন ঝড় বৃষ্টি হবে তাহলে মা'কে রাজি করিয়ে তাঁর সঙ্গেই ঘুমুতাম।

'বকু বকু!'

আমি দু'হাতে কান চেপে রাখলেও মা'র গলা শুনলাম। একবার ভাবলাম জবাব দেব না, তারপরেও বললাম, কী?

'আয় আমার কাছে চলে আয়।'

'না।'

'বকু কথা শোন আয়।'

'আমার ভয় লাগছে না মা।'

'আমার ভয় লাগছে।'

আমি বললাম, তোমার যদি ভয় লাগে তুমি আমার খাটে আসবে। আমি কেন যাব?

মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বালিশ এবং তাঁর বিখ্যাত ভালবাসা-কম্বল নিয়ে চলে এলেন। এমন ভাবে লাফিয়ে খাটে উঠলেন যে মনে হল সত্যি ভয় পাচ্ছেন।

'বকু! খুবই ভয় পেয়েছি।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মা সত্যি ভয় পাচ্ছেন। তাঁর হাত পা কাঁপছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। ছোট বাচ্চারা আতংকে অস্থির হয়ে যা করে তিনি তাই করছেন। গুটিশুটি মেরে একেবারে ছোট হয়ে গেছেন।

'মা কী হয়েছে?'

'ভয় পেয়েছি।'

'ঝড় দেখে ভয় পেয়েছ?'

'না অন্য কিছু দেখেছি।'

'অন্য কিছুটা কী?'

'সকালে বলব।'

'সকালে না, এখনই বল।'

মা ভীত গলায় বললেন, যখন ঝড় শুরু হল— ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। তখন....

'তখন কী ?'

'আমি জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছি। বৃষ্টির ছাট আসছে। উঠে গিয়ে বন্ধ করব কি-না ভাবছি তখন হঠাৎ মনে হল জানালা ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকার কিছু বোঝা যায় না—কিন্তু একটা মেয়ে মানুষ যে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোঝা যায়। বেঁটে খুব রোগা একটা মানুষ। শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর অল্প অল্প মাথা দুলাচ্ছে। ছোট বাচ্চারা যেমন শিক ধরে মাথা দুলায় সে রকম।

'বাঁদর নাতো মা ? এই অঞ্চলে বাঁদর আছে। পরশু রাতে জাম গাছে আমি একটা বাঁদর দেখেছি।'

'আমিও বাঁদর ভেবেছিলাম কিন্তু....'

কী ?

'হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল তখন দেখলাম, বাঁদর না মানুষ।'

'মানুষ কী ভাবে হবে মা ? দোতলার জানালা। নীচে দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

'বকু কথা বলিস না চুপ করে থাক।'

'মা, তোমার কি ধারণা তুমি ভূত দেখেছ ?'

'চুপ করে থাকতে বলেছি— চুপ করে থাক।'

আশ্চর্য, মা থরথর করে কাঁপছেন। শুধু যে কাঁপছেন তাই না। তাঁর ঘাম হচ্ছে। আমি বললাম, পানি খাবে মা ? পানি এনে দেব ?

'না।'

'ভূতটা কেমন ছিল বলতো ?'

মা বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। আমি দু'হাতে শক্ত করে মা'কে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি নিশ্চিত মনে ঘুমাওতো মা আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি।

আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘর ভর্তি আলো— ঝলমল করছে। রোদ উঠে এসেছে বিছানায়। মা বিছানায় নেই। আমি ঠিক করলাম রাতের প্রসঙ্গে মা'র সঙ্গে আলাপ করব না। তিনি লজ্জা পাবেন। আমার বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করছে না। আজ সারাদিন বিছানায় গড়াগড়ি করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয় ? মাসের মধ্যে একটা দিন থাকা দরকার বিছানায় গড়াগড়ি খাবার জন্যে। সেই বিশেষ দিনগুলিতে

কেউ বিছানা ছেড়ে নামবে না। বাচ্চারা বিছানায় হুটোপুটি খাবে, বড়রা শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়বে কিংবা গল্পের বই পড়বে।

'মিস রুমাল!'

সোহরাব চাচা টিপট হাতে ঘরে ঢুকলেন। হাসি মুখে বললেন, তোমার মা কই ?

আমি বললাম, জানি না চাচা। আমার এই মাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে।

'কাল রাতে ঝড় কেমন দেখলে ?'

'খুব ভাল দেখলাম।'

'বিরাট ঝড় হয়েছে। গাছ পালা, কাচা বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে একাকার হয়েছে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডেকেছে।'

'বা! কী ইন্টারেস্টিং।'

'স্যার সোমেশ্বরী নদীর বান দেখতে যাবেন। তুমি যাবে কি-না জানতে চেয়েছেন।'

'অবশ্যই যাব।'

'তাহলে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও।'

'নাশতা খাব না ?'

'নাশতা নদীর পারে খাওয়া হবে।'

সোহরাব চাচা চায়ের পট টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। আমি বললাম, আপনি নিজে সব সময় চা নিয়ে আসেন আমার খুবই লজ্জা লাগে চাচা।

'লজ্জার কিছু নাই মা। হাত মুখ ধুয়ে চা খাও। খালি পেটে খেও না। টোস্ট বিসকিট আছে।'

'থ্যাংক য়্যু চাচা। থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ।'

সোহরাব চাচা চলে গেছেন। আমি খাটে পা ঝুলিয়ে বসে চা খাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে কী অসাধারণ একটা দিনই না আজ শুরু হতে যাচ্ছে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডেকেছে। আমি এবং তিনি নদীর বান দেখতে যাচ্ছি—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান"

খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরতে ইচ্ছা করছে। আমার কোন শাড়িই নেই। মা আমাকে শাড়ি কিনে দেন না। তাঁর ধারণা, শাড়ি পরলেই আমাকে বড় বড়

লাগবে। চারদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকবে। গুন্ডা ছেলেরা পেছনে লাগবে। সেইসব গুন্ডাদের কেউ খালি হাতে ঘুরবে না ওদের হাতে থাকবে বোতল ভর্তি এসিড। প্রেম করতে রাজি না হলেই বোতল ছুঁড়ে মারবে।

শাড়ি পরলে মা'র শাড়ি পরতে হবে বিশ্রী জবর জং সব শাড়ি। কড়া রঙ। উদ্ভট ডিজাইনের ছাপ। মা'র সবচে প্রিয় শাড়ির একটায় বাঘ, ভালুক, সিংহের ছবি। শাড়ির নাম কাহিনী-কাতান। শাড়ির গায়ে বাচ্চাদের রূপকথা। কোন সুস্থ মাথার মহিলার এই শাড়ি পরার কথা না, মা পরবেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পরবেন। সম্ভবত এই শাড়ির সঙ্গে তাঁর কিছু সুখ স্মৃতি আছে। হয়ত কোন একদিন বাবা বলেছিলেন, (নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে বলা, কিংবা মা'কে খুশি করার জন্যে বলা) আরে বাঘ-ভালুক মার্কা শাড়িতে তোমাকেতো দারুণ লাগছে।

মা'কে ভজিয়ে ভাজিয়ে সিম্পল কোন শাড়ি বের করার জন্যে মা'র খোঁজে নীচে নেমে মন খারাপ হয়ে গেল। ইউনিটের সবাই সোমেশ্বরী নদীর বান দেখার জন্যে যাচ্ছে। আজ নাকি সবাই নদীর পারে বসে নাশতা করবে। আমি বললাম, মা আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি যাব না।

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই যাবি না মানে ? সবাই যাচ্ছে তুই যাবি না কেন ?

'আমার শরীর ভাল না, এই জন্যে আমি যাব না।'

'অবশ্যই তুই যাবি। তোকে একা এখানে রেখে যাব ? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে ! যা কাপড় বদলে আয়।'

'না কাপড় বদলাব না, যে কাপড়ে আছি সেই কাপড়ে যাব।'

'রাতের বাসি কাপড় পরে যাবি ?'

'হুঁ।'

'এমন একটা চড় লাগাব না... !'

'লাগাও।'

আমি মুখ গোঁজ করে বসে আছি। কিছুই আমার মনে ধরছে না। একা একা শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। সবাই রেস্ট হাউস ছেড়ে চলে যাবে— আমি একা থাকব এর আনন্দ আলাদা।

'বকুলের কী হয়েছে ? মুখ অন্ধকার কেন ?'

ডিরেক্টর সাহেব কখন এসে, আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নি। আমি চট করে উঠে দাড়ালাম, বিনীত ভঙ্গিতে হাসলাম। আশ্চর্য কাণ্ড আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে।

'কাল রাতের ঝড় কেমন দেখলে ?'

'ভাল।'

'কী প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়ছিল শুনেছ ? আমি ভয়ে অস্থির। এই বুঝি মাথায় পড়ল। বজ্রাঘাতে মৃত্যু খুব খারাপ।'

'খারাপ কেন ?'

'লোক প্রবাদ হচ্ছে ভয়াবহ পাপীরা বজ্রাঘাতে মারা যায়। সিরাজদ্দৌলাকে যে খুন করেছিল— মিরণ, সে বজ্রাঘাতে মারা যায়।'

'এইসব আপনি বিশ্বাস করেন ?'

'আরে দূর এইসব বিশ্বাস করব কেন। কত ছোট ছোট অবোধ শিশু বজ্রাঘাতে মারা পড়ে। এরা কী পাপ করবে ? এদের সবচে বড় পাপ সম্ভবত কেড়ে ছোট ভাইয়ের লজেন্স নিয়ে নেয়া। সোমেশ্বরী নদীর বান দেখতে তুমি যাচ্ছ না ?'

'যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'সব সময় নিজের ইচ্ছাকে দাম দিও না। কালেক্টিভ ইচ্ছাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, যদি গুরুত্ব না দাও তাহলে হঠাৎ দেখবে তুমি দল থেকে আলাদা হয়ে পড়েছো। তখন ভয়াবহ সমস্যা হবে।'

'কী সমস্যা ?'

'মানুষের ডিএনএ-এর ভেতর একটা ইনফরমেশন ঢুকিয়ে দেয়া আছে। ইনফরমেশনটা হচ্ছে— কখনো একা থেকো না। সব সময় দলে থাকবে। এবং দলের একজনকে মান্য করবে। মানুষ যখন এই পদ্ধতিতে কাজ করতে অস্বীকার করে তখনই তার মাথা আউলা হতে থাকে।'

'ও।'

'আচ্ছা দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি, বলতো— কেন মানুষের ডিএনএ তে এই তথ্য ঢুকানো যে মানুষকে দলে থাকতে হবে একা থাকা যাবে না। দলের একজনকে মান্য করতে হবে ?'

'জানি না।'

'খুব সহজ কারণ। প্রাচীন মানুষকে বনে জঙ্গলে থাকতে হত। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দলবদ্ধ ভাবে চলতে হত। সেই কারণে প্রকৃতি মানুষের মাথার ভেতর ইনফরমেশনটা দিয়ে দিয়েছে।'

'ও।'

'মানুষের সমস্যা হচ্ছে সে একই সঙ্গে দলে থাকতে চায় আবার একই সঙ্গে দল থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে চায়।

'প্রকৃতি ডিএনএতে ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে বলেই কি দলপতি হিসেবে আমরা সবাই আপনাকে মান্য করছি?'

'হতে পারে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একজন দলপতি ঠিক করে ফেলা। আমরা যে এত রাজা ভক্ত জাত তা কী জন্যে? একই কারণে। পশুদের মধ্যেও এই দলপতি ব্যাপারটা আছে। মানুষের সঙ্গে পশুদের তেমন কোন প্রভেদ নেই।'

মা সেজেগুজে নেমে আসছেন। তাঁর মুখ ভর্তি হাসি। তিনি খুকিদের মত আহ্লাদী গলায় বললেন—বকু আমি কাহিনী-কাতানটা পরলাম। মা ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, মঈন ভাই আমাকে কেমন লাগছে? ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আপনাকে সুন্দরবন সুন্দরবন লাগছে।

'কেন?'

'বাঘ ভালুক আপনাকে ঘিরে রেখেছে এই জন্যে।'

'উফ মঈন ভাই আপনি যে কী রসিকতা করতে পারেন। এই শাড়িটা আমাকে বকুলের বাবা কিনে দিয়েছিল। এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার থেকে যেদিন প্রমোশন পেয়ে সেলস ম্যানেজার হল সেদিন।'

'খুব সুন্দর শাড়ি। চলুন রওনা হওয়া যাক। পাহাড়ি ঢলের পানি নাকি বেশিক্ষণ থাকে না।'

সোমেশ্বরী নদীর কাছে গিয়ে আমরা হতভম্ব। একী কান্ড! নদী ফুলে ফেঁপে একাকার। সমুদ্রের গর্জনের মত শোঁ শোঁ গর্জন আসছে। মাঝে মাঝে প্রবল স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে কড় কড় আওয়াজ হচ্ছে। বড় বড় গাছ নদীতে ভেসে আসছে। সেই সব গাছ ধরার জন্যে গ্রামের মানুষজন জড় হচ্ছে। যে গাছের ডালে প্রথম দড়ি পরিয়ে দিতে পারবে সেই হবে

গাছটার মালিক। দড়ি পরানোর কর্মকান্ড মোটেই সহজ না, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে নামতে হচ্ছে।

'বকুল আম্মা!'

তাকিয়ে দেখি মওলানা সাহেব আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ তিনি আচকান পরেছেন। চুল কেটেছেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। তাঁকে খুবই উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে।

'বুঝছেন আম্মা, একবার এক হাতী পানিতে ভেসে এসেছিল। হাতীর সঙ্গে হাতীর বাচ্চা। মা হাতীটা তার বাচ্চাটাকে শুড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিল।'

'তারপর!'

'এই অঞ্চলের মানুষজন আম্মা খুব সাহসী, তারা দড়ি, চেইন, কাঠ দিয়ে হাতী আর তার বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে ফেলে।'

'বলেন কী !'

'দু'টা হাতীই গুরুতর জখম হয়েছিল। বাচ্চাটা মারা যায়। মা হাতী বনে চলে যায়। তবে আম্মা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতি বৎসর ঠিক যেদিন বাচ্চাটা মারা গিয়েছিল সেদিন মা হাতীটা বন থেকে নেমে আসত। বাচ্চাটা যে জায়গায় মারা গিয়েছিল সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদত।'

'বাচ্চাটা কবে মারা গিয়েছিল ?'

'১৯শে চৈত্র।'

'আপনি নিজে দেখেছেন ?'

'জ্বি আম্মা দেখেছি।'

'এখনো আসে ?'

'গত তিন বৎসর ধরে আসতেছে না। সম্ভবত মারা গেছে, কিংবা অন্য সন্তানাদি হয়েছে।'

মওলানা সাহেব খুব ব্যস্ত হয়ে ইউনিটের কাজে লেগে গেলেন। নাশতা তৈরি হয়েছে। সেই নাশতা হাতে হাতে পৌছে দেয়া। চায়ের কাপ তুলে দেয়া। তাঁর ব্যস্ততার সীমা নেই। নাশতা হচ্ছে পরোটা, ডালভাজি, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা কলা। মা তাঁর এবং আমার কলাটা বদলাবার জন্যে গিয়েছেন। দাগ ধরা কলা তিনি বদলে নেবেনই।

আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ডিরেক্টর সাহেব একটু দূরে চায়ের একটা মগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে আশ্চর্য ধরনের বিষন্নতা। তিনি এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। তিনি এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন না। এক পলকের জন্যে দৃষ্টি ফেরালেও তিনি দেখতে পেতেন আমি নদী দেখছি না, আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

নাশতা খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সোহরাব চাচা বললেন, একটা অত্যন্ত জরুরি ঘোষণা। পাহাড়ি নদীর পারে একটা শট নেয়া হবে, আগে যেখানে শট নেয়া হয়েছিল সেখানে, কাশবনের কাছে। কাজেই ইউনিট চলে যাবে, দৃশ্যটায় আর্টিস্ট থাকবে শুধু একজন— বকুল। বকুল তুমি যাও স্যারের কাছ থেকে দৃশ্যটা বুঝে নাও। মেকাপম্যান ইউনিটের সঙ্গে চলে যাবে। মেকাপ হবে অন লোকেশন।

আমি ডিরেক্টর সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, বকুল একটু কষ্ট করতে হবে। অনেক দূর হাঁটতে হবে। পারবে না ?

'জ্বি পারব।'

'নদীতে হঠাৎ যৌবন দেখে দৃশ্যটা আমার মাথায় এসেছে। দিলুতো আগেও এই নদীর কাছে এসেছে। তারপর হঠাৎ একদিন এসে দেখে নদীর এই অবস্থা। তার নিজের জীবনের সঙ্গে দৃশ্যটি মিলে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে নদী দেখবে। নিজের অজান্তেই সে নদীর পারের খুব কাছাকাছি চলে যাবে। দৃশ্যটা এ ভাবে নেয়া হবে যেন মনে হয় এই বুঝি সে পড়ে গেল নদীতে।

'আমার পোষাক কী হবে ?'

'এখন যা পরে আছ তাতেই চলবে। শুধু গায়ে শাদা একটা চাদর জড়িয়ে নেবে।'

মা'র খুব ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যাবার। তিনি শেষ পর্যন্ত সাহস করলেন না। তবে মওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন। আজ শুক্রবার। তাঁর জুম্মার নামাজ আছে— সেটা নিয়ে তাঁকে তেমন চিন্তিত মনে হল না।

সকাল বেলা রোদ ছিল। আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। প্রকৃতি কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বারবার চিন্তিত এবং বিরক্ত মুখে মেঘের দিকে তাকাচ্ছেন। মেঘ হলে শট নেয়া সমস্যা হবে। ভাল শটের জন্যে সানলাইট চাই। তবে হাইস্পীড ফিল্ম ব্যবহার করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। অল্প আলোয় কাজ করার জন্যে হাইস্পীড ফিল্ম নিশ্চয়ই আনা হয়েছে। আমি নিজের মনে হাঁটছি— অল্প কিছুদিন কাজ করেই অনেক ফিল্মের কথা শিখে ফেলেছি। কেমন যেন হাসি পাচ্ছে।

শট নেয়া হল।

কেমন হল আমি কিছুই জানি না। ভয়ে আমার আত্মা কেঁপে যাচ্ছিল। এমন একটা জায়গায় আমাকে দাঁড়া করানো হল যার ঠিক নীচ দিয়ে সোঁ সোঁ করে স্রোত যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি পার ভেঙ্গে আমি নীচে পড়লাম। মওলানা সাহেব বললেন, আম্মা কোন ভয় নাই আমি আল্লাহপাকের পাক নাম ইয়া আহাদু পড়ে ফুঁ দিয়ে দিয়েছি। তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন।

আমার কাজ হল নদীর পানির দিকে বিস্ময়, ভয় এবং আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে থাকা। আমি হাসিমুখে ডিরেক্টর সাহেবকে বললাম, বিস্ময় ভয় এবং আনন্দ এই তিন জিনিস একসঙ্গে কী ভাবে দেখাব ? তিনি বললেন, খুব সহজ। ঐ জায়গাটায় যখন তুমি দাঁড়াবে তখনই একসঙ্গে বিস্ময় এবং ভয় চলে আসবে। আর তখন আনন্দময় কিছু ভাববে তাহলেই আনন্দও চোখে ছায়া ফেলবে।

'এত সহজ ?'

'হ্যাঁ এত সহজ।'

আমি দাঁড়ালাম। শট নেয়া হল। ক্যামেরা পজিশন এমন যে একসঙ্গে আমাকে দেখা যাচ্ছে, নদীর জলের ঘূর্নি দেখা যাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আরেকটা শট নেয়া হবে। তুমি কাশফুল হাতে নিয়ে দাঁড়াও। এক পর্যায়ে কাশফুল নদীতে ছুঁড়ে মারবে। তারপর ক্যামেরা চলে যাবে তোমার মুখ থেকে কাশফুলে। তারপর দেখা যাক কী হয়। আমি তাই করলাম এবং অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল, ফুলটা পড়ল ঠিক জলের ঘূর্নির মাঝখানে। জলের ঘূর্নির সঙ্গে ঘুরছে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠে আবার ডুবে যাচ্ছে। ক্লোজ শটে ক্যামেরা ফুলকে ধরে আছে। ফুল নানান কান্ডকারখানা করছে আমরা সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। মওলানা বললেন, মাশাল্লাহ বড়ই আচানক দৃশ্য।

এই দৃশ্য নিয়ে আমরা এতই অভিভূত, বৃষ্টি যে শুরু হয়েছে তাও বুঝতে পারি নি। যখন বোঝা গেল তখন প্রচন্ড ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। ক্যামেরা ভেজানো যাবে না। চল্লিশ লক্ষ টাকা দামের এরিফ্লেক্স ক্যামেরা। এক ফোটা পানিও পড়তে দেয়া যাবে না। বড় বড় ছাতা ক্যামেরার উপর ধরে দৌড়ে কোন একটা বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা সবাই ছুটছি। আশে পাশে কোন বাড়িঘর নেই তবু ছুটছি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি একটা পাওয়া গেল। মাটির বাড়ি উপরে খড়ের ছাউনি। ক্যামেরাম্যান হাঁফ ছেড়ে বললেন, আল্লা বাঁচিয়েছেন। মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মানুষের বিপদে আল্লাহ্ পাক সব সময় সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমি বললাম, তাই নাকি?

মওলানা সাহেব বললেন, জ্বি আম্মা। আল্লাহ্ পাক মানুষের বিপদের সময় পাশে থাকেন, মানুষের আনন্দের সময়ও পাশে থাকেন।

'কখন তিনি পাশে থাকেন না?'

'তাতো আম্মা বলতে পারি না। আমার জ্ঞান বুদ্ধি অল্প।'

বৃষ্টি জোরে-শোরে শুরু হয়েছে। দমকা বাতাসও দিচ্ছে। সন্ধ্যা এখনো হয় নি কিন্তু ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। বৃষ্টি সহজে থামবে এ রকম মনে হচ্ছে না।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, ঝাল মুড়ি দিয়ে চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তেলে ভাজা ঝাল মুড়ি, শুকনো মরিচ আর সিগারেট সহ আগুন গরম চা।

ইউনিটের একটা ছেলে ছাতা হাতে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যে মুড়ি এবং চায়ের ব্যবস্থা হবে। ডিরেক্টর সাহেব কোন কিছু চেয়েছেন আর তা তাঁকে দেয়া হয় নি এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, পাহাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। তোমরা এক কাজ কর বৃষ্টি কমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি ভিজতে ভিজতে রওনা হচ্ছি।

মওলানা সাহেব বললেন, ঠান্ডা লেগে জ্বরে পড়বেন।

'বৃষ্টির পানিতে ঠান্ডা লাগে না, জ্বরও হয় না। চা খেয়ে শরীর গরম করে আমি নামব বৃষ্টিতে।'

মওলানা বললেন, স্যারের সঙ্গে আমিও যেতাম কিন্তু আচকানটা ভিজে যাবে। আচকান ভিজলে নষ্ট হয়ে যাবে।

'আচকান নষ্ট করা ঠিক হবে না। আপনি থাকুন ক্যামেরা ইউনিটকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে মুড়ি ভাজা। শুকনো মরিচ ভাজা।

ডিরেক্টর সাহেব বৃষ্টিতে নামার প্রস্তুতি নিলেন। জুতা খুলে ফেললেন, প্যান্ট গুটিয়ে নিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললাম, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যাবে ? ভাল বৃষ্টি হচ্ছেতো।

'হোক। আমি একা একা এখানে থাকব না।'

'একা কোথায় সবাইতো আছে।'

'আপনি চলে গেলে আমিও চলে যাব।'

'বেশতো চল। তোমার ঠান্ডার ধাত নেইতো ? বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়বে না ?'

'আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে বৃষ্টির পানিতে ঠান্ডা লাগে না।'

'আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'চল বৃষ্টিতে নামা যাক। শোন একটা কাজ করা যাক। তুমি বরং হাতে একটা ছাতা নাও। আমি ভিজতে ভিজতে যাই তুমি ছাতা হাতে পেছনে পেছনে আস।'

'না আমি ছাতা নেব না।'

আমরা বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। আমি ভেবেছিলাম সবাই খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাবে। কেউ তাকাল না। যেন ঘটনাটা খুব সহজ ও স্বাভাবিক। ডিরেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই এর আগেও অনেক বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আমার মত আরো অনেকেই তাঁর সঙ্গী হয়েছে।

বৃষ্টির ফোঁটা অসম্ভব ঠান্ডা। আরেকটু ঠান্ডা হলেই বরফ হয়ে যেত এমন অবস্থা। ফোঁটাগুলিও সাইজে বড়। পাহাড়ি বৃষ্টির এই বুঝি ধরন।

'বকুল বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগছে ?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'তুমি কি প্রায়ই বৃষ্টিতে ভেজ ?'

'আমার খুব ইচ্ছা করে কিন্তু মা দেয় না। আমি আবার মা'র সব কথা শুনি। আমি খুব মাতৃভক্ত মেয়ে।'

'মাতৃভক্তি খুব ভাল, কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবে— প্রকৃতি মানুষের জন্যে কিছু সহজ আনন্দের ব্যবস্থা করে রেখেছে— মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি কোন ভক্তির কারণেই নিজেকে এই সব সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে না।'

'আচ্ছা যান করব না।'

'বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কেমন সুচের মত গায়ে বিঁধছে দেখছ ?'

'জ্বি দেখছি।'

'বৃষ্টিতে নামলেই আমার কী করতে ইচ্ছা করে জান ?'

'না জানি না।'

'সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। সেটা সম্ভব না। ওয়াটার প্রুফ সিগারেট থাকলে ভাল হত, ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সিগারেট টানতে টানতে হাঁটতাম।'

'একটা কাজ করুন কোন একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সিগারেট শেষ করুন। তারপর আমরা হাঁটব।'

'থাক বাদ দাও। বৃষ্টি মনে হয় আরো জোরে আসছে।'

'হুঁ।'

'আমার বেলা সবসময় কী হয় জান— যখন দেখি জোর বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি দেখে ভিজতে ইচ্ছে হল, যেই নামলাম— ওমি বৃষ্টি শেষ।'

'আজকেরটা শেষ হবে না। আজ সারা রাত বৃষ্টি হবে।'

'তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাতো ?'

'না।'

'মাটি পিছল হয়ে আছে সাবধানে হাঁট।'

'সাবধানেই হাঁটছি। কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে দেখছেন। কিছুক্ষণ পর আর চোখে কিছু দেখতে পাবেন না।'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'পথ চিনে যেতে পারবেন ?'

'তা পারব। জোড়া তালগাছ দেখতে পাচ্ছ ?'

'হুঁ।'

'প্রথম যেতে হবে জোড়া তালগাছ পর্যন্ত। সেখানে দু'টা রাস্তা। আমরা সেই রাস্তা নেব যেটা গেছে গারোদের শ্মশানের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগছে ?'

'ভাল লাগছে।'

'ঝড় আসছে এটা কি বুঝতে পারছ ?'

'না।'

'ঝড় আসছে। ভাল ঝড় আসছে। আমাদের প্রধান কাজ এখন হবে কোন একটা পাকা দালানে আশ্রয় নেয়া।'

‘পাকা দালান পাবেন কোথায় ?’

‘ তাইতো দেখছি। শ্মশান পর্যন্ত যেতে পারলে হত। শ্মশানে মরা রাখার একটা ঘর আছে।’

‘ আমি মরে গেলেও শ্মশানের ঐ ঘরে যাব না।’

দেখতে দেখতে ঝড় শুরু হয়ে গেল। শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল। ঝড় আসছে উল্টো দিক থেকে। পিঠে বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে। আমাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্যান্ডেল পায়ে রওনা দিয়েছিলাম, স্যান্ডেল অনেক আগেই খুলে ফেলেছি। হাঁটছি খালি পায়ে। বাঁ পায়ে কাঁটা ফুটেছে। কাঁটা ফোটায় যন্ত্রণাও সুখের মত লাগছে।

‘ ভয় লাগছে ?’

‘ উহুঁ। শুধু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’

‘ধর আমার হাত ধর।’

আমি কোন রকম দ্বিধা ছাড়া তাঁর হাত ধরলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল এ জীবনে আমার আর কিছু পাওয়ার নেই, চাওয়ারও নেই। আমি এখন বাস করছি সব পেয়েছির ভুবনে। আমার চোখে পানি এসে গেল।

ঝড় বাড়ছে। বাড়ুক। পৃথিবীতে প্রলয় নেমে আসুক। কিচ্ছু যায় আসে না। আমি এখন ভাল মতই কাঁদতে শুরু করেছি। ভাগ্য ভাল আমার চোখের জল তিনি দেখবেন না। চোখের জলের কারণও কোনদিন জানবেন না।

‘ বকুল!’

‘ জ্বি।’

‘ মনে হচ্ছে আমরা একটা বিপদে পড়েছি।’

‘কেন ?’

‘ তালগাছ দেখতে পাচ্ছি না।’

‘ মনে হয় ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।’

‘ গাছ ভাঙ্গার মত জোরালো ঝড় হচ্ছে না।’

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রচন্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল।

‘ বকুল!’

‘ জ্বি।’

'গাছ চাপা পড়ে মারা যাব বলেতো মনে হচ্ছে। কী করা যায় বলতো ?'

'চলুন ফাঁকা মাঠে চলে যাই।'

'ফাঁকা মাঠেতো মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা।'

আমি হেসে ফেললাম। তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, হাসছ কেন ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই জন্যে হাসছি।

'আমিতো চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও দেখতে পাচ্ছি না।'

তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করলে কেমন হয় ?

'খুব ভাল হয়।'

'চিৎকার করলেই বা কে দেখবে। কোন মানুষজনওতো দেখছি না।'

'চলুন আমরা হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় না একসময় কাউকে পাব। কিংবা বাড়ি ঘর পাব।'

মাটির দেয়ালের লম্বাটে ধরনের একটা ঘর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। বিরান মাঠের মাঝে ঘর। প্রাইমারী স্কুল বা মক্তব জাতীয় কিছু হবে। ঘরের দরজা জানালা সবই খোলা। ভেতরে কিছু বেঞ্চ আছে। চাটাই আছে। ঘরটার টিনের চালের একটা অংশ ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। অন্য অংশটিও হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দু'জন রাত কাটাব এমন একটা জায়গায় যে জায়গাটা কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। এমন অসাধারণ রাত আমি আর কখনোই ফিরে পাব না। কখনো না, কোনদিনও না।

তিনি ভেজা দেয়াশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। যে ভাবে সব ভিজেছে দেয়াশলাই জ্বালার কোন কারণ নেই। তবু তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আহা বেচারার বোধ হয় খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। আচ্ছা এখন একটা ভয়ংকর কাজ করলে কেমন হয় ? তাকে তুমি তুমি করে বললে কেমন হয় ? আমি যদি বলি, মঈন শোন, তুমি সিগারেট ধরাবে কীভাবে ? ভিজে গেছে না ? পাপিয়া ম্যাডাম যদি মাঝে-মধ্যে তুমি বলতে পারেন— আমি বললে অসুবিধা কী ? না কোন অসুবিধা নেই। এই সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না। তিনি খুব চমকে উঠবেন। কিংবা কে জানে হয়ত চমকাবেন না। মানুষ একেক পরিবেশে একেক রকম আচরণ করে।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার ? আমি বললাম, আমার কেন জানি খুব ভয় ভয় লাগছে।

'কিসের ভয় ?'

'জানি না কিসের ভয়। আমি আপনার হাত ধরে বসে থাকব।'

'বেশতো বসে থাক। ঝড় কিন্তু কমে গেছে।'

'না কমে নি।'

'তুমি কাঁদছ কেন ?'

'জানি না কেন যেন আমার খুব কান্না পাচ্ছে। আপনি কি আমাকে একটু আদর করে দেবেন ? প্লীজ প্লীজ প্লীজ।'

আর ঠিক তখনই মওলানা সাহেবের গলা শোনা গেল। চিন্তিত গলায় মওলানা ডাকছেন, স্যার কি আছেন ? স্যার ?

টর্চ লাইটের আলো পড়ছে স্কুলের বারান্দায়।

'স্যার! স্যার।'

তিনি বের হয়ে গেলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, কে মওলানা সাহেব ?

'জ্বি স্যার। গজব হয়ে গেছে। গাছপালা ভেঙ্গেছে বাড়িঘর কত যে গেছে কে জানে। আমি আপনার চিন্তায় অস্থির হয়েছি। আপনার খোঁজে নানান দিকে লোক গেছে।'

'আমি ভাল আছি।'

'বকুল আম্মা। উনি কোথায় ?'

'সেও ভাল আছে। তার পায়ে কাঁটা ফুটেছে। হাঁটতে পারছে না। মওলানা সাহেব!'

'জ্বি।'

'কোনখান থেকে একটি সিগারেট এনে দিতে পারবেন। মনে হচ্ছে সিগারেট না খেলে মরে যাব।'

'এনে দিচ্ছি স্যার। টর্চ লাইটটা আপনার কাছে রাখেন।'

তিনি টর্চ লাইট হাতে স্কুল ঘরে ঢুকলেন। বসলেন আমার পাশে। আমার মনে হল— এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কোন মেয়ে কোনদিন জন্মায় নি। কখনো জন্মাবেও না।

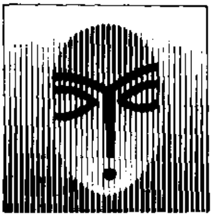

ঘুম আসছে না।

আমি চোখ বন্ধ করে হাত পা এলিয়ে পড়ে আছি। আমার গায়ে মা'র বিখ্যাত ভালবাসা কম্বল। বাইরের পৃথিবী হিম হয়ে আছে। বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে আকাশে গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে — হয়ত শেষ রাতের দিকে আবারো বৃষ্টি নামবে। ঘুমুবার জন্যে সুন্দর একটা রাত। ঘুম আসছে না। মা এর মধ্যে দু'বার কপালে হাত রেখে জ্বর দেখলেন। চুলে বিলি কাটার মত করলেন। অকারণে কিছুক্ষণ কাশলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য আমাকে ঘুম থেকে তুলে গল্প করা। শুটিং কেমন হল, ঝড়ের সময় কোথায় ছিলাম এইসব খুঁটিনাটি। মা শ্রোতা হিসেবে খুব মনোযোগী। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ভাল। আমি যা বলব তিনি খুব মন দিয়ে শুনবেন। কিছুই ভুলবেন না। বেশ অনেকদিন পর তাঁর যখন ধারণা হবে আমি প্রথমবার কী বলেছিলাম তা এখন আর মনে নেই তখন আবারো জানতে চাইবেন। একই গল্প আমি আবারো বলব। দু'টি গল্পে যদি কোন মিল পাওয়া না যায় তখন অমিলের জায়গাগুলিতে জেরা করতে বসবেন। সেই জেরা থেকে বের হয়ে যাবে আমি মিথ্যা কিছু বলেছিলাম কি-না। গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করলে মা খুব ভাল করতেন। অপরাধীর মুখ থেকে সত্যি কথা তিনি অতি দ্রুত বের করে ফেলতে পারতেন।

'বকু। ও বকু।'

আমি জবাব দিলাম না। ঘুমে তলিয়ে গেছি এমন ভঙ্গিতে গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললাম।

'তুইতো জেগে আছিস। কথা বলছিস না কেন?'

আমি চোখ মেলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললাম, অসম্ভব টায়ার্ড লাগছে মা। চোখ মেলে রাখতে পারছি না।

'তোদের শুটিং কেমন হল রে ?'

'ভাল।'

'ঝড় কেমন দেখলি ?'

'ভাল।'

'ঝড়ের সময় ভয় পেয়েছিলি ?'

'হুঁ।'

'ভয় পাওয়ারই কথা। আমারতো একেবারে আত্মা উড়ে গিয়েছিল।'

'মা আমাকে ঘুমুতে দাও। কথা বলো না। চুলে বিলি কাটবে না, সুড়সুড়ি লাগছে।'

মা চুলে বিলি কাটা বন্ধ করলেন না, তবে কথা বন্ধ করলেন। এই কথা বন্ধও সাময়িক। তিনি আবারো শুরু করবেন। দম নিচ্ছেন।

'বকু!'

'হুঁ।'

'তোরাতো চলে গেলি তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক পাজেরো জীপ এসে উপস্থিত। আমি ভাবলাম— পাপিয়া ফিরে এলো বুঝি। তাকিয়ে দেখি জীপের ভেতর একজন মহিলা বসে আছেন। তাঁর কোলে পাঁচ ছ' বছরের একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। মহিলা কে বলত ? দেখি তোর অনুমান ?'

আমি জবাব দিলাম না। মা'র সঙ্গে এই মুহূর্তে অনুমান অনুমান খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না। আমি কিছু সময় একা থাকতে চাই। নিজের জীবনটার উপর চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। খুব সহজ সাদামাটা জীবন আমার না। নানান ধরনের জটিলতার জীবন। জীবনটা যদি লম্বা দড়ির মত হয় তাহলে আমার সেই দড়ির নানান জায়গায় গিঁট লেগে গেছে। কিছু গিঁট আপনাতেই লেগে আছে, কিছু গিঁট আমি লাগাচ্ছি।

মা চাপা গলায় বললেন, মহিলার নাম নীরা। আমাদের মঈন ভাইয়ের স্ত্রী। আর মেয়েটার নাম কী জানিস ? খুবই অদ্ভুত নাম— এন্টেনা। টিভির এন্টেনা থাকে। মানুষের নামও যে এন্টেনা হয় এই প্রথম শুনলাম। মঈন ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখে আমি খুবই আপসেট হয়েছি। সাদা তেলাপোকার মত ফর্সা গা— আর খুব অহংকারী চেহারা। কপাল না কুঁচকে তাকাতে পারে না। ভুরু কুঁচকে থাকতে

থাকতে কপালে দাগ পড়ে গেছে। উনার মেয়েটার চেহারা অবশ্যি সুইট আছে। বড় হলে থাকবে কি-না কে জানে। ছোটবেলায় যাদের চেহারা সুইট থাকে—বড় হলে তারা ঘোড়ামুখী হয়ে যায়।

আমি মা'র কথায় মনে মনে হাসলাম।

বোঝাই যাচ্ছে নীরা নামের মহিলা অসম্ভব রূপবতী। রূপবতী মহিলাদের প্রসঙ্গে মা বলবেন—চেহারা অহংকারী। দেমাগ ঝরে ঝরে পড়ছে, চোখের রঙ কটা। ভুরু কুঁচকানো।

'বকু!'

'হুঁ।'

'মহিলার সঙ্গে আমিই আগ বাড়িয়ে কথা বললাম। এলেবেলে টাইপ কথা। শুটিং কী হচ্ছে না হচ্ছে এইসব।'

'ভাল করেছ। ক্ষমতাবান মানুষের স্ত্রীর সঙ্গে খাতির রাখা ভাল।'

'খাতির করার জন্যে বলি নি। কথা বলে উনাকে একটু বাজিয়ে নিলাম। কী বুঝলাম জানিস! কথা বলে বুঝলাম ভদ্রমহিলা খুব পাকা অভিনেত্রী। হাসি খুশি একটা ভাব মুখে ধরে রেখেছে। যেই আসছে তার সঙ্গেই হাসি মুখে কথা বলছে। বুড়ি বয়সে খুকি সাজার চেষ্টা।'

'যত অভিনয়ই করুক তোমার কাছেতো ধরা পড়ে গেছে।'

'তুই বাঁকা ধরনের কথা বলছিস কেন?'

'প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছেতো মা, এই জন্যেই আমার সোজা কথাগুলি বাঁকা হয়ে বের হচ্ছে। তুমি কি তোমার একটা পা আমার দিকে এগিয়ে দেবে?'

'কেন?'

'তোমার পা ধরব।'

'পা ধরবি কেন?'

'পা ধরে বলব আজকের রাতটার মত আমাকে ক্ষমা কর। ঘুমুতে দাও।'

'ভাত খাবি না?'

'না।'

'তুই শুয়ে থাক, আমি মুখে তুলে খাইয়ে দি।'

'তোমাকে মুখে তুলে খাওয়াতে হবে না মা। আমার বমি বমি লাগছে। সরে বোস, নয়তো তোমার গায়ে বমি করে দেব।'

'এক গ্লাস দুধ এনে দি। দুধ খা আর একটা কলা খা।'

'আমিতো কালসাপ না যে আমাকে দুধ কলা দিয়ে পুষতে হবে। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছো দয়া করে আর বিরক্ত করো না।'

'আচ্ছা ঘুমো। মাঝখানে শুয়ে আছিস কেন ? সাইড করে ঘুমো— আমার জন্যে জায়গা রাখ।'

'তুমি অন্য বিছানায় ঘুমাও মা। আজ আমি একা শোব। তোমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।'

'আমার সঙ্গে ঘুমুতে অসুবিধা কী ?'

'তুমি ঘুমের মধ্যে খুব নড়াচড়া কর। বিড় বিড় করে কথা বল। আমার অসুবিধা হয়। তাছাড়া তোমার গায়ে রসুনের গন্ধ।'

মা কথা বললেন না, বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। আমি তাঁর খুব দুর্বল একটা জায়গায় ঘা দিয়েছি। আঘাত সামলাতে তাঁর সময় লাগবে। তিনি আজ আলাদা বিছানায় ঘুমুবেন। এবং আমি নিশ্চিত বাকি রাতটা আমাকে বিরক্ত করবেন না।

মা'র গায়ে রসুনের গন্ধ এই কথাটা বাবা শেষের দিকে বলতে শুরু করেছিলেন। মা'র ঘর এবং আমার ঘর ছিল পাশাপাশি। ঐ ঘরে একটু চড়া গলায় কোন কথা হলেই আমি শুনতে পেতাম। বাবা কখনোই চড়া গলায় কোন কথা বলতেন না, তবে অল্পতেই মা'র গলা চড়ে যেত। মা কী বলছেন সেখান থেকেই বাবার জবাব কী হচ্ছে বোঝা যেত। এক রাতে শুনি মা চড়া গলায়, এবং একই সঙ্গে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছেন— "কী বললে, আমার গায়ে রসুনের গন্ধ ?" বাবা কী একটা জবাব দিলেন। সেই জবাব শোনা গেল না। মা'র পরবর্তী কথা শোনা গেল— আমার গায়ে রসুনের গন্ধ বলে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারব না ? আমার স্বামী থাকবে এক ঘরে, আমি থাকব আরেক ঘরে ? আর রসুনের গন্ধটা তুমি পাচ্ছ কীভাবে ? আমি কী ক্ষেতে রসুন বুনে এসেছি ? মা'র ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল। তার কিছুক্ষণ পর মা আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। আমি সদ্য ঘুম ভেঙ্গে উঠে এসেছি এমন ভাব করে দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললাম, রাত দুপুরে কী এমন দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছ। মা ধরা গলায় বললেন— বকু ভাল মত শুঁকে দেখতো— আমার গায়ে কি কোন গন্ধ পাস ? কোন বাজে টাইপ গন্ধ ?

আমি অনেক শুঁকে টুকে বললাম, হুঁ পাচ্ছি। বেশ বাজে ধরনের একটা গন্ধ পাচ্ছি মা।

'বাজে ধরনের গন্ধ মানে কী ?'

'রসুন রসুন টাইপ।'

'সত্যি পাচ্ছিস ?'

'হুঁ।'

মা তখনই সাবান নিয়ে গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসল করে গায়ে একগাদা সেন্ট মেখে ঘুমুতে এলেন। আমাকে বললেন, বকু এখনো গন্ধ পাচ্ছিস ? আমি বললাম, এখন সেন্টের পচা গন্ধ পাচ্ছি। এরচে রসুনের গন্ধ ভাল ছিল। মাথা ধরে গেছে। তুমি আরেকবার গোসল করে আস। তুমি পাশে শুলে আমি ঘুমুতে পারব না। মা রাগ করে চাদর পেতে মেঝেতে ঘুমুতে গেলেন।

আমি কী মা'র চেয়ে বাবাকে বেশি পছন্দ করি ? এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। এবং এক সময় এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়া আমার মনে কিছুই নেই। এটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপার। একটা বড় ধরনের ভুলের জন্যে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত 'শুদ্ধ' কাজগুলিও ভুল হয়ে যায়।

আজ আমি যে ভুল করেছি তার জন্যে আমারও সারাজীবনের শুদ্ধ কাজগুলি কি ভুল হয়ে গেছে ? না নিজের কথা আমি এখন ভাবব না। এখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। বরং বাবাকে নিয়ে ভাবি। আমার বাবা সৈয়দ আনোয়ারের অনেক গুণ ছিল, এখনো নিশ্চয়ই আছে। তিনি শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী, হাসি খুশি মানুষ। চোখে পড়ার মত বিশেষ কোন গুণ নেই। যাদের বিশেষ কোন গুণ থাকে না, তাদের বিশেষ কোন দোষও থাকে না। তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি গল্প বলতে পারতেন না, তবে গল্প শুনতে পছন্দ করতেন। আমি আমার স্কুলের সব গল্প বাবাকে বলতাম। অতি সাধারণ গল্প শুনেও তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হতেন। তাঁর মুগ্ধতা ও বিস্ময় বোধে কোন খাদ ছিল না। অবাক হয়ে তিনি আমার গল্প শুনছেন, এই দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

'বাবা শোন আজ কী হয়েছে— আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে— নাম দিলরুবা, সে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গিয়েছে।'

'বলিস কী ?'

'মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছিল।'

'তারপর ?'

'মিস দৌড়ে এসেছেন। দিলরুবার বাবা মা'কে খবর দিয়েছেন। তার মা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। এসেই মিসের সাথে কী চিৎকার কী চেঁচামেচি।'

'মিসের দোষ কী ? তিনিতো আর ধাক্কা দিয়ে ফেলেন নি।'

'তবু উনি ভেবেছেন মিসের দোষ। মিসকে অনেক বকাঝকা করে দিলরুবাকে নিয়ে চলে গেছেন। উনি বলেছেন দিলরুবাকে আর এই স্কুলে রাখবেন না।'

'আমার মনে হয় এই স্কুলেই রাখবে।'

'আমারো তাই মনে হয়।'

স্কুলের এই তুচ্ছ গল্প আমি মা'কেও বললাম। মা গল্প শুনে বলেছেন— মিসেরইতো দোষ। সে দেখবে না— মেয়েগুলি কী করছে না করছে ? মিস গুলি কী করে আমিতো জানি। ক্লাসে এসে ঘুমায়। মাসের শেষে বেতন নিয়ে হাসি মুখে বাসায় যায়।

দিলরুবার প্রসঙ্গে পরবর্তীতে মা আর কিছুই জিজ্ঞাস করেন নি। কিন্তু বাবা ঠিকই পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, রুমালী দিলরুবা কি ক্লাসে এসেছিল ? আমি বললাম, না বাবা। বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, তাহলেতো সমস্যা। সত্যি সত্যি কি স্কুল বদলে দেবে ?

'বোধ হয়।'

'আরো দু'একটা দিন দেখা যাক।'

তিন দিনের দিন কপালে ব্যান্ডেজ নিয়ে দিলরুবা ক্লাসে এল। আমি বাবাকে খবর দিতেই তিনি খুবই নিশ্চিন্ত হলেন বলে মনে হল। মনে হল তাঁর বুক থেকে পাষাণ নেমে গেছে।

আমাকে স্কুল থেকে আনা নেয়ার কাজ মা-ই সব সময় করতেন। হঠাৎ হঠাৎ বাবা এসে উপস্থিত হতেন। সেদিন আমার আনন্দের কোন সীমা থাকত না। বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরা, আমার জীবনের আনন্দময় ঘটনাগুলোর একটি। রিকশা করে ফিরছি হঠাৎ দেখা গেল এক জায়গায় কিছু লোক জটলা পাকিয়ে আছে। আমি বললাম— এখানে কী হচ্ছে বাবা ?

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রিকশা থামিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন জটলার কাছে। দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরবেন— যাতে কী হচ্ছে আমি দেখতে পাই।

হয়ত রিকশার পাশ দিয়ে আইসক্রীমের গাড়ি যাচ্ছে, বাবা বলবেন, আমার কেন জানি আইসক্রীম খেতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায় মা ?

'আইসক্রীম খাও।'

'আমি একা একা খাব তুই বসে বসে দেখবি এটা কেমন কথা !'

'কিচ্ছু হবে না বাবা— তুমি খাও।'

'একটা কাজ করলে কেমন হয়— আমার আইসক্রীম থেকে তুই দু'এক কামড় দে।'

'আচ্ছা।'

বাড়িতে আইসক্রীম খাওয়া আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আমার ঠাণ্ডার দোষ আছে। আইসক্রীম খেলেই আমার টনসিল ফুলে যায়।

আইসক্রীম কেনা হয়। বাবা একটা কামড় দিয়েই বলেন, একী খেতে এমন বিশ্রী কেন ? টাকাটা মনে হচ্ছে জলে গেল। রুমালী তুই খেয়ে দেখতো তোর কাছে কেমন লাগছে। আমি খেয়ে বলি, বাবা আমার কাছেতো খুব ভাল লাগছে।

'তাহলে বরং তুই খেয়ে ফেল। নষ্ট করে লাভ কী ? মা'কে না বললেই হল।'

আমি মহানন্দে আইসক্রীম খাই। আমাকে আইসক্রীম খাওয়ানোর বাবার এই ছেলেমানুষী কৌশল আমি চট করে ধরে ফেলি। আমার এত ভাল লাগে। এক একদিন আনন্দে চোখে পানি এসে যায়।

এখন আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। কেন পড়ছে আমি জানি না। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়া রোগ হয়েছে। একা একা কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

আবার কি বৃষ্টি শুরু হল ? শহরের বৃষ্টি এবং গ্রামের বৃষ্টিতো এক না। শহুরে বৃষ্টির ভেতর শহুরে ভাব আছে। যেন হিসেব কষা বৃষ্টি। গ্রামের বৃষ্টি লাগামছাড়া।

শহরের দালানকোঠা বৃষ্টির সঙ্গে নাচে না। গ্রামের গাছপালা, ঝোপঝাড় বৃষ্টিতে নাচতে থাকে।

আমার জীবনের বড় বড় সব ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে। যে দিন আমি মারা যাব সেদিনও নিশ্চয়ই খুব ঝড় বৃষ্টি হবে। আমার ডেডবডি নিয়ে মা পড়বেন বিরাট সমস্যায়। লোকজনকে কীভাবে খবর দেবেন ? কে আসবে ? কোন কবরখানায় কবর হবে ? গোর খোদকদেরও হয়তো খবর দিয়ে পাওয়া যাবে না। তবে মা সব ম্যানেজ করে ফেলবেন। দেখা যাবে ঝড় বৃষ্টির কারণেও কিছু আটকাচ্ছে না।

আমার জীবনের সঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্পর্কের একটা গল্প বলি। স্কুল ছুটি হয়েছে। আমরা ক্লাস থেকে বের হয়ে দেখি খুব বৃষ্টি। রাস্তায় পানি জমে গেছে।

আমাদের খুব মজা হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভিজছি। একজন মিস বকা দিতে এসে নিজেও খানিকক্ষণ ভিজলেন। আমি তেমন করে ভেজার সাহস পাচ্ছি না, কারণ মা আমাকে নিতে আসবেন। তিনি যদি দেখেন আমার গা ভেজা তাহলে সব মেয়েদের সামনেই চড় থাপ্পড় মারা শুরু করবেন। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি মা না, বাবা আমাকে নিতে এসেছেন। আমার আনন্দের কোন সীমা রইল না। বাবা বললেন, তোর মা'র শরীর খারাপ। সে আসতে পারল না।

আমি বললাম, ভালই হয়েছে আসতে পারে নি। বাবা আজ আমি সরাসরি বাসায় যাব না, তোমার সঙ্গে রিকশা করে বৃষ্টিতে ঘুরব। বাবা বললেন, আচ্ছা। তাঁর গলা কেমন যেন শুকনো অন্যমনস্ক শুনাল। যেন তিনি কী বলছেন নিজেই জানেন না এবং তাঁর মন ভাল নেই। আমি বললাম, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ ? বাবা বললেন, হুঁ।

'কী হয়েছে, জ্বর ?'

এই বলে আমি তাঁর হাতে হাত রাখলাম। না জ্বর না, শরীর ঠাণ্ডা।

'তোমার ভাল না লাগলে চল বাসায় চলে যাই।'

'বৃষ্টিতে ঘুরতে মন্দ লাগছে না— চল খানিকক্ষণ ঘুরি। তবে শহরের বৃষ্টি হল ভুয়া বৃষ্টি। আসল বৃষ্টি দেখতে হলে গ্রামে যেতে হয়। আইসক্রীম খাবি ?'

'না। বৃষ্টির মধ্যে আইসক্রীম খেলে লোকজন হাসবে।'

'তাহলে চল কোথাও বসে কফি খাই। এক্সপ্রেসো কফি। খাবি ?'

'চল যাই।'

বাবা আমাকে একটা কফি শপে নিয়ে গেলেন। কফি শপটা মনে হয় বাবার চেনা। ম্যানেজার হাসি মুখে বলল, "ভাল আছেন ?" বাবা শুকনো গলায় বললেন, হুঁ।

'এ কে ?'

বাবা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, "আমার মেয়ে।" এটা বলতে গিয়ে তিনি কেন বিব্রত বোধ করছেন তাও বুঝলাম না। কফি শপটা প্রায় ফাঁকা। বাবা কোণার দিকের একটা চেয়ারে আমাকে নিয়ে বসালেন। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়।

'মা আর কিছু খাবি ?'

'না।'

'এরা খুব ভাল বার্গার বানায়। একটা খেয়ে দেখ।'

বাবা আমাকে বসিয়ে রেখে ম্যানেজারের কাছে চলে গেলেন। সেখান থেকে কোথায় জানি টেলিফোন করলেন। আমাকে বার্গার দিয়ে গেছে, সস দিয়ে গেছে। আমি বার্গার খেতে খেতে বাবাকে লক্ষ্য করছি। তাঁর টেলিফোন শেষই হচ্ছে না। মগ ভর্তি কফি দিয়ে গেছে, এখন নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হচ্ছে।

এক সময় টেলিফোন শেষ হল। বাবা কফি শপের ঐ লোকটার কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার সামনের চেয়ারে বসেই বললেন—

রুমালী কী বলছি মন দিয়ে শোন।

বাবার সব কথাই আমি খুব মন দিয়ে শুনি। তারপরেও তিনি আমাকে মন দিয়ে কথা শুনতে বলছেন কেন ? ভয়ংকর কিছু কি ঘটেছে ? মা বেবীটেক্সী এ্যাক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে আছেন ? ভয়ংকর অবস্থা ? তাঁকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। রক্ত দেয়া হচ্ছে। বাবা এই খবরটা আমাকে দিতে পারছেন না বলে কফি খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন ? এতক্ষণ যে টেলিফোনে কথা হল তা নিশ্চয়ই হাসপাতালের কারোর সঙ্গে। তারাও ভাল কোন খবর দিতে পারে নি। হয়ত আরো খারাপ খবর দিয়েছে। নয়তো বাবার মুখ এমন শুকনো হয়ে যাবে কেন ?

'রুমালী!'

'হুঁ।'

'কফিটা কেমন, খেতে ভাল না ?'

'হুঁ।'

'তবে চিনি খুব বেশি। এক্সপ্রেসো কফির এই নিয়ম। চিনি বেশি দিতে হয়।'

'হুঁ।'

বাবা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন—রুমালী মা শোন, আমি একটা ভয়ংকর অন্যায় করে ফেলেছি। মানুষ যখন বড় ধরনের কোন অন্যায় করে তখন সে বুঝতে পারে না যে সে অন্যায় করছে। বুঝতে পারলে অন্যায়টা সে করতে পারত না। তখন তার কাছে অন্যায়টাকে ন্যায় মনে হয়। যখন সে অন্যায়টাকে অন্যায় বলে মনে করে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, তুমি কী অন্যায় করেছ ?

বাবা প্রায় বিড়বিড় করে বললেন, আমি আমার অফিসের একজন কলিগকে বিয়ে করে ফেলেছি। তার নাম ইসমত আরা। ব্যাপারটা কীভাবে কীভাবে যেন ঘটে গেছে।

'বিয়ে কবে করেছ ?'

'প্রায় তিন মাসের মত হয়েছে। তোর মা'কে এখনো কিছু বলি নি। কীভাবে বলব তাও বুঝতে পারছি না। তোকেই প্রথম বললাম।'

'আমি কি মা'কে বলব ?'

'না তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব। কীভাবে বলব সেটাই ভাবছি।'

আমি খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কফির মগে চুমুক দিচ্ছি। বাবার হয়তো ধারণা হল— তিনি কী বলছেন তা আমি বুঝতেই পারি নি। বুঝতে না পারারই কথা, আমার বয়স তখন মাত্র এগারো, ক্লাস ফাইভে উঠেছি।

বাসায় ফেরার পথে বাবা কী মনে করে জানি দশটাকা দিয়ে একগাদা কদম ফুল কিনলেন। কদম ফুলতো আর গোলাপ বা রজনীগন্ধার মত দামী ফুল না। সস্তা ধরনের ফুল। টোকাইরা নিজেদের খেলার জন্যে গাছ থেকে পেড়ে আনে। কেউ সেই ফুল কিনতে চাইলে তারা যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি আনন্দিতও হয়। দু'টা ফুল চাইলে দশটা দিয়ে দেয়।

মা কদমফুল দেখে খুবই আনন্দিত হলেন তবে চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বললেন, কী যে তোমার কাণ্ড। গন্ধ নেই, কিছু নেই এক গাদা ফুল নিয়ে এলে। জঞ্জাল দিয়ে ঘর ভরতি। কোন মানে হয় ? তাও যদি ঘরে কোন ফুলদানী থাকত। এই ফুল আমি রাখব কোথায়, বালতিতে ?

মা সেই জঞ্জাল গভীর আনন্দের সঙ্গে সাজিয়ে রাখলেন। এক ফাঁকে নিচু গলায় আমাকে বললেন, তোর বাবার এই এক বিশ্রী স্বভাব। ভাল ফুলটুল কিছু দেখলেই আমার জন্যে নিয়ে আসবে। আমি কি দেবী না-কি যে আমাকে ফুল দিয়ে অর্চনা করতে হবে ?

ভালবেসে করে। আমি কখনো প্রশ্রয় দেই না। ভাব দেখাই যে রাগ করেছি। মা আনন্দের হাসি হাসছেন। তিনি জানতেও পারছেন না যে তাঁর জীবনে ভয়াবহ ধ্বস নেমে গেছে।'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' তার জন্যে কেউ আর কোন দিন আনবে না।

মা ব্যাপারটা জানতে পারেন আমার জানার দু'মাস পর। এই দু'মাসে আমি মা'কে কিছুই বলি নি। বাবাকেও না। আমি আমার নিজের মনে ক্লাস করেছি, গল্পের বই পড়েছি, ডাইরি লিখেছি। কে জানে আমি হয়ত খুব অদ্ভুত একটা মেয়ে।

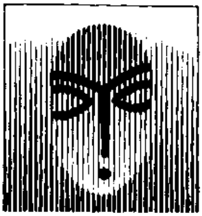

কী সুন্দর ঝকঝকে সকাল !

অঞ্চলটাকে যেন আগের রাতে সাবান দিয়ে মাজা হয়েছে। চকচক করছে চারদিক। চারদিক থেকে সবুজ আভা বের হচ্ছে। কেউ যেন প্রতিটি গাছের পাতার আড়ালে সবুজ বাতি জ্বেলে দিয়েছে। আমি একতলায় নেমে দেখি— কেমন উৎসব উৎসব ভাব। সবাই এক সঙ্গে কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে বলে মনে হল না। সেলিম ভাই শুধু এক কোণায় একা একা বসে আছেন। মনে হচ্ছে তাঁর মন খুব খারাপ। তিনি আমাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়ে কেমন শক্ত হয়ে গেলেন। ডিরেক্টর সাহেব বা তাঁর স্ত্রী কাউকেই দেখলাম না। তাঁরা বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠেন নি। উনার স্ত্রীকে দেখার শখ ছিল।

মা খুব উৎসাহের সঙ্গে মওলানা সাহেবের সঙ্গে গল্প করছেন। মা'র মুখ হাসি হাসি। হাদিস কোরানের গল্প শুনে মা'র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হবার কথা না। নিশ্চয়ই অন্য কোন গল্প। মওলানা সাহেবের কান্ড কারখানাও অদ্ভুত— দিব্যি সিনেমার দলের সঙ্গে মিশে গেছেন। সকালবেলাতেই উপস্থিত। মা আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন।

'বকুল তোর ঘুম ভেঙেছে ?'

' না ভাঙ্গে নি। এখনো ঘুমুচ্ছি। ঘুমুতে ঘুমুতে নীচে নেমে এসে, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

'সব সময় বাঁকা কথা বলিস কেন ? মাঝে মাঝে সোজা কথা বললে কী হয় ?

' ভাল হয়।'

'এখন ক'টা বাজে জানিস ? দশটা।'

'তাই না-কি !'

'আজ নাশতা ছিল তেহারী। এক একজন দুই প্লেট তিন প্লেট করে খেয়ে নাশতা সর্ট ফেলে দিয়েছে। তোরটা আমি আলাদা করে রেখেছি। দাঁড়া গরম করে দিতে বলি।'

'তোমাকে এমন খুশি খুশি লাগছে কেন মা ?'

'খুশির তুই কী দেখলি ?'

মা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেন। তার আদরের কন্যার নাশতা যেন মিস না হয়। মওলানা সাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আচ্ছা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারেই কি তাঁর আগ্রহ ? আমি তাঁকে খুব কম সময়ই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। সব সময় লক্ষ্য করেছি তিনি মেয়েদের আশেপাশেই আছেন এবং গুট গুট করে মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলছেন।

'আম্মা কেমন আছেন ?'

'জ্বি ভাল আছি। আপনি ভাল ?'

'আল্লাহপাকের অসীম রহমতে ভাল আছি।'

'আপনি দেখি একেবারে সিনেমার লোক হয়ে গেছেন।'

'সবই আম্মা আল্লাহপাকের হুকুম। স্যার আমাকে চাকরি দিয়েছেন। মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা। আমার জন্য যথেষ্ট। চণ্ডিগড় স্কুলে বেতন ছিল বার শ। হাতে পেতাম ছয় শ। তাও সব মাসে না।'

'আপনার জন্যেতো ভালই হল। তবে মওলানা মানুষ হয়ে সিনেমার লাইনে চাকরি এইটাই যা কথা।'

'যে কোন কাজই আম্মা সৎ ভাবে সৎ নিয়তে করা যায়। আল্লাহপাক নিয়তটা দেখেন। আর কিছু দেখেন না।'

'তা যায়। আপনার কাজটা কী ?'

'স্যার এখনো কিছু বলেন নাই। স্যারের সঙ্গে এইটা নিয়েই কথা বলতে এসেছি। শুনলাম স্যারের শরীর ভাল না। জ্বর এসেছে। জ্বর আসারই কথা কাল যে ভিজা ভিজেছেন। আম্মা আপনার জ্বর আসে নিতো ?'

'জ্বি না।'

'আলহামদুলিল্লাহ্।'

মা প্লেটে করে তেহারী এবং চামচ নিয়ে এসেছেন। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয় মুখে তুলে খাইয়ে দেবেন। লোকজনের সামনে মা খানিকটা আহ্লাদী হয়ে যান। মেয়েকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়ে তিনি প্রমান করার চেষ্টা করবেন যে তাঁর মেয়ে অন্তপ্রাণ। আমি মা'র হাত থেকে প্লেট নিয়ে নিলাম।

'বকুল আস্তে আস্তে খা। কেয়ামতকে বলেছি শুকনা মরিচ ভেজে দিতে। পেয়াজ আর শুকনা মরিচ ভাজা মাখিয়ে খেয়ে দেখ খুব ভাল লাগবে।'

'আমার এম্নিতেই ভাল লাগছে।'

মা খুশি খুশি গলায় বললেন, কেয়ামত আসলেই ভাল রাঁধে, আমি তিন প্লেট খেয়ে ফেলেছি।

'সেকী ?'

'কেউ বুঝতে পারে নি যে তিন প্লেট খেয়েছি।'

'বুঝতে পারলেই বা কী—তুমি দু' নম্বর নায়িকার মা, তুমি তিন প্লেট খাবে নাতো কে খাবে ?'

'সব সময় ফাজলামি করবি না বকু। নাশতা খেয়ে মঈন ভাইকে দেখে আয়।'

'উনার আবার কী হয়েছে ?'

'খুব জ্বর। কাল বৃষ্টিতে ভিজেছেনতো। পায়ে আবার কাঁটাও ফুটেছে। আমি গিয়ে দেখে এসেছি।'

'তাঁর স্ত্রীর কী অবস্থা মা, স্বামীর সেবাযত্ন করছেন ?'

'সেজে কুল পায় না স্বামীর সেবা করবে কী ! সকাল বেলাতেই লিপস্টিক-টিপস্টিক দিয়ে পরী সেজে বসে আছে। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'আমার কথা জিজ্ঞেস করবে কেন ? আমার কথা তাঁকে কে বলেছে ?'

'বলতে হবে কেন ? তুই ছবির নায়িকা তোকে চিনবে না ? বকু শোন, মঈন ভাইয়ের ঘরে যাবার আগে সেজে গুজে ফিট ফাট হয়ে যাবি। আউলা ঝাউলা অবস্থায় যাবি না।'

'গেলে ক্ষতি কী ?'

'ভদ্রমহিলা তোকে প্রথম দেখবেন। ফাস্ট ইমপ্রেশনের একটা গুরুত্ব আছে না ? কথায় বলে না, পহেলা দর্শনধারী তারপরে গুনবিচারি।'

আমি নাশতা শেষ করলাম। পর পর দু'কাপ চা খেলাম। ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টালাম, চুল বাঁধলাম। ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে কিন্তু গেলাম না। একা একা হাঁটতে বের হলাম। আজ আমি সারাদিন হাঁটব। দুপুরে ফিরব না। গেটের কাছে এসে এক ঝলকের জন্যে পেছন দিকে ফিরলাম। মা আমার পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা দেখছেন কি-না জানা দরকার। মা'কে দেখলাম না— অন্য একজনকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ইনিই কি নীরা ? আমি এত সুন্দর মানুষ আমার জীবনে দেখি নি। লম্বা ছিপছিপে একজন তরুণী। মাথা ভর্তি কোকড়ানো চুল। হালকা হলুদ রঙের শাড়িতে তাঁকে অবিকল হলুদ

পাখির মত লাগছে। তিনি হাত ইশারায় আমাকে থামতে বললেন। তিনি ইশারা না করলেও আমি থামতাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি— তিনি এগিয়ে আসছেন। হাঁটার ভঙ্গিটাও অন্য রকম। প্রাচীন কালের রাজকন্যারা কি এমন করে হাঁটতেন ? যেন বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে আসছেন।

'তুমি রুমালী না ?'

'জ্বি।'

'কী অদ্ভুত নাম— রুমালী।'

'আপনার মেয়ের নামওতো খুব অদ্ভুত— এন্টেনা।'

'ওর নাম কিন্তু আসলে এরিয়েল। ওর বাবা রেখেছিলো। যে নৌকায় করে কবি শেলী সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিলেন সেই নৌকাটার নাম ছিল এরিয়েল। এ রকম অপয়া নামতো রাখা যায় না কাজেই এরিয়েল বদলে কাছা কাছি একটা নাম রাখলাম— এন্টেনা।'

কী সহজ ভঙ্গিতেই-না মহিলা কথা বলছেন— যেন আমার সঙ্গে তাঁর কতদিনের পরিচয়। পুরানো দুই অসম বয়সের বান্ধবী একসঙ্গে গল্প করছি।

'তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

'একটু হাঁটব।'

'আশেপাশের লোকজনদের বাড়িঘরে গিয়েছ ?'

'জ্বি না একটা বাড়িতেই শুধু গিয়েছি। সেই বাড়িতে অনেক গাছ আছে। বিরাট একটা পুকুরও আছে।'

'ঐ বাড়িতেই কি যাচ্ছ ?'

'এখনো ঠিক করি নি। যেতে পারি।'

'আমি যদি সঙ্গে যাই— তোমার কি আপত্তি আছে ?'

'ছিঃ ছিঃ কী বলেন— আপত্তি থাকবে কেন ? আপনি সঙ্গে গেলে আমার খুব ভাল লাগবে। এন্টেনাকে সঙ্গে নেবেন না ?'

'না ও থাকুক। ও গল্প করুক তার বাবার সঙ্গে। চল আমরা দু'জন যাই।'

আমরা পথে নামলাম। আমি আরেকবার পেছন দিকে তাকালাম। দলের সবই তাকিয়ে আছে। যেন বিরাট কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সেই ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছি আমরা দু'জন। বাকি সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। এটা যদি সিনেমার কোন দৃশ্য হত তাহলে ক্যামেরা আমাদের মুখ থেকে প্যান করে অপেক্ষমান ইউনিটের লোকজনদের মুখে পড়ত। তখন সাসপেন্স জাতীয় আবহ সংগীত হত।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'অভিনয় করতে কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'সবার কাছেই শুনেছি তুমি না-কি অসম্ভব ভাল অভিনয় কর।'

'আমি বুঝতে পারি না।'

'মঈন তোমার অভিনয়ের প্রশংসা করছিল। আমি অবশ্যি সব সময় ওর প্রশংসাকে গুরুত্ব দেই না। ওর রুচির সঙ্গে আমার রুচি প্রায়ই মেলে না। মঈনকে ডিরেক্টর হিসেবে তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল?'

'খুব ভাল। অবশ্যি আমি ডিরেক্টরতো বেশি দেখি নি।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব সাবধানে কথা বলার চেষ্টা করছ। বি ইজি। সহজ হয়ে কথা বল। মানুষ হিসেবে মঈন কেমন?'

'তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই নি।'

নীরা হেসে ফেললেন। সুন্দর সরল হাসি। শুরু থেকেই আমি সাবধান ছিলাম। এখন আরো সাবধান হয়ে গেলাম। নীরা খুব সহজ মেয়ে না। মনের দরজা জানালা বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। আবার মনের দরজা জানালা খোলা রেখেও কথা বলা যাবে না।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'তুমি তার সঙ্গে ভাল মত মেশার সুযোগ পাও নি কথাটা কি ঠিক বললে? তুমিতো ভালই সুযোগ পেয়েছ। তুমি নিজে সুযোগ তৈরি করে নিয়েছ।'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

তিনি শান্ত গলায় বললেন, তোমরা কাশবনের শুটিং করতে গেলে। বৃষ্টি নামল। মঈন তার স্বভাবমত বৃষ্টিতে রওনা হল। অসম্ভব বৃষ্টি প্রীতির কারণে যে সে কাজটা করল তা কিন্তু না। তার মধ্যে প্রচুর লোক দেখানোর ব্যাপার আছে। তাকে দেখাতে হবে যে সে আর দশজনের মত না। সে আলাদা। বুঝতে পারছ কী বলছি?

'জ্বি।'

'সে বৃষ্টিতে নেমে গেল, ভিজতে ভিজতে ক্যাম্পে ফিরবে এই হল তার পরিকল্পনা। সে কি তোমাকে বলেছিল, এসো আমার সঙ্গে। আমরা দু'জন এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরি। বলেছিল ?'

'জ্বি না।'

'কিন্তু তুমি তার সঙ্গে চলে এলে। কাজটা কি তুমি নিজের ইচ্ছেয় করলে ?'

'জ্বি।'

নীরা আবারো আগের ভঙ্গিতে হাসলেন। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমাকে উনি অতল জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজটা করছেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তাঁর গলায় কোন রাগ নেই। তিনি ছোট ছোট পায়ে হাঁটছেন। একবার দাঁড়াচ্ছেনও না।

'রুমালী।'

'জ্বি।'

'তোমার ধারণা তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে তার সঙ্গে রওনা হয়েছ। এই ধারণা ঠিক না। তুমি নিজের ইচ্ছায় আস নি। সে তোমাকে আসতে বাধ্য করেছে। সে পরিস্থিতি এমন ভাবে তৈরি করেছে যে তোমার এ-ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না।'

'আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি। কাশবনের ওখানে আর কোন মেয়ে ছিল না। আমি একা ছিলাম। যারা ছিলেন তাদের কারো সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। একা থাকতে আমার ভয় ভয় লাগছিল।'

'তুমি কাউন্টার আর্গুমেন্ট ভাল দাঁড় করিয়েছ। মঈনের সঙ্গে ঝড় এবং বৃষ্টিতে হাত ধরাধরি করে আসতে তোমার কি ভাল লাগছিল ?'

'ভাল লাগছিল তবে আমরা হাত ধরাধরি করে আসি নি। আপনি কোথাও একটা ভুল করছেন। আমি উনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। এর বেশি কিছু না।'

'তুমি তার প্রেমে পড় নি ?'

'আপনি খুবই অদ্ভুত কথা বলছেন।'

'আমি মোটেই অদ্ভুত কথা বলছি না। তুমি অদ্ভুত কথা বলছ। তুমি খুব বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। বেশি বুদ্ধিমতী মেয়েদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে— তারা অন্যের বুদ্ধি খাটো করে দেখে। তারা সব সময় ভাবে পুরো পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে। সব সময় তা হয় না। খুব বুদ্ধিমানরাই বড় ধরনের বোকামি করে। তুমি একটা বড় ধরনের বোকামি করেছ।'

'কোন বোকামি ?'

'এসো ঐ ছাতিম গাছটার নীচে বসি। বসে গল্প করি। হেঁটে টায়ার্ড হয়ে গেছি। মাথায় রোদও লাগছে। ছাতা নিয়ে আসা দরকার ছিল। আমার চায়ের পিপাসা হচ্ছে। তোমার কি হচ্ছে?'

'জ্বি।'

'খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেয়ে তারপর চা খেতে পারলে ভাল হত। তাই না?'

'জ্বি।'

'ঠাণ্ডা পানি এবং চা এখনই চলে আসবে।'

আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। নীরা হাসি মুখে বললেন, আমি কোন ভবিষ্যৎ বাণী করছি না। ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা আমার নেই। তোমার সঙ্গে রওনা হবার আগে আমি সোহরাবকে বলে এসেছি যে ছাতিম গাছের নীচে আমি রুমালী মেয়েটিকে নিয়ে বসব তার সঙ্গে গল্প করব। তুমি ঠাণ্ডা পানি এবং চা পাঠাবে।'

আমি চুপ করে আছি। ভদ্রমহিলা আমাকে ভালই চমকে দিয়েছেন। তিনি এগুচ্ছেন তাঁর পরিকল্পনা মত। কী করবেন, কী বলবেন সবই মনে হয় ঠিক করা। আমার সঙ্গে যখন বের হয়েছেন তখন বুঝতেই পারি নি তিনি পুরো ব্যাপারটা ছকে ফেলে রেখেছেন। আমরা গাছের নীচে বসে আছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি সোহরাব চাচা আসছেন। তাঁর কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। সেই ব্যাগে নিশ্চয়ই ফ্লাস্কভর্তি বরফ শীতল পানি। এবং অন্য ফ্লাস্কে চা। সুন্দর চায়ের কাপ। চিনির পটে চিনি। কয়েকটা নোনতা বিসকিটও থাকতে পারে।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'মঈনের চরিত্রের কোন দিকটি তোমাকে আকর্ষণ করেছে?'

'আমি সেই ভাবে কখনো বিচার করতে চেষ্টা করি নি।'

'যাকে তুমি এত পছন্দ কর তাকে তুমি নানান ভাবে বোঝার চেষ্টা করবে না? পছন্দের পেছনের কারণগুলি দেখবে না?'

আমি কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম। নীরা হালকা গলায় বললেন, ওর সবচে ভাল দিক হচ্ছে ওর ছেলেমানুষী। একটা বাচ্চা ছেলে ওর ভেতর বাস করে। বাচ্চারা কী করে জান? ওদের কিছু খেলনা থাকে। প্রিয়জনদের দেখা পেলেই সে তার খেলনাগুলি বের করে দেখায়। নিজের খেলনায় সে মুগ্ধ হয়ে থাকে এবং চেষ্টা করে অন্যদের মুগ্ধ করতে। তোমাকে করে নি?

'কী খেলনার কথা বলছেন?'

'তার খেলনার বেশির ভাগই হচ্ছে গল্প। যেমন ধর তিনটা পিঁপড়ার গল্প। একজনের পেছনে একজন যাচ্ছে। এই গল্পটি তোমাকে বলে নি ?'

'বলেছেন।'

'একটা পিঁপড়া এবং হাতির গল্প— এই গল্পটি করেছে ?'

'জ্বি।'

'যখের গল্প করেছে ? যখ নিয়ে সে ছবি বানাতে চায় এই গল্প ?'

'জ্বি করেছেন।'

'এইসব হচ্ছে তার খেলনা। আশে পাশের মানুষদের মুগ্ধ করার জন্যে এই খেলনা সে ঝুমঝুমির মত বাজায় এবং সবাই মুগ্ধ হয়। এক সময় আমিও হয়েছিলাম।'

'আপনার মুগ্ধতা কি কেটে গেছে ?'

'মুগ্ধতা কেটে গেছে। মুগ্ধতার জায়গায় এখন যা আছে তার নাম করুণা। আমি তার প্রতি প্রবল করুণা বোধ করি। ও সেটা জানে। অন্যের ভালবাসা যেমন টের পাওয়া যায়, করুণাও টের পাওয়া যায়। অবশ্যি মঈন তেমন বুদ্ধিমান নয়। বুদ্ধিমান নয় বলেই কী পরিমাণ করুণা তাকে করি তা সে বুঝতে পারে না। ওর যে বুদ্ধি কম তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ ?'

'যারা নিজের কাজে ডুবে থাকে বাইরে থেকে তাদের বোকা মনে হয়।'

'মনে হচ্ছে তুমি তাকে বোকা বলতে রাজি নও।'

সোহরাব চাচা পানি এবং চা নিয়ে এসেছেন। দৌড়ে এসেছেন বলে তিনি হাঁপাচ্ছেন। নীরা বললেন, তোমার স্যারের ঘুম ভেঙ্গেছে ?

'জ্বি।'

'কী করছে ?'

'কিছু করছেন না, শুয়ে আছেন। স্যারের জ্বর মনে হয় বেড়েছে। একজন ডাক্তার আনতে যাব।'

'যাও ডাক্তার নিয়ে এসো। চা ঢালতে হবে না আমরা ঢেলে নেব।'

সোহরাব চাচা চলে গেলেন। নীরা চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, তুমি আমাকে ভয় পেও না। আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বল। আমি ভয়ঙ্কর কেউ না। আমি ভাল মেয়ে। কী পরিমাণ ভাল মেয়ে তা তুমি জান না।

আমি বললাম, আমি সহজ হতে পারছি না। আমার নিজেকে একজন আসামীর মত মনে হচ্ছে। যেন আমি কোন ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছি। আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো হয়েছে। আর আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন।'

'তুমি কোন অপরাধ কর নি ?'

'জ্বি না।'

'আমার নিজের ধারণা তুমি ভয়ংকর একটা অপরাধ করেছ। ঝড় বৃষ্টিতে তোমরা দৌড়ে একটা স্কুল ঘরে আশ্রয় নিলে। তাই না ?'

'জ্বি।'

'কতক্ষণ ছিলে সেখানে ?'

'খুব অল্প সময় ছিলাম। মওলানা সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খুঁজে পেলেন।'

নীরা হাসি মুখে বললেন, আচ্ছা মওলানা সাহেব যদি আরেকটু দেরি করে আসতেন তাহলে কী হত ?

আমি চুপ করে আছি। তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। তিনি চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। দূর থেকে দেখে যে কেউ বলবে আমরা দু'জন চা খেতে খেতে মজা করে গল্প করছি।

'তুমি কি তার হাত ধরতে ? কিংবা আরো কিছু ? চুপ করে আছ কেন ? চা খাও। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। চা-টা ভাল হয়েছে। তাই না ?'

'জ্বি।'

'সিলেটে আমার চাচার একটা চায়ের বাগান আছে। সেই বাগানের চা। কী সুন্দর ফ্লেভার। রুমালী ?'

'জ্বি।'

'শুনেছি তুমি খুব ভাল গান জান।'

'গান গাইতে পারি। ভাল কি-না জানি না।'

'শুনাও, একটা গান শুনাও।'

আলোচনা কি অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে ? মোড় নিলেও লাভ হবে না, তিনি আবারো মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসবেন। এটা সাময়িক বিরতি। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কী ধরনের গান শুনতে চান ?

'এরকম ভাবে বলছ যেন সব ধরনের গানই তুমি জান। "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না"। এটা জান ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে তোমার ইচ্ছামত একটা গান কর।'

আমি দেরি করলাম না, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম—

Down the way
Where the nights are gay
I took a trip
On a sailing ship
And when I reached Jamica I made a stop.

আমি গান করছি, নীরা তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। এখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। চারদিক কী অপূর্ব সুন্দর। আকাশ ঘন নীল। আমার গান গাইতে ভাল লাগছে।

এই গানের যদি অনেকগুলি অন্তরা থাকত খুব ভাল হত। আমি গেয়ে যেতাম গান ফুরতো না। আমি আপন মনে গাইছি। একবারও নীরার দিকে তাকাচ্ছি না। না তাকিয়েও বুঝতে পারছি— তিনিও আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। না দেখেও আমি বলতে পারি কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে কি তাকাচ্ছে না।

এক সময় গান শেষ হল, আমি নীরার দিকে তকিয়ে হাসলাম। উনি এখন কী করবেন ? আমাকে কি বলবেন, চল ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া যাক। না-কি পুরানো প্রসঙ্গ আবার শুরু করবেন। মহামান্য আদালত একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকবেন। নানান দিক থেকে আক্রমণ করে দুর্গে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবেন। নীরা যত বুদ্ধিমতীই হোন না কেন— আমার দুর্গে ফাটল ধরাতে পারবেন না। ইট-কাঠ-লোহার দুর্গে ফাটল ধরানো যায়— ভালবাসার দুর্গে ফাটল ধরানো যায় না।

'রুমালী !'

'জ্বি।'

'তোমার গানের গলা ভাল।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'শুধু ভাল বলে ভুল করেছি—খুবই ভাল। তুমি কি মঈনকে তোমার গান শুনিয়েছ ?'

'জ্বি না।'

'শোনাও নি কেন ? সে যেমন তোমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে, তুমিও করবে। সেটাই নিয়ম।'

'উনি শুনতে চান নি।'

'কেউ শুনতে না চাইলে তুমি গান শোনাও না ?'

'জ্বি না। কথা নেই, বার্তা নেই আমি হুট করে গান শুরু করব কেন ? এইসবতো শুধু সিনেমাতেই হয়।'

'তুমিতো সিনেমা করতেই এসেছ!'

নীরা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কথার পিঠে কথা জুড়ে তিনি এগুচ্ছেন। আমার ক্লান্তি লাগছে। আমি কি তাঁকে বলব— কথা কথা খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে না। অন্য কোন খেলা খেলতে চাইলে বলুন। পশু-পাখি-ফুল-ফল খেলা খেলবেন ? আসুন আমরা পশু-প্যাখি-ফুল-ফল খেলা খেলি।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'মঈনের সঙ্গে আমার বিয়ে কী ভাবে হল এই গল্প কি শুনবে ? খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। শুনলে তোমার ভাল লাগবে।'

'বলুন শুনব।'

নীরা ফ্লাস্ক থেকে আবারো চা নিলেন। তাঁর চা খাবার ব্যাপারটা মজার। ফ্লাস্ক থেকে অল্প অল্প চা কাপে ঢালেন। কাপ শেষ হয় আবারো নেন। তিনি হালকা গলায় বললেন, আমাদের বিয়ে কিন্তু প্রেমের বিয়ে নয়। আমাদের হচ্ছে এরেন্‌জ্‌ড ম্যারেজ। তবে এই এরেন্‌জ্‌মেন্টের ব্যাপারটি আমার করা। এরেন্‌জ্‌ড ম্যারেজে সাধারণত বর কনের কোন ভূমিকা থাকে না। তাদের আত্মীয় স্বজনরাই সব ব্যবস্থা করেন। আমার বিয়ের বেলায় সব ব্যবস্থা আমিই করেছি। আমি বাবাকে গিয়ে বলেছি, বাবা মঈন নামের এই ছেলেটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। বাবা তখন কফি খাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি এতই চমকালেন যে তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা পড়ে গেল। কার্পেটে কফির দাগ লেগে গেল। সেই দাগ এখনো আছে। তুমি যদি কখনো আমাদের বাড়িতে যাও তোমাকে দেখাব। গল্পের ভূমিকাটা কেমন ?

'জ্বি ভাল।'

'আমি যখন আমাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে বেড়াতে যাই— তখন একবার হলেও বসার ঘরে যাই। কফির দাগ ভরা কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে থাকি— আমার খুব মজা লাগে। আচ্ছা এখন গল্পটা শোন।'

'জ্বি শুনছি।'

'মঈন তখন সবে মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে। চাকরি বাকরির চেষ্টা করছে— পাচ্ছে না। খুবই দুরবস্থা। সব সময় দু'বেলা ভাত খাবার মত টাকাও থাকে না। কোনো কাজে যখন কারো বাসায় যায়— দুপুর বেলায় ভাত খাবার সময়ে যায়। তারা যদি ভদ্রতা করেও একবার বলে— ভাত খেয়ে যাও, সে দেরি করে না, সঙ্গে সঙ্গে বলে— জ্বি আচ্ছা। কোথায় হাত ধোব ? এই হল তার অবস্থা।'

নীরা খিলখিল করে হাসছেন। সহজ সরল হাসি। গল্পটা বলতে পেয়ে তাঁর খুব ভাল লাগছে তা বুঝতে পারছি। তিনি যে তাঁর বিয়ের গল্প করবেন, এটিও কি তাঁর পরিকল্পনায় ছিল ? গল্পটা হবে ঈশপের গল্পের মত। গল্পের শেষে আমার জন্যে ছোট্ট উপদেশ থাকবে।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'তারপর শোন— মঈনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে দেখে বোঝার কোন উপায় কিন্তু ছিল না। কাপড় চোপড়ে সে সব সময় খুব ফিটফাট। নিজেকে মানুষের সামনে সুন্দর করে উপস্থিত করার একটা ব্যাপার তার মধ্যে সব সময় ছিল। এখনো আছে। কী আছে না ?'

'জ্বি আছে।'

'এক দিন সকালের কথা। ছুটির দিন— বাবা বাসায় আছেন। খুবই আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর মেজাজ ভাল। বাসায় যখন থাকেন তাঁর মেজাজ ভাল থাকে না। অকারণে হৈ চৈ করেন। সেই দিন তিনি হাসিমুখে আমার সঙ্গে গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু হল জনৈক পীর সাহেবের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। সেই পীর মানুষকে দেখা মাত্র তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব হড় হড় করে বলে দিতে পারে। সে বাবার অফিসে এসেছিল। বাবা তার ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। আমার কোথায় বিয়ে হবে, কবে হবে এইসব সে বাবাকে বলেছে। বাবা খুব আগ্রহ করে পীর সাহেবের কথা বলছেন— আমি খুব মুগ্ধ হয়ে শোনার অভিনয় করে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান এসে বলল— একটা ছেলে দেখা করতে চায়। পাঁচ মিনিট কথা বলবে। নাম মঈন।

এইসব ক্ষেত্রে বাবার জবাব হচ্ছে—'না'। বাড়িতে তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে— অফিসে দেখা করতে হবে। সেই

দেখা হবার ব্যাপারটাও খুব সহজ না। বাবার পি.এ. প্রথম কথা টথা বলে দেখবে ঘটনা কী। সে যদি মনে করে এপয়েন্টমেন্ট দেয়া যায়— তাহলে হবে। সেটাও বেশ জটিল পদ্ধতি। ঐযে তোমাকে বললাম, বাবার মেজাজটা ছিল ভাল, ভাল মেজাজের কারণে তিনি বলে ফেললেন আসতে বল।

মঈন এসে ঢুকল। ঝকঝকে চেহারার যুবক। হাসি খুশি ভঙ্গি। জড়তা তেমন নেই। অপরিচিত একটা বাড়ির বিশাল ড্রয়িং রুমে সে ঢুকেছে তা নিয়ে তার সামান্যতম সংকোচও নেই। অপরিচিতা রূপবতী তরুণীর সামনে স্বাভাবিক কারণেই ছেলেদের কিছু সংকোচ থাকার কথা— তাও নেই। সে ঘরে ঢুকেই আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে। সেই হাসির মানে হচ্ছে— কী ভাল আছেন?

বাবা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, কী ব্যাপার?

মঈন বলল, স্যার আমি আপনার দশ মিনিট সময় নেব। ঘড়ি দেখে দশ মিনিট। এর বেশি এক সেকেন্ডও না।

বাবা বললেন, তুমি দারোয়ানকে বলেছ পাঁচ মিনিট। এখন দশ মিনিট বলছ কেন?

'স্যার— আমি আপনাকে একটা গল্প বলব। গল্পটা বলতে সাত মিনিট লাগবে। গল্পের শেষে তিন মিনিটে আমার বক্তব্য বলব। আমি আপনার কাছে কোন চাকরির জন্যে আসি নি। বা ভিক্ষা করতেও আসি নি। দয়া করে দশটা মিনিট সময় দিন।'

বাবা বললেন, বোস। দশ মিনিট অনেক দীর্ঘ সময়। তোমার যা বলার পাঁচ মিনিটে বলে শেষ কর। আমি জরুরি কিছু কাজ করছি।

মঈন তার গল্প শুরু করল। কোন গল্প জান? তার বিখ্যাত যখের গল্প। বাবা ভুরু কুঁচকে গল্প শুনছেন। বাবা পীর ফকির ছাড়া কোন কিছুতেই বিস্মিত হন না। গল্প শুনে বিস্মিত হচ্ছেন না। এমন উদ্ভট গল্প ছেলেটি কেন বলছে তা বের করার চেষ্টা করছেন। আমি অবাক হয়েই গল্প শুনছি। গল্প শেষ হল। বাবা ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, তুমি এই গল্প আমাকে কেন বলছ?

মঈন বলল, গল্পটি নিয়ে আমি একটা ছবি বানাতে চাই। থার্টি ফাইভ মিলিমিটারে ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম্। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

বাবা দীর্ঘ সময় মঈনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবনে এমন অদ্ভুত প্রস্তাবের মুখোমুখি তিনি সম্ভবত হন নি। মঈন বলল, আপনারতো নানান ধরনের ব্যবসা আছে। ব্যবসায় টাকা খাটাচ্ছেন— ছবির ব্যবসা করে দেখুন। আপনি

চাইলে আমি চিত্রনাট্য দিয়ে যাব। আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন— খুব সুন্দর গল্প। ভাল মত বানাতে পারলে অপূর্ব হবে। এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমি ছবিটা খুব ভাল বানাব। ছবির ব্যবসায় আপনার হয়ত লাভ হবে না। ক্ষতিই হবে তবে দেশ একটা ভাল জিনিস পাবে। সামান্য আর্থিক ক্ষতি আপনার গায়ে লাগবে না।

বাবা বললেন— এই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে তুমি কি শুধুই আমার কাছে এসেছ না আরো অনেকের কাছে গিয়েছ ?

'অনেকের কাছে যাই নি। কয়েকজনের কাছে গিয়েছি। বিত্তবানদের বাড়িতে চট করে ঢোকা যায় না। আর যদিও বা ঢোকা যায় তাঁরা কিছু শুনতে চান না।'

বাবা বললেন, আমি শুনলাম। তুমি দশ মিনিট সময় চেয়েছিলে— আমি এগারো মিনিট দিলাম। এখন তুমি যেতে পার।

'চলে যাব ?'

'অবশ্যই চলে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার প্রফেশন কি ছবি বানানো ?'

'জ্বি না— এখন পর্যন্ত কোন ছবি বানাই নি। তবে ছবি বানানোর খুব শখ।'

'পড়াশোনা কী ?'

'আমি দু'বছর আগে ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করেছি।'

'চাকরি-বাকরি করছ ?'

'জ্বি না। কোথাও কিছু পাচ্ছি না।'

'বিয়ে করেছ ?'

'জ্বি না।'

'আমার একটা উপদেশ শোন। ছবির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা কর। রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে আমি রেফারেন্স দিতে পারি। এখন তুমি যেতে পার।'

মঈন উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, চা খেয়ে যান।

মঈন সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। যেন এই কথাটার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। আমি চা এনে দিলাম। উটকো গেস্টদের জন্যে চায়ের সঙ্গে বাসি চানাচুর দেয়া হয়। তাই দেয়া হল।

বেচারা খুব আগ্রহ করে পিরিচের সব চানাচুর খেয়ে ফেলল। তার খাওয়া দেখে মনে হল সে খুবই ক্ষুধার্ত। আমার এত মায়া লাগল যে বলার না। আমি বললাম, আপনি কি আর কিছু খাবেন ? কেক আছে ? কেক দেব ? মঈন বলল, জ্বি আচ্ছা দিন।

আমি কেক এনে দিলাম। এবং সেদিন বিকেলেই বাবাকে বললাম— বাবা তুমিতো আমাকে কোথায় বিয়ে দেবে এই নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করছ। এমন কী পীর ফকির পর্যন্ত ধরছ। তোমাকে একটা কথা বলি— মঈন নামের এই মানুষটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বাবার হাত থেকে কফির কাপ পড়ে গেল। এই হল গল্প। গল্প কেমন লাগল ?

'ভাল।'

'তোমার কাছে কি গল্পটা সিনেমেটিক মনে হয় নি ?'

'জ্বি না।'

নীরা হাসতে হাসতে বললেন, সিনেমেটিকতো বটেই। একদিকে সহায় সম্বলহীন যুবক। অন্যদিকে বড়লোকের আদরের দুলালী। হিন্দী সিনেমার সঙ্গে খুব মিল। তবে একটা অমিল ছিল— হিন্দী সিনেমায় এইসব ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা মা বেঁকে বসেন। বাবা রেগে আগুন হয়ে নিজ খান্দান নিয়ে অনেক কথা বলেন। মেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে করুণ গান শুরু করে। আমার বেলায় সে সব কিছু হয় নি। বাবা কয়েকদিন খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। মঈনের বাড়ি ঘরের খোঁজ নিলেন, তারপর যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। নো ক্লাইমেক্স, নো এন্টি ক্লাইমেক্স। মঈন তার মেস ছেড়ে আমাদের বাড়িতে থাকতে এল। এবং প্রবল উৎসাহে ছবি বানাতে শুরু করল। যখের ছবি না, অন্য ছবি।

'ছবি বানাবার টাকা কে দিলেন— আপনার বাবা ?'

'না আমি দিলাম। তার সমস্ত ছবির আমিই প্রযোজক। এখন যে ছবি বানাচ্ছে তার টাকাও আমার দেয়া। টাকা দেয়া বন্ধ করলেই ছবি বন্ধ।'

নীরা খুব হাসছেন। কেন হাসছেন ? একজন মানুষকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন সেই আনন্দে হাসছেন ? নীরা হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন।

'আমি কি খুব বেশি হাসছি ?'

'জ্বি না।'

'আমারতো মনে হয় বেশি হাসছি। মেয়েরা বেশি হাসলে খুব অস্বাভাবিক লাগে। কাঁদলে স্বাভাবিক লাগে। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি কাঁদতে পারি না। তুমি কাঁদ কেমন ?'

'আমিও কম কাঁদি ।'

'দ্যাটস গুড। কম কাঁদাই ভাল। চল ওঠা যাক।'

নীরা উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, ক্যাম্পে যাবেন? নীরা বললেন, না। ক্যাম্পে যাব না। তুমি চলে যাও— আমি একা একা খানিকক্ষণ হাঁটব।

'জ্বি আচ্ছা।'

'রুমালী দাঁড়াও তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। মঈন কী তোমাকে তার শৈশবের গল্প করেছে? কী ভাবে সে এতিমখানায় মানুষ হয়েছে এইসব?'

'জ্বি না।'

'ও— তুমি তাহলে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছ। তার পছন্দের বিশেষ বিশেষ মেয়েদের সে তার ভয়াবহ শৈশবের গল্প করে। সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে এটা করে। তোমার সঙ্গেও করবে। এমন ভাবে করবে যে শুনতে শুনতে তোমার চোখে পানি এসে যাবে। বাসর রাতে সে তার ভয়াবহ শৈশবের গল্প আমার সঙ্গে করেছে। আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।'

নীরা আবারো হাসছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মঈন তোমাদের সঙ্গে এক ধরনের খেলা খেলছে। অসুস্থ মানুষের অসুস্থ খেলা। সে যে অসুস্থ তা কি তুমি টের পেয়েছ?'

'জ্বি না।'

'আমিও বুঝতে পারি নি। যখন বুঝতে পারলাম করুণায় মন ভরে গেল। করুণাও এক ধরনের ভালবাসা। তবে ক্ষতিকারক ভালবাসা। এই ভালবাসা মানুষকে অসুস্থ করে দেয়। আমাকে যেমন করে দিয়েছে। অসুস্থ মানুষের মত তোমার সঙ্গে গল্প করছি। অকারণে হাসছি। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি তার প্রেমে পড়েছ, পড়তেই পার। আমিওতো প্রেমে পড়েছিলাম। জানি না শুনি না একজনকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি যদি হও তাতে দোষ কী? ভাল কথা— তুমি কী তাকে বিয়ে করতে চাও?'

'আপনি এসব কী বলছেন?'

'আকাশ থেকে পড়ার অভিনয় করবে না রুমালী। অভিনয় ভাল হচ্ছে না। আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় অভিনেত্রী। তুমি মাঝে মধ্যে অভিনয় করছ আমি

সারাক্ষণই করছি। এখন এমন হয়েছে যে আমি কখন অভিনয় করছি কখন করছি না, তা নিজেই জানি না। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'জ্বি না।'

'মঈনের মধ্যে প্রায় প্রায়ই স্যুইসাইডের টেনডেনসি দেখা যায়। সে একা একা ছাদে উঠে যায়। ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বে। এই রকম একটা পরিকল্পনা থাকে। আমি তাকে কী বলি জান? আমি বলি— প্লীজ ডু দ্যাট। একটু সাহস করে লাফ দিয়ে পড়। এটা তোমার জন্যে পরম শান্তির ব্যাপার হবে। আমি ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ফেলে দিতে পারলে ভাল হত। আমি তা করব না। এই ব্যাপারটা তোমাকেই করতে হবে।'

নীরা নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামলেন। আমি বললাম, এখন যাই?

'আচ্ছা যাও। ও, জাস্ট এ মিনিট, তোমাদের এখানে নাকি একজন মহিলা পীর আছেন। মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেন। তিনি নাকি বলেছেন চণ্ডিগড়ে কোন ছবি হবে না। একজন মানুষ মারা যাবে। আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করব। যে মানুষটা মারা যাবে সে মঈন কি-না জিজ্ঞেস করব। তুমি কি তার বাড়ি চেন?'

'জ্বি চিনি।'

'আমাকে তুমি তার বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে যাও।'

'চলুন।'

'তুমি মহিলা পীরের কাছে গিয়েছিলে?'

'জ্বি।'

'তোমাকে কী বলেছিল?'

'আমাকে কিছু বলেন নি।'

'সেকী, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও নি?'

'জ্বি না।'

'ভবিষ্যৎ জেনে নেবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করলে, এটা ঠিক না। নেক্সট টাইম তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও ডিরেক্টর মঈন সাহেব তোমাকে বিয়ে করবেন কি করবেন না।'

আমি নিঃশব্দে হাঁটছি। নীরা আমার পেছনে পেছনে আসছেন। আমি তাঁর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি— তার মুখ হাসি হাসি। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

'রুমালী!'

'জ্বি।'

'আমার উপর খুব রাগ লাগছে?'

'জ্বি না।'

'আমার ধারণা খুব রাগ লাগছে। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। আমি যা বললাম তোমার ভালর জন্যে বললাম। মন্দের জন্যে যে সব কথা বলা হয় সে সব শুনতে খুব ভাল লাগে। ভালর জন্যে বলা কথা শুনতে অসহ্য বোধ হয়।'

'আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে না। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আপনার কথা শুনছি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। হাত উঁচিয়ে মহিলা পীরের বাড়ি দেখিয়ে দিলাম। নীরা বললেন, থ্যাংক য়্যু— এখন তুমি চলে যাও। তোমাদের ডিরেক্টর সাহেবকে বলবে যে আমার ফিরতে সামান্য দেরি হতে পারে। সে যেন অস্থির না হয়। আমি যখন তার আশে পাশে থাকি তখন সে আমার সামান্য অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ে। ডিরেক্টর সাহেবকে আমার খবরটা দিও?

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি তাকে আপনি করে বল, না তুমি করে বল?'

'আপনি করে বলি।'

'সেকী এখনো তুমির লেভেলে নামতে পার নি। তোমার মত অবস্থা যাদের তাদের সবাইতো তাকে তুমি করে বলে। সেটাইতো শোভন। আপনি আপনি করেতো আর প্রেম করা যায় না। প্রেমের জন্যে একই সমতলে নেমে আসতে হয়। তাই না?'

আমি দাঁড়িয়ে আছি, নীরা জাহেদার বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। কত সহজ ভঙ্গিতেই না যাচ্ছেন, যেন কিছুই হয় নি। নিশ্চয়ই তিনি জাহেদার সঙ্গে অনেক মজার মজার গল্প করবেন। আমার ক্যাম্পে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। সোমেশ্বরী নদীটাকে কি একবার দেখে আসব? ভয়ংকর স্রোত কি একটু কমেছে, না বেড়েছে? এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাবার কথাতো না। স্রোত নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নদীর পানিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে— আকাশ দেখতে দেখতে সমুদ্রের দিকে যাত্রা। কেন জানি খুব ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি অনেক দিনের অঘুমো। শান্তিময় ঘুমের তৃষ্ণায় শরীর

কাতর হয়ে আছে। ক্যাম্পে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেই আমি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যাব। কে জানে সেই ঘুম হয়তো কোনদিনও ভাঙ্গবে না।

ডাকবাংলোর সামনে পাপিয়া ম্যাডামের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাহলে চলে এসেছেন। জালালের মা'কে দেখতে পাচ্ছি। সেও এসেছে। সোহরাব চাচাকে দেখছি। তিনি বক্তৃতার ভঙ্গিতে কী যেন বলছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। তাদের মধ্যে একজন বুড়োমত ভদ্রলোক। তাঁকে আগে দেখি নি। তিনিও বোধহয় আজই এলেন। শুটিং এর দ্বিতীয় পর্যায় তাহলে শুরু হতে যাচ্ছে। শুরু হোক— প্রবল কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়াই ভাল। ইউনিটের লোকজন ঝিমিয়ে পড়েছিল। পাপিয়া ম্যাডামকে দেখে ঝিম ভাব কাটবে।

আমি সবার চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বিছানায় শোয়ামাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ছি না অন্য কিছু। খুব শীত লাগছে, গা কাঁপছে। আমার ঘরের পাশেই কারা যেন হাসাহাসি করছে। কারা হাসছে ? জালালের মা ?

ঘুমের মধ্যেই শুনলাম ঘুঘু ডাকছে। এখন সকাল না, দুপুর ? সব এলোমেলো লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সকাল। কেমন নরম আলো। আচ্ছা সকাল বেলা ঘুঘু ডাকছে কেন ? ঘুঘু ডাকবে দুপুরে। উল্টা পাল্টা ডাকছে কেন ? আমার গানের স্যার মোসাদ্দেক সাহেব বলতেন— পাখিদের গলায় রাগ রাগিনী আছে। কোন কোন পাখির গলায় আছে ভৈরবী তারা ডাকে সকালে, আবার কারো গলায় দরবারী কানাড়া— এরা ডাকবে দুপুরে যেমন ঘুঘু। যাদের গলায় বেহাগ তারা ডাকবে নিশি রাত্রে যেমন শ্মশান-কোকিল। মোসাদ্দেক স্যার খুব সুন্দর করে কথা বলতেন। গান শেখাতেনও চমৎকার। আমি প্রথম দিন স্যারকে বললাম, স্যার আমার কি গান হবে ? তিনি আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, মাগো তোমার গলা দিয়ে কি শব্দ বের হয় ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি মুখ ভর্তি পান নিয়ে বললেন, শব্দ বের হলে গান হবে। গাধা যে প্রাণী সেও গান গায় আর মানুষ গাইবে না সে কেমন কথা ?

'স্যার, গাধা কি গান গায় ?'

'অবশ্যই গায়। গাধার নিজস্ব রাগিনীও আছে— গর্ধভ রাগিনী। হা হা হা ।'

মোসাদ্দেক স্যার শিক্ষক হিসেবে চমৎকার ছিলেন, মানুষ হিসেবেও চমৎকার ছিলেন। ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। তিনি প্রায়ই বলতেন, গানের শিক্ষকরা কী করে জানিস ? তারা জায়গায় জায়গায় গানের চারাগাছ পুতে। বেশির ভাগ চারাই গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলে। কোনটায় অল্প বয়সে পোকা ধরে। আবার কিছু চারাগাছ মহীরুহ হয়ে যায়। ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। সে এক দেখার মত দৃশ্য।

এই মোসাদ্দেক স্যার আমার চোখের সামনে তাঁর এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটার নাম আভা। তের চৌদ্দ বছরের বেশি বয়স হবে না। খুবই সাধারণ টাইপ মেয়ে। এই সাধারণের ভেতর স্যার অসাধারণ কী দেখলেন কে জানে। তিনি সবার চোখের সামনে বদলে যেতে শুরু করলেন। নিজের ঘর সংসার ছেলে মেয়ে সব তুচ্ছ হয়ে গেল। কী ভয়ংকর অবস্থা। আভা গান শেখা ছেড়ে দিল। স্যার আভাদের বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শুরু করলেন। পাড়ার ছেলেরা তাকে একবার খুব মারল। তাতেও লাভ হল না। তাঁর মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। সারাক্ষণ বিড় বিড় করতেন। গান সেখানো বন্ধ করে দিলেন। সংসারে চরম অভাব নেমে এল। স্যারের স্ত্রী, পুরানো ছাত্র ছাত্রীদের বাসায় বাসায় গিয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলেন।

তারপর একদিন খবর পেলাম সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি পেঁচিয়ে স্যার ঝুলে পড়েছেন। মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ কষ্ট থেকে চিরমুক্তি। কী আশ্চর্য মোসাদ্দেক স্যারের কথা হঠাৎ মনে আসছে কেন ? আমি কিছু মনে করতে চাই না। আমি দীর্ঘ সময় শান্তিতে ঘুমুতে চাই। প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ।

মোসাদ্দেক স্যারকে কাল রাতে হঠাৎ স্বপ্নে দেখেছি। না না কাল না, পরশু রাতে। বেশ হাসি খুশি চেহারা। মুখ ভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে পাঞ্জাবিতে পড়েছে। স্যারের কোন খেয়াল নেই। আমি বললাম, কেমন আছেন স্যার ? স্যার হাসতে হাসতে বললেন, খুব ভাল আছি। তুই কেমন আছিস ?

'আমি ভাল আছি।'

আমি পানি নিয়ে এসে দেখি স্যার নেই। ঘর ফাঁকা। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখি মা'কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি। ঘর ভর্তি সিগারেটের গন্ধ। পানের জর্দার গন্ধ। মোসাদ্দেক স্যার সিগারেট খেতেন, জর্দা দিয়ে পান খেতেন। তিনি চলে গেছেন— সিগারেট এবং জর্দার গন্ধ ফেলে রেখে গেছেন। ভয়ে

আমার শরীর কেমন করতে লাগল। আমি গুটিশুটি মেরে মা'র বুকের কাছে চলে গেলাম— তবু আমার ভয় কাটল না। আমি ফিস ফিস করে ডাকলাম, বাবা। বাবা।

খুব ছোটবেলা থেকেই প্রচন্ড ভয় পেলে আমি বাবাকে ডাকি। বাবা যদি একবার বলেন, কী হয়েছে রে ? সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যায়। অভ্যাস মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায়। বাবার কাছ থেকে আমি কতদূরে চলে এসেছি— তারপরেও ভয় পেয়ে তাঁকেই ডাকলাম। তিনি সাড়া দিলেন না। কিন্তু আমার ভয় কেটে গেল।

আজ আবারো ভয় পাচ্ছি। আমি জানি না এই ভয়ের উৎস কী ? আমি জানি না কেন ভয় পাচ্ছি। আমার ঘুম কেটে গেছে। চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছি। ক্যাম্পের হৈ চৈ কথা বার্তা শুনতে পাচ্ছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে চেস্টাও করছি না। নিজেকে খুব আলাদা মনে হচ্ছে।

দরজা খুলে মা ঢুকলেন। আমাকে দেখে হতভম্ব গলায় বললেন, তুই এখানে শুয়ে আছিস ? কী আশ্চর্য !

মা'কে দেখে আমার ভাল লাগছে— আমি আদুরে গলায় বললাম, আশ্চর্য কেন মা।

'তোকে দেখলাম, নীরা ভাবীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। তুই কোন ফাঁকে চলে এলি ?'

'কোন ফাঁকে চলে এসেছি আমি নিজেও জানি না মা।'

'পাপিয়া ম্যাডাম চলে এসেছে জানিস ?'

'জানি।'

'মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে। পাতিলের তলার মত কালো। মানুষ এত কালো হয় এই প্রথম দেখলাম।'

'মা আমার পাশে একটু বসতো।'

'তোর কী হয়েছে ?'

'কিছু হয় নি— আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাকব।'

'শরীর খারাপ ?'

'হুঁ।'

মা উদ্বিগ্ন মুখে বিছানায় উঠে এলেন। আমার কপালে হাত রাখলেন। আমি তাঁর কোলে মাথা রেখে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। মা কোমল গলায় বললেন, কই জ্বরতো নেই। শরীর নদীর তলার মত ঠান্ডা।

'জ্বর না থাকলেও শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছে। তুমি মজার কোন গল্প বলে আমাকে হাসিয়ে দাও।'

'কী মজার গল্প ?'

'ক্যাম্পে মজার কিছু ঘটে নি ?'

'ও আচ্ছা ঘটেছে—।'

মা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। মজার গল্প মা'র কোলে মাথা রেখে শোনা যাবে না। বসে বসে শুনতে হবে।

সেলিম গাধাটার ঘরে একটা সাপ ঢুকেছে। গাধাটা সাপটা মেরেছে। সাপ ফেলে দিতে যাচ্ছে— কে যেন বলল, ফেলবেন না। গারোদের দিয়ে দিন ওরা সাপ খায়। তখন সেলিম বলল, ওরা খেলে আমরাও খেতে পারি। সাপটা আমাকে খেতে এসেছিল। এখন আমি সাপটাকে খাব। বাবুর্চিকে বলব ঝাল ঝাল করে রান্না করতে।

'সাপ রান্না হয়েছে ?'

'বাবুর্চির কাজ নেই সাপ রান্না করবে। তবে ঐ সেলিম গাধাটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মিজানুর রহমান— মাতালটা। সে বলেছে সেই তোলা উনুনে রান্না করবে। তারপর দু'জনে মিলে আজ দুপুরে খাবে।'

'ভালতো।'

মা বিস্মিত গলায় বললেন, সেলিম গাধাটা সরল বোকা-সোকা টাইপের ছিল। সে সাপ খাওয়া ধরল কেন ? আর কিছু না ফিল্মী লাইনের বাতাস লেগেছে। তুই এই গাধাটার কাছ থেকে পাঁচশ হাত দূরে থাকবি।

'আচ্ছা থাকব।'

মা উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, যাচ্ছ কোথায় ? মা বললেন, সাপ সত্যি সত্যি রান্না হচ্ছে কি-না দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি ? আমি বললাম, আমাকে না তুমি পাঁচশ হাত দূরে থাকতে বলেছ।

মা একাই সাপ রান্না দেখতে গেলেন।

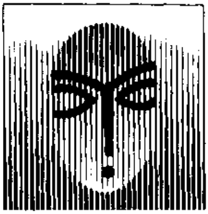

অনেকদিন পর ডাইরি লিখতে বসেছি। দোতলার বারান্দায় বসেছিলাম। মা কিছুক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করলেন তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে। কঠিন গলায় তাকে বললাম— আমি যাব না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, শুধু শুধু বারান্দায় বসে থেকে কী করবি ? আমি বললাম, প্রকৃতির শোভা দেখব।

'আমার সঙ্গে চল হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির শোভা দেখবি।'

'তোমার পায়ে ধরছি মা, আমাকে বাদ দাও।'

'এরকম করছিস কেন ? আমি অস্পৃশ্য ?'

'না তুমি খুবই সম্পৃশ্য তবে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে যাব না। আমার কোমরে চেইন বেঁধেও তুমি আমাকে নড়াতে পারবে না।'

মা মন খারাপ করে জালালের মা'কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। ইউনিটের মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়ার জন্যে মাসওয়ারী টেম্পো ভাড়া করা আছে। শুটিং যেহেতু হচ্ছে না টেম্পো পড়ে আছে। যার ইচ্ছা টেম্পো নিয়ে ঘুরতে যেতে পারে।

আমি দোতালা থেকে দেখলাম, মা, জালালের মা এবং মওলানা সাহেব টেম্পো নিয়ে বের হয়েছেন। তিনজনই খুব হাসিখুশি। মওলানা সাহেবকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। উনি কি নিজ থেকেই যাচ্ছেন না, মা তাঁকে সেধে সঙ্গে নিয়েছেন ?

উঠোনে নীরা ম্যাডামের মেয়েটা একা একা খেলছে। মেয়েটা অসম্ভব রোগা। রোদে দাঁড়ালে ছায়া পড়বে না এমন অবস্থা।

আমি ডাইরি নিয়ে বসেছি এবং মাঝে মাঝে মেয়েটাকে দেখছি। মেয়েটা একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমি ঠিক করে রেখেছি যেই সে আমার

দিকে তাকাবে— আমি ঠিকই ভেংচি কাটব। সে নিশ্চয় কেঁদে তাঁর মা'কে ডেকে এনে আমাকে দেখাবে। নীরা ম্যাডাম তখন কী করেন আমার দেখার ইচ্ছা। আমি দ্রুত লিখে যাচ্ছি—।

সর্প বিষয়ক জটিলতা

সেলিম ভাই এবং মিজানুর রহমান সাহেবের যৌথ প্রযোজনায় আজ 'সর্প রন্ধন' হয়েছে। আমার ধারণা ছিল রান্না পর্যন্তই হবে, কেউ খাবে না। আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে মিজান সাহেব বেশ আয়েশ করে খাওয়া শুরু করেন। তিনি সারাক্ষণই নেশার ঘোরে থাকেন— কাজেই তাঁর সাপ খাওয়াটা তেমন বড় কিছু না। সেলিম ভাই যে খাবেন তা ভাবি নি। আমার ধারণা তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে খেয়েছেন। সবাই তাদের খাওয়া দেখার জন্যে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন আয়েশ করে খেয়ে যাচ্ছে— এইসব দেখে তিনি এক টুকরা মুখে দিলেন।

আমি বললাম, সেলিম ভাই খেতে কেমন?

তিনি বললেন, খারাপ না। টেস্ট অনেকটা বাইন মাছের মত।

'কাঁটা নেই?'

'না, শুধু মাঝের কাঁটা।'

আমি বললাম, নিজেকে জাহির করার জন্যে জোর করে খাবেন না। শরীর খারাপ করবে।

সেলিম ভাই বললেন, জাহির করার কী আছে। ইচ্ছা করলেই সাপ ব্যাঙ সবই খাওয়া যায়। বলেই এক সঙ্গে দু'টুকরা মুখে দিয়ে দিলেন। আমার বমি আসছিল বলে আমি দ্রুত চলে এলাম। নিজের ঘরে আসার কিছুক্ষণ পরেই শুনি সেলিম ভাই ক্রমাগত বমি করছেন। তাঁর বমি বন্ধ হচ্ছে না। সেলিম ভাইকে বর্তমানে মিশনারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তার বমি বন্ধ হয়েছে তবে এখন হিক্কা উঠছে। পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তাররা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। ঘুমের মধ্যেও তাঁর হিক্কা উঠছে।

এই পর্যন্ত লিখে আমি থামলাম। সেলিম ভাই সাপের মাংস খাবার মত একটা উদ্ভট কাণ্ড কেন করলেন সে সম্পর্কে— আমার নিজের থিওরীটা লিখব কি-না ভাবছি। লিখতে ইচ্ছে করছে না। আমি প্রায় নিশ্চিত কাণ্ডটা তিনি করেছেন আমাকে অভিভূত করার জন্যে।

এন্টেনা আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ভেংচি কাটলাম। মেয়েটা তাকিয়ে আছে। মা'র কাছে ছুটে যাচ্ছে না। কেঁদে ফেলার উপক্রমও করছে না। আমি ডাইরিতে মন দিলাম। আর কী লিখব ? লেখার কিছু পাচ্ছি না। ভুল বললাম, লেখার অনেক কিছুই আছে লিখতে ইচ্ছে করছে না। নীরা ম্যাডাম প্রসঙ্গে লিখব ? লেখা থাকার অনেক সুবিধা, পরে মিলিয়ে দেখা যায়। স্মৃতির লেখা ঠিক থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখাগুলিও আপনা আপনি বদলাতে থাকে।

নীরা ম্যাডাম

> আমার জীবন কেটেছে কম বুদ্ধির একজন মহিলার সঙ্গে। তিনি আমার মা। সেই কারণেই মা'র চেয়ে সামান্য বেশি বুদ্ধির যে কোন মহিলাকে আমার অনেক বেশি বুদ্ধির মহিলা মনে হয়। আমি তাদের বুদ্ধি দেখে অভিভূত হই। আমার একটু বয়স হবার পর অভিভূত হবার প্রবণতা কমে গেল। তবে নীরা ম্যাডাম আমাকে অভিভূত করেছেন। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করার দক্ষতা সবই অভিভূত করার মত। ভদ্রমহিলার নিজের ক্ষমতার উপর আস্থাও প্রবল। এই ব্যাপারটাও তুচ্ছ করার মত নয়। অসম্ভব বুদ্ধিমতীদের নিজেদের উপর আস্থা থাকে না— কারণ তারা জানে— মানুষ খুব বিচিত্র প্রাণী সে সব সময় হিসেব মেনে চলে না। যে কোন মুহূর্তে অতি বড় মহাপুরুষও অতি নোংরা পাপ করতে পারেন এবং অতি বড় পাপীও অসাধারণ কোন মহৎ কর্ম করে ফেলতে পারে। শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে সব নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

সেই কারণেই নিজের উপর অতিরিক্ত আস্থাও বোধ হয় এক ধরনের বোকামী। যাই হোক মূল অংশে চলে আসি।

আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙেছিল। আমি উঠোনে হাঁটছি। নীরা ম্যাডাম বের হয়ে এলেন। সহজ সরল গলায় বললেন— এসো চা খেয়ে যাও।

আমি বিস্মিত হলাম। গতকাল যে সব কথাবার্তা তিনি বলেছেন তারপর এইভাবে নিজের ঘরে চা খেতে ডাকতে কিছুটা সংকোচ হবার কথা। আমি বললাম, চা খাব না আমি খালি পেটে চা খেতে পারি না।

'খালি পেটে খাবে কেন ? বিসকিট খেয়ে তারপর চা খাবে। এসো। তোমাদের ডিরেক্টর সাহেব জ্বরে কাতর। তাকে একবার দেখবে না ? সবাই কয়েকবার করে দেখে যাচ্ছে, শুধু তুমি বাদ। চলে এসো।'

আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। ডিরেক্টর সাহেব বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে মেয়েটা কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। নীরা বললেন, এই যে মহান পরিচালক— রুমালী তোমাকে দেখতে এসেছে। মুখের উপর থেকে চাদরটা সরাও। ও তোমার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে।

ডিরেক্টর সাহেব মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমার ইচ্ছে করল তাঁর বিছানায় বসি এবং সত্যি সত্যি কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখি। নীরা ম্যাডাম সামান্য বাড়াবাড়ি করছেন। এই বাড়াবাড়ির প্রয়োজন ছিল না।

টেবিলে চায়ের পট। চায়ের কাপ। নীরা ম্যাডাম কাপে চা ঢালছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। নীরা বললেন, মহান পরিচালক সাহেব— তোমাদের এই কিশোরী নায়িকা খুব ভাল গান করে। তোমাকে এখন পর্যন্ত শুনাতে পারে নি কারণ তুমি শুনতে চাও নি। জ্বরের মধ্যে গান শুনতে ভাল লাগবে না। যখন জ্বর ছাড়বে তখন মনে করে রুমালীকে ডেকে তার গান শুনবে।

ডিরেক্টর সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন— ক্লান্ত গলায় বললেন, এক কাপ চা দাও।

নীরা ম্যাডাম কাপে চা ঢেলে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, চা-টা দিয়ে এসো। বলেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি সেই হাসি দেখেও দেখলাম না। সবকিছু দেখতে নেই। নীরা বললেন, ডিরেক্টর সাহেব আপনি এমন চুপ মেরে গেলেন কেন ? বেচারী রোগী দেখতে এসেছে— তার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করেন।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, নীরা একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেট কি খাব ?

'খেতে ইচ্ছে করলে অবশ্যই খাবে। তোমার কোন ইচ্ছাতে আমি না বলি নি। তুমি যখন আত্মহত্যা করতে চেয়েছ তখন বলেছি— কর। করলে তোমার মঙ্গল হবে। বলি নি ?'

উনি সিগারেট ধরালেন। শান্ত ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আমার উনার জন্যে অসম্ভব মায়া লাগছে। নীরা ম্যাডাম বললেন, বেচারী রোগী দেখতে এসেছে, তার সঙ্গে একটু গল্প টল্প কর। মুখ ভোতা করে চা খাচ্ছ কেন ?

'কী গল্প করব ?'

'নতুন একটা ছবির আইডিয়া যে মাথায় এসেছে সেই গল্প কর। রুমালী অভিনয় জগতের মানুষ। তার ভাল লাগবে।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম উনি সত্যি সত্যি গল্প শুরু করেছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন যে সত্যি গল্প শুরু করতে পারে আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে ক্যাসেট প্লেয়ারে গল্প ক্যাসেট করা। নীরা ম্যাডাম বোতাম টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু হল—।

উনি গল্প করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমাকেই গল্পটা শুনাচ্ছেন। নীরা ম্যাডামের দিকে তাকাচ্ছেনও না। এই ব্যাপারটাও বিস্ময়কর—

'রুমালী সিনেমার এই আইডিয়াটা আমি অসুস্থ হবার পর পেয়েছি। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হল— এমন একটা গল্প দাঁড়া করালে কেমন হয়। পক্ষাঘাত গ্রস্থ একজন মানুষ— সে শুধু যে নড়াচড়া করতে পারে না তাই না, কথাও বলতে পারে না। শুধু তার চোখ দু'টা বেঁচে আছে— আর সবই মারা গেছে। সে কামুনিকেট করে চোখের ইশারায়। একবার চোখের পাতা ফেলা মানে 'হ্যাঁ' দু'বার চোখের পাতা ফেলা মানে 'না'। তার স্ত্রী আছে, একটা কাজের লোক আছে, তিন জনের সংসার। এক সকালের গল্প। স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করল, আজ কেমন আছ ? ভাল ? সে একবার চোখের পাতা ফেলল— তার মানে 'হ্যাঁ'।

'পানি খাবে ?'

দু'বার চোখের পাতা ফেলল— 'না'। তারপর চোখের ইশারায় টেবিলের দিকে দেখাল। টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট।

'সিগারেট খাবে ?'

'একবার চোখের পাতা— অর্থাৎ 'হ্যাঁ'।'

স্ত্রী সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। কারণ বসার ঘরে এই তরুণীর অনেক দিন আগের পরিচিত একজন মানুষ এসেছেন। কিশোরী বয়সে তার সঙ্গে ভালোবাসাবাসি ছিল। যে কোন কারণেই হোক বিয়ে হয় নি। ভদ্রলোক এসেছেন মেয়েটির অসুস্থ স্বামীকে দেখতে। পুরানো দিনের কিছু কথা আপনাতে উঠে আসছে। দু'জনেরই পুরানো কথা বলতে ভাল লাগছে। মেয়েটি ভুলেই গেছে যে সে তার স্বামীর ঠোঁটে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে এসেছে, সিগারেটটা সরিয়ে দেয়া দরকার।

সিগারেটের শেষ অংশ নিতে কেউ আসছে না। ঠোঁট থেকে গড়িয়ে সেই সিগারেট পড়ল— বিছানার চাদরে। সেই চাদরে আগুন ধরল— আগুন তার দিকে এগিয়ে আসছে। আতংক গ্রস্থ হয়ে ভদ্রলোক আগুন দেখছেন— তিনি কিছু করতে পারছেন না। কাউকে ডাকতে পারছেন না। তাকিয়ে আছেন তাঁর নিয়তির দিকে। পাশের ঘর থেকে হালকা হাসির শব্দ ভেসে আসছে। এই হল গল্প। রুমালী তোমার কেমন লাগছে ?

‘গল্পের শেষটা কী ?’

‘এটার কোন শেষ নেই। সব গল্পেরই যে শেষ থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। গল্পটা তোমার কাছে কেমন লাগল ?’

‘খুব সুন্দর।’

‘এই গল্পটা বেশি ভাল, না যখের গল্প ?’

‘দু’টা গল্পই সমান সুন্দর।’

‘এই ছবির কাজ শেষ হলেই চিত্রনাট্য তৈরি করে ফেলব। নীরা তোমার কাছে দু’টা গল্পের মধ্যে কোনটা বেশি ভাল লাগল।’

নীরা বললেন— দু’টাতো আসলে একই গল্প। অমোঘ নিয়তির গল্প। নিয়তির গল্প তোমার চেয়ে ভাল কে বলবে ? তোমার চেয়ে ভাল কেউ বলতে পারবে না। বলতে পারা উচিতও নয়।

উনি চুপ করে গেলেন। আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমি নীরার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি উঠি ?

নীরা বললেন, আচ্ছা যাও। আমি ঢাকায় চলে যাব— তোমাদের ছবির শেষ পর্যায়ে আবার দেখা হবে।

‘জ্বি আচ্ছা।’

‘তুমি কি সর্পভুককে দেখতে গিয়েছিলে ?’

‘জ্বি না।’

‘আমি আজ একবার দেখতে যাব। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পার।’

‘আমার ইচ্ছা করছে না।’

‘ইচ্ছা করছে না কেন ?’

‘উনাকে দেখলেই সাপ খাবার দৃশ্যটা মনে পড়বে তখন আমার নিজেরই বমি আসবে। পরে দেখা যাবে আমাকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে।

‘তাহলে না যাওয়াই ভাল।’

এই পর্যন্ত লিখে ডাইরি বন্ধ করলাম। এন্টেনা এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বোধ হয় অপেক্ষা করছে আমার দ্বিতীয়বার ভেংচি কাটার দৃশ্য দেখার জন্যে। ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করছে না, ঘুম পাচ্ছে।

মা ফিরলেন বিকেলে। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। আমাকে ডেকে তুললেন। তাঁর মুখ থমথম করছে। তিনি সহজ ভাবে কথাও বলতে পারছেন না। আমি ঘুম

জড়ান গলায় বললাম, কী হয়েছে? মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর নামে এইসব কী শুনছি?

'কী শুনছ?'

'ঝড়ের সময় তুই আর মঈন ভাই না-কি একটা ঘরে একা ছিলি?'

'একা কোথায়? আমি আর উনি— আমরা দু'জন।'

'তোরা কী করছিলি?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমরা কি করছিলাম বলে তোমার ধারণা?

'আমার ধারণা খুবই ভয়ঙ্কর।'

'তোমার ধারণা ঠিকই আছে মা। এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না। কষ্ট পাবে।'

'তার মানে কী? তুই কী বলতে চাচ্ছিস?'

আমি জবাব দিলাম না। মা'র সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মা ধরা গলায় বললেন, জালালের মা যা বলেছে তাহলে সেটা ঠিক। আমি এই কথায়ও জবাব দিলাম না। মা ছুটে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। তিনি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। ছোট বাচ্চাদের মত হাউ মাউ করে কান্না। তাঁর সেই কান্না আমাকে স্পর্শ করছে না।

আমি এবং মা পাশাপাশি শুয়ে আছি। রাত কত জানি না। ইচ্ছা করলে জানা যায়। টেবিলে আমার হাত ঘড়ি পড়ে আছে। হাত বাড়ালেই ঘড়ি। হাত বাড়াতে ইচ্ছা করছে না। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে বাতি জ্বলছে। খানিকটা আলো তেড়ছা ভাবে আমার পায়ে পড়েছে। সন্ধ্যাবেলায় আলোর তেজ থাকে না, রাত যত বাড়তে থাকে আলোর তেজও বাড়তে থাকে। আলোর তেজ দেখে মনে হচ্ছে অনেক রাত। অঘুমো অবস্থায় চুপচাপ শুয়ে থাকা যায় না। কিছু না কিছু করতে ইচ্ছে করে—পাশ ফেরা, মাথার নীচের বালিশটা উল্টে দেয়া, একবার গুটিসুটি মেরে শোয়া, একবার লম্বা হয়ে যাওয়া। আমি তার কিছুই করছি না, পাথরের মূর্তির মত পড়ে আছি। মা খুব নড়া-চাড়া করছেন। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করছেন। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। মা একসময় বিছানায় উঠে বসে বললেন, চাপা গলায় বললেন, বকু ঘুমাচ্ছিস? আমি বললাম, না। মা আবারো শুয়ে পড়লেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি কিছু বলবেন। কিছু বললেন না। হয়ত বুঝতে পারছেন না, কী বলবেন। তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। কোন বড় সমস্যায় মানুষের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে

যায় তখন সে আর সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারে না। সমস্যার বাইরের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে কথা খুঁজে পায় না।

মা আবারো উঠে বসলেন। আবারো আগের মত জিজ্ঞেস করলেন, বকু ঘুমুচ্ছিস ? এবারে আমি বললাম, হ্যাঁ ঘুমুচ্ছি। মা শুয়ে পড়লেন। তার মানে আমি কী বলছি না বলছি তাও তাঁর মাথায় ঢুকছে না। মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে— তাঁর নিজের জগৎ ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেছে। তিনি এখন ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। এই ঘোর সহজে কাটার না।

'বকু ?'

'হুঁ।'

'কাল থেকে শুটিং পুরোপুরি শুরু হবে ?'

'হুঁ।'

'রাতের কাজের জন্যে জেনারেটার এনেছে। রাতের কাজ হবে।'

'হুঁ।'

' পাপিয়ার মেয়েটাকে দেখেছিস— সামনের দু'টা দাঁত বড় বড়। মিকি মাউসের মত লাগে।'

'দেখেছি।'

'নীরাকে তোর কেমন লাগল ?'

'ভাল।'

'শুরুতে তাকে যত অহংকারী মনে হয়েছিল—তত অহংকারী কিন্তু সে না।'

'হুঁ।'

'তবে কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে গেল। তোকে কিছু বলেছে ?'

'না।'

'উনার মেয়েটা দেখতে কেমন ফকিরনীর মেয়ের মত না!'

'হুঁ, ফকিরনীর মেয়ের মত।'

'হয়ত কোন ফকিরনীর কাছ থেকেই নিয়েছে। এটা তাঁর নিজের মেয়ে না। পালক মেয়ে। জালালের মা বলল।'

'ও আচ্ছা।'

'মানুষ কেন যে পালক নেয়। পালা পাখির জ্বালা বেশি। তারপরেও পুষ্যি নেয়। উচিত না।'

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। মা তুচ্ছ সব কথা বলে যাচ্ছেন। লক্ষণ ভাল না। একবার এ রকম শুরু হলে চলতেই থাকবে। মা সারারাত নিজের মনে কথা বলতে থাকেন। আমাকে হুঁ দিয়ে যেতে হবে। বাবা আমাদের ছেড়ে যাবার পরও এরকম হল। মা'র কথা বলা রোগ হল। সারা রাত কথা বলতেন। অর্থহীন সব কথা। আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন। আবার শুরু হত কথা।

'বকু !'

'কী মা ?'

'গরম লাগছে। গরমে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

'বাথরুমে যাও, হাত মুখ ধুয়ে আস।'

মা বাধ্য বালিকার মত উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুলেন। বাথরুম থেকে বের হয়ে গেলেন বারান্দায়। তিনি বারান্দায় হাঁটাহাটি করছেন। স্যান্ডেল পায়ে হাঁটছেন— স্যান্ডেলের শব্দ হচ্ছে। মা এত শব্দ করে হাঁটেন না। আজ কি ইচ্ছা করে শব্দ করছেন ? অনিদ্রা রোগ হলে মানুষ শব্দ না করে থাকতে পারে না। মা আবারো বাথরুমে ঢুকলেন। মনে হয় এখন গোসল করছেন। মাথায় মগে করে পানি ঢালা হচ্ছে। ঢালা হচ্ছেতো, ঢালাই হচ্ছে। বাথরুমে পানি থাকে না বলে ড্রাম ভর্তি পানি রাখা হয়। তিনি কি পুরো ড্রাম শেষ করবেন ? তাঁর গোসল শেষ হল। তিনি ঘরে ঢুকে কাপড় বদলালেন। চুল আঁচড়ালেন। তারপর টেবিল থেকে আমার হাত ঘড়িটা নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাত থেকে ঘড়ি নামিয়ে রাখার পর আমি বললাম, ক'টা বাজে মা ? মা আবারো ঘড়ি দেখে বললেন— আড়াইটা। তার মানে আগের বার হাতে ঘড়ি নিয়ে তাকিয়েছেন, সময় দেখেন নি। মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছা করছে কোন একটা মন্ত্র পড়ে তাঁর অস্থিরতা দূর করে দি। সে রকম মন্ত্র আমার অবশ্যি জানা আছে। মন্ত্র পড়ে মা'কে সামলে ফেলতে পারব। আমি উঠে বসলাম। শান্ত গলায় বললাম, মা শোন তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ?

মা নিচু গলায় বললেন, অস্থির হবার মত কিছু হয় নি ?

আমি বললাম, না।

তিনি হতাশ মুখে তাকিয়ে আছেন। যেন নিতান্ত বাচ্চা একটা মেয়ে যে আমার কাছ থেকে আশা ও আনন্দের কোন কথা শুনতে চায়। কারোর চিন্তা শক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে এই অবস্থা হয়। মা আমার সামনে চেয়ারে বসলেন। আমি সহজ গলায় বললাম— মা শোন। আমার যে সমস্যা নিয়ে ভেবে

ভেবে তুমি অস্থির হয়েছ সে সমস্যা আমিই দূর করব। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

'তোর সমস্যা তুই কীভাবে দূর করবি ?'

'সব আমি ভেবে ঠিক ঠাক করে রেখেছি।'

'সেটা কী ?'

'যেদিন শুটিং শেষ হবে সেদিন আমি সোমেশ্বরী নদীর পারে বেড়াতে যাব। তারপর ঝাপ দিয়ে নদীতে পড়ে যাব। যেহেতু সাঁতার জানি না, মবিলের মত টুক করে চলে যাব নদীর তলায়। সব সমস্যার সমাধান।'

কথাগুলি আমি বললাম হেসে হেসে, কাজেই মা আরো এলোমেলো হয়ে গেলেন। তিনি তাকিয়ে আছেন— এখন আর তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

'মা।'

'হুঁ।'

'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতো।'

'হাসব কেন ?'

'হাসবে কারণ— আমি তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি। তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে ভয়ঙ্কর কিছু কথা বলেছি। এই জাতীয় কিছুই হয় নি ।'

'কিছুই হয় নি ?'

'না।'

'তুই ঝড়ের সময় উনাকে নিয়ে স্কুল ঘরে যাস নি ? মওলানা সাহেবতো বললেন, গিয়েছিলি।'

'গিয়েছি। তাতে কী হয়েছে ? প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আমরা কি বাইরে থাকব ? বাইরে থাকলে মরে যেতাম।'

'তাতো ঠিকই।'

'আমরা দৌড়ে স্কুল ঘরে ঢুকলাম আর তখনই মওলানা সাহেব ঢুকলেন।'

'হ্যাঁ তাইতো!'

'নিজের মেয়ের সম্পর্কে তোমার যে কী ধারণা মা। ছিঃ। নিজের মেয়ের উপর তোমার বিশ্বাস নেই ?'

মা এখনো অপলকে তাকিয়ে আছেন। তবে এখন তাঁর চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে তিনি কাঁদতে শুরু করবেন।

'আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা সেটা টেস্ট করার জন্যেই গল্পটা তোমাকে বানিয়ে বলেছি। আশ্চর্য তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছ। কর নি?'

'হুঁ করেছিলাম।'

আমি মা'কে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমার মনটা কি খুব বেশি খারাপ হয়েছিল মা ?

'হুঁ।'

'এখন মন ঠিক হয়েছে ?'

মা ধরা গলায় বললেন— হ্যাঁ। মন ঠিক হয়েছে।

'এসো শুয়ে পড়ি।'

'না শোব না— আয় গল্প করি।'

'এসো শুয়ে শুয়ে গল্প করি। এসো।'

আমি মা'কে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মা কেঁদেই যাচ্ছেন। তবে তিনি যে কাঁদছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলে আঁচলে চোখের পানি মুছতেন। তা মুছছেন না। আমি মা'কে জড়িয়ে ধরে খুশি খুশি গলায় বললাম, ঘটনা সত্যি হলে তুমি কী করতে মা ?

'জানি না।'

'আমার মনে হয় তুমি পাগল হয়ে যেতে।'

'বকু!'

'হুঁ।'

'সিনেমা করার দরকার নেই বকুল, চল কাল ভোরে ঢাকায় চলে যাই।'

'চল যাই।'

'সত্যি যাবি ?'

'তুমি বললে অবশ্যই যাব।'

'কিন্তু এরা খুব বিপদে পড়বে।'

'তাতো পড়বেই। আমার মত একটা মেয়ে জোগাড় করা। তাকে দিয়ে পুরো জিনিসটা রিশুট করা।'

'এটা ঠিক হবে না বকুল।'

'তাহলে থাক।'

'বকু!'

'হুঁ।'

'এবার ঢাকায় গিয়ে তোর বাবাকে বলব, ভাল একটা ছেলে দেখে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে।'

'বাবাকে বলতে হবে কেন ?'

'মেয়ের বিয়েতো বাবারাই দেয়।'

'আমার বিয়ে তুমি দেবে মা— আর কেউ না।'

'তোর বিয়ের জন্যে আমি টাকা আলাদা করে রেখেছি।'

'কত টাকা ?'

'চল্লিশ হাজারের মত।'

'ঢাকায় ফিরলে সেখান থেকে আমাকে দশ হাজার টাকা দিওতো মা।'

'কী করবি ?'

'কাজ আছে। আমি একটা সিডিপ্লেয়ার কিনব। আমার খুব শখ।'

'তোর বাবাকে বললেই কিনে দেবে। তোর বিয়ের টাকায় আমি হাত দেব না। অসম্ভব।'

'বাবাকে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'তোর বলতে হবে না। আমি বলব।'

'ঠিক আছে মা। তুমি বোল। এখন একটু ঘুমাও অনেকক্ষণ গল্প করা হয়েছে।

'বকু !'

'কী মা ?'

'তুই কি উনাকে খুব পছন্দ করিস ?'

'কাকে ?'

'ডিরেক্টর সাহেবকে ?'

'না।'

'না কেন ?'

'উনার মধ্যে প্রচুর ভান আছে মা। আমার ভান পছন্দ না। মানুষ হবে সহজ সরল। যা ভাববে তাই বলবে, তাই করবে। উনি কখনো তা করেন না। উনি যা ভাবেন কখনো তা বলেন না।'

'সেলিমকে কি তোর পছন্দ ?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেব না। উত্তর দিলেই তুমি রেগে যাবে।'

'না রাগব না। বল সেলিমকে তোর পছন্দ কি-না।'

'পছন্দ।'

'গাধা টাইপ ছেলেতো। কথা নেই বার্তা নেই সাপ খেয়ে ফেলল।'

'সাপ খেয়েছে বলেই পছন্দ। কেঁচো খেলে আরো পছন্দ হত।'

' ফালতু কথা বলবি না। আমি তোর বিয়ে দেব একজন ডাক্তার ছেলের সঙ্গে।'

' ঠিক আছে দিও।'

' ফ্যামিলীতে একজন ডাক্তার থাকা ভাল। অসুখ বিসুখে তখন অস্থির হতে হবে না।'

' মা ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

' বিয়ের পর আমি কিন্তু তোদের সঙ্গে থাকব।'

' অসম্ভব। তুমি হলে শাশুড়ি তুমি জামাইয়ের সঙ্গে থাকবে এটা কেমন কথা ! তুমি আমাদের ভালবাসা-বাসি দেখবে, ঝগড়া ঝাটি দেখবে তা হবে না।'

' আমি তাহলে যাব কোথায় ?'

'সেটাও অবশ্যি একটা কথা। তোমারতো আবার যাবার জায়গা নেই।'

' বকু !'

' কী মা ?'

' আমার যেন কেমন লাগছে ?'

' কী রকম লাগছে ?'

' বুঝতে পারছি না। আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না রে বকু ।'

' তুমি কথা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাক। একটা কথাও বলবে না। আমি তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।'

' মনে হয় জ্বর আসছে।'

' আসলে আসুক। তুমি ঘুমাও।

মা চুপ করলেন। আমি তাঁর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি। মা ঘুমুচ্ছেন। তবে ঘুমের মধ্যেও তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একজন মা তাঁর সন্তানের জন্যে এত ভালবাসা ধরে রাখেন ? আশ্চর্যতো! আমার কোলে যদি কখনো কোন বাবু আসে আমিও কি তাকে এত ভালবাসব ? এত ভালবাসা কি ঠিক ? না ঠিক না। সব ভালবাসাই পরিমিতির মধ্যে থাকা দরকার। এই যে আমি মা'র মাথার পাশে বসে আছি, তাঁর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি। মা ঘুমের মধ্যেই কাঁদছেন। তারপরেও যদি এই মুহূর্তে উনি এসে বলেন— "রুমালী! চল ঘুরে আসি।" আমি সঙ্গে সঙ্গে মা'কে ফেলে উঠে আসব। মা'র দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাব না। মানুষ কেন এমন বদলে যায় ? কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করতাম। এই বিশেষ ঘটনাটা কি সব মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে না শুধু আমার ক্ষেত্রে ঘটছে ? আমি কি আর দশজনের চেয়ে আলাদা, না-কি আমি আর দশজনের মত ? এটা কাকে জিজ্ঞেস করব ? কে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

ছেলেরা কি মেয়েদের মত ভালবাসতে পারে ? রাধা, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ভালবেসেছিলেন— কৃষ্ণ কি কখনো রাধাকে সেই ভাবে ভালবেসেছেন ? ভালবেসে থাকলে তিনি রাধাকে ফেলে চলে যেতে পারতেন না। আর রাধা বাকি জীবন "কৃষ্ণ কোথা ? কৃষ্ণ কোথা ?" বলে দেশ দেশান্তরে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে পারত না। অবশ্যি এইসব গল্পগাথা। গল্পে অনেক কিছু হয় বাস্তবে হয় না। আবার বাস্তবেও অনেক কিছু ঘটে যা গল্পে লেখা হয় না। এই যে মোসাদ্দেক স্যার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি পেঁচিয়ে মরে গেলেন। যে আভার জন্যে এই কাণ্ডটা করলেন সেই ঘটনায় আভার কিছুই হয় নি। তার জীবন সুন্দর মতই এগুচ্ছে। আভার মতো কোন কাণ্ড যদি আমি করে ফেলি তাতেও কারো কিছু হবে না। আমাদের ডিরেক্টর সাহেব আবারো ছবি করতে আসবেন। যখের ছবি, পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর ছবি। আমার মত আরেকটি মেয়ে চোখ বড় বড় করে তাঁর গল্প শুনবে। তিনি মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলবেন, তারপর খুকী তোমার নাম যেন কী ? মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে বলবে, আমার নাম কংকা।

'ও আচ্ছা কংকা। খুব সুন্দর নাম। তবে নামটা কিন্তু পেত্নীর।'

'পেত্নীর নাম ?'

'হ্যাঁ পেত্নীর নাম। ত্রৈলক্যনাথের একটা বই আছে—বইটা কংকাবতীকে নিয়ে লেখা। সেই কংকাবতী হল একটা পেত্নী।'

'ও আচ্ছা (মেয়েটি অভিভূত হতে শুরু করেছে)।'

'কংকা, তোমার বুদ্ধি কেমন ?'

'আমার বুদ্ধি খুব কম।'

'আচ্ছা তোমার আই কিউ টেস্ট করা যাক—তিনটা পিঁপড়া নিয়ে একটা ধাঁধা বলছি দেখি পার কি না।'

'আমি পারব না। আমার মোটেই বুদ্ধি নেই।'

'আমার ধারণা তোমার অনেক বুদ্ধি।'

'এ রকম ধারণা কেন হল ?'

'যাদের বুদ্ধি বেশি তারা তাকানোর সময় খুব সামান্য হলেও ভুরু কুঁচকে তাকায়। কপালে সূক্ষ্ম দাগ পড়ে।'

'আশ্চর্য জানতাম নাতো। ভুরু কুঁচকে তাকায় কেন ?'

'বুদ্ধিমানরা যে কোন দৃশ্য খুব ভাল ভাবে দেখতে চায়। তা করতে গিয়ে তার ভুরু কুচকে যায়। যারা সহজ সরল মানষ—কিংবা বোকা মানুষ তারা সরল

ভাবে তাকায়। তাদের ভুরু কখনো কুঁচকায় না, বা কপালেও কখনো দাগ পড়ে না। যেমন আমাকে দেখ। আমার কপালে দাগ পড়ে না। আমি তাকানোর সময় ভুরু কুঁচকাই না।'

' আপনি যদি বোকা হন তাহলে পৃথিবীর সবাই বোকা। আইনস্টাইনও বোকা।'

'আইনস্টাইনের স্ত্রীর নাম কী বলতো ?'

'জানি না।'

'কী আশ্চর্য এমন বিখ্যাত একজন মানুষ, তুমি তার স্ত্রীর নাম জান না ?'

'জ্বি না।'

'এই জন্যে তোমার কি লজ্জিত বোধ করা উচিত না ?'

'জ্বি উচিত। উনার স্ত্রীর নাম কী ?'

'আমি নিজেও জানি না।'

'আপনি জানেন না ?'

'না।'

'সত্যি জানেন না ?'

'না সত্যি জানি না।'

কংকা নামের মেয়েটা তখন অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তার কাছে এই মানুষটাকে তখন খুব কাছের মানুষ বলে মনে হতে থাকবে। আইনস্টাইনের স্ত্রীর নাম তিনি জানেন না বলে নিজেকে চট করে মেয়েটির স্তরে নামিয়ে আনলেন। এই কাজটা তিনি করলেন খুব সূক্ষ্ম ভাবে। শুধু তাই না, আরো কিছু খেলা তিনি খেলবেন—নিজেকে মাঝে মধ্যে মেয়েটির চেয়েও নিচের স্তরে নিয়ে যাবেন। মেয়েটিকে আনন্দিত হবার সুযোগ দেবেন। মেয়েটির যখন দিশেহারা অবস্থা হবে তখন আবার নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলবেন।

'বকু!'

আমি চমকে উঠলাম। আশ্চর্য মা ঘুমান নি! জেগে আছেন।

'ঘুমাও নি মা ?'

'ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

'আবার ঘুমিয়ে পড়।'

'খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি বকু।'

'বাজে স্বপ্নটা কী ?'

'স্বপ্নে দেখলাম তোর বাবাকে সাপে কেটেছে। বিষে তার শরীর নীল হয়ে গেছে।'

'দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কিছুই নেই মা। বাবাকে সাপে কাটে নি। সাপ খোপ নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছে বলেই এমন স্বপ্ন দেখেছ।'

'এরকম একটা বাজে স্বপ্ন কেন দেখলাম।'

'আমাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছ বলে এ রকম স্বপ্ন দেখেছ। আমাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কিচ্ছু নেই।'

'মা সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'স্কুল ঘরে কিচ্ছু হয় নি তাই না?'

'শুধু উনার ডান পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না— তাই। পা মাড়িয়ে দেয়া নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু না। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরি বলেছি।'

'বকু!'

'কী মা?'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'অস্থির লাগছে কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

'ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সকাল হোক— দেখবে তোমার কাছে সব স্বাভাবিক লাগতে শুরু করবে। রাতের বেলা সবকিছুই একটু অস্বাভাবিক লাগে।'

'তোর বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?'

'বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসবে?'

'হুঁ। তোর শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেও থাকল। সোহরাব ভাইকে বললে উনি তোর বাবাকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

'তোমার ধারণা খবর পেলেই উনি ছুটে আসবেন?'

'তোর কোন সমস্যা হয়েছে শুনলে সে থাকতে পারবে না। ছুটে চলে আসবে।'

'আমারতো কোন সমস্যা হয় নি মা।'

মা উঠে বসে শান্ত গলায় বললেন, হয়েছে। আমার মন বলছে তুই যে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলছিস, সেই ঘটনা ঘটেছে।

আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম। হাসির শব্দে মা'র অস্থিরতা একটু যেন কমল। তিনিও হাসলেন। আমি বললাম, দেখছ মা, আমি কত ভাল অভিনয় জানি। একটা ঘটনা তোমাকে কেমন বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছি। অভিনয় ভাল জানি না মা ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, মা আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। এতক্ষণ আমি তোমার সেবা করেছি, এখন তুমি আমার সেবা করবে। আমি ঘুমুব তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

'আচ্ছা ঘুমো।'

আমি শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা স্বপ্ন দেখলাম ঘুমের মধ্যে। আমি একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছি। ডিরেক্টর সাহেব আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। আমি তাকিয়ে আছি অন্যদিকে। সেখানে গোলগাল মুখের কোকড়ানো চুলের একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোলে একটা ফুটবল। ফুটবলটা সে ডলের মত বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। তিনি বললে, রুমালী তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখেছ ? ফুটবল কিনে দিয়েছি—একবারও সে ফুটবলটা মাটিতে নামিয়ে কিক দেয় নি। পুতুলের মত কোলে কোলে নিয়ে ঘুরছে। সে মেয়ে বলেই এই কাণ্ডটা করছে। ছেলে হলে এতক্ষণে সে ফুটবল খেলা শুরু করত।

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ তাই। মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাব প্রবল বলেই সব খেলনাই তাদের কাছে সন্তানের মত। যে কোন খেলনা মেয়েদের হাতে দাও দেখবে খেলনা কোলে নিয়ে তারা ঘুরবে। আমি ভেবেছিলাম তোমার মেয়েটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে। এটা দেখার জন্যেই তাকে ফুটবল কিনে দিয়েছিলাম।'

'তোমার মেয়ে তোমার মেয়ে করছ কেন ? এই মেয়েটাতো শুধু আমার একার না। তোমারও ।'

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—না তো— ও আমার হবে কেন ? এই মেয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?

তখনই আমার ঘুম ভাঙ্গল। বাইরে সকাল হচ্ছে। পাখি ডাকছে।

মা হাত পা এলিয়ে আমার পাশেই শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আমি মা'র মাথায় হাত রাখলাম। জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। আজ শুটিং শুরু হচ্ছে। হাত মুখ ধুয়েই আমাকে মেকাপে বসতে হবে। মা'কে ফেলে রেখে শুটিং এ চলে যাব। মা একা একা বিছানায় ছটফট করবেন।

আমি মেকাপ নিচ্ছি। সুবীরদা যন্ত্রের মত হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে চাপা টেনশান। আগের মেকাপের সঙ্গে আজকের মেকাপের মিল থাকতে হবে। মেকাপ কনটিনিউটি অনেক বড় ব্যাপার। মওলানা সাহেব আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আগ্রহ নিয়ে তিনি দৃশ্যটা দেখছেন। মেকাপ নেবার সময় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে খুব অস্বস্থি লাগে। এখন অবশ্যি লাগছে না। মওলানা সাহেবের বিস্ময় দেখতে ভাল লাগছে। যে কোন মানুষের বিস্ময় ও আনন্দ দেখতে ভাল লাগে। আমি মওলানা সাহেবের সঙ্গে টুকটাক গল্পও করছি।

মা জ্বরে প্রায় অচেতন হয়ে আছেন। তাঁর কথা এখন আর সেভাবে মনে পড়ছে না। মেকাপ ম্যান সুবীরদা ক্রমেই আমাকে দিলু বানিয়ে দিচ্ছেন। আমি যতই দিলু হচ্ছি ততই চারপাশের জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। পুরোপুরি যখন দিলু হয়ে যাব তখন আর রুমালীর জগৎ নিয়ে ভাবব না। আমার জগৎটা চলবে দিলুর মত। দিলু খুব হাসি খুশি। সে সবার সঙ্গেই কথা বলে। অকারণে কথা বলে।

'মওলানা সাহেব!'

'জ্বি আম্মাজী ।'

'আপনি দেখি মেকাপ দেয়ার সব কৌশল শিখে ফেলছেন।'

মওলানা সাহেব হাসলেন। তাঁর হাসি সুন্দর। হাসির মধ্যে শিশু শিশু ভাব আছে। দিলুর সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর কিছু মিল আছে। তাঁর কৌতূহল বেশি। তিনি কথা বলতে পছন্দ করেন।

আমি বললাম, মওলানা সাহেব ! মেকাপ নেয়া কি গুনাহ্‌র কাজ ?

'গুনাহ হবে কেন ?'

'আল্লাহ্ যে চেহারা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই চেহারা বদলে ফেলা হচ্ছে এটা গুনাহ্ না ?'

'আমি এত কিছু জানি না মা। আমার জ্ঞান বুদ্ধি খুবই কম। তবে মেকাপ দিয়ে চেহারা সুন্দর করা হয়— এর মধ্যে দোষের কী ? আল্লাহ্ পাক সুন্দর পছন্দ করেন।'

'সুন্দর পছন্দ করেন কেন ?'

'কারণ তিনি সুন্দর।'

'তিনি সুন্দর আপনাকে কে বলল ?'

'কেউ বলে নাই। আমার অনুমান।'

সুবীরদা বিরক্ত মুখে বললেন, মওলানা সাহেব এখান থেকে যান। আমার অসুবিধা হচ্ছে। মেকাপ নিতে নিতে আর্টিস্ট যখন কথা বলে তখন চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। সেই ভাঁজ উঠতে চায় না।

মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জ্বি আচ্ছা জনাব যাচ্ছি। তিনি লজ্জিত মুখে চলে যাচ্ছেন। আমার মায়া লাগছে। সুবীরদা এমন কঠিন আচরণ কখনো করেন না। আজ করছেন, কারণ আজ তাঁর মন খারাপ। আমার আগে তিনি পাপিয়া ম্যাডামকে মেকাপ দিয়েছেন। ম্যাডাম তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। মেকাপ শেষ হবার পর ম্যাডামের হাতে আয়না দেয়া হল। তিনি আয়নায় কিছুক্ষণ নিজেকে দেখে বললেন, এটা কী মেকাপ দিয়েছ ? আমি কি সার্কাসের সঙ ? এই বলে তিনি থেমে থাকেন নি— আয়না ছুঁড়ে ফেলেছেন। আয়নাটা ঘাসের উপর পড়েছে বলে ভাঙ্গে নি। পাপিয়া ম্যাডাম বলেছেন, মেকাপ তুলে আবার দাও। মন বসিয়ে কাজ কর। কাজ করবে বাংলাদেশে মন পড়ে থাকবে কোলকাতায় তাতো হবে না।

সুবীরদা পাপিয়া ম্যাডামের মেকাপ তুলে আবার মেকাপ দিলেন। এরপরেও যে তিনি শান্ত ভঙ্গিতে আমার মেকাপ দিতে পারছেন তাই যথেষ্ট। সুবীরদা না হয়ে অন্য কেউ হলে পারত না।

'সুবীরদা!'

'কী মা ?'

'আপনার মন খারাপ ভাব কি কমেছে ?'

'পাপিয়া ম্যাডামের ব্যাপারটার কথা বলছ ?'

'জ্বি।'

'দূর কোন মন খারাপ না। ছোট কাজ যারা করে তাদের এইসব অপমান গা সহা। যখন অপমানটা করে তখন কষ্ট হয়। তারপর আর কষ্ট থাকে না।'

'এখন নেই ?'

'একটু একটু আছে।'

'একটু একটু আছে কেন ?'

'ঐ যে ম্যাডাম বললেন, কাজ কর বাংলাদেশে মন পড়ে থাকে কোলকাতায় এই জন্যে। আমাদের স্বজাতির অনেকেই ভারতে চলে গেছে এটা যেমন ঠিক আবার অনেকেই মাটি কামড়ে এখানে পড়ে আছে এটাও ঠিক। কেউ যখন বলে তোমার মন পড়ে আছে কোলকাতায় তখন তারাই মনে করিয়ে দেয় যে বাংলাদেশটা পুরোপুরি আমার না।'

'সুবীরদা, মানুষ রাগ করে যে কথা বলে সে কথা ধরতে নেই।'

'মাগো রাগের সময়ই মানুষ সত্য কথাগুলি বলে। মনের ভেতর চাপা পড়ে থাকা কথা তখন বের হয়ে আসে।'

'আপনি ঠিক বলেন নি। রাগের সময় আমরা সব সময় উল্টা পাল্টা কথা বলি। মা খুব রেগে গেলে আমাকে বলেন— "তুই মর। তুই মরলে আমার শান্তি হয়।" আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না যে মা আমার মৃত্যু চান।'

'না বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে কি আপনি স্বীকার করলেন যে রাগের সময়ই মানুষ ভুল কথাগুলি বলে ?'

সুবীরদা হেসে ফেলে বললেন, হ্যাঁ স্বীকার করলাম। তোমার বুদ্ধি খুব ভাল। ধারাল বুদ্ধি।

'ধারাল বুদ্ধিটা কী ?'

'যে বুদ্ধি কেটে কেটে যায়— সেটাই ধারাল বুদ্ধি।'

'বুদ্ধি তাহলে অনেক প্রকার ?'

'অবশ্যই। শান্তি-বুদ্ধি যেমন আছে অশান্তি-বুদ্ধিও আছে। শান্তি-বুদ্ধির কেউ তোমায় আশে পাশে থাকলে তোমার শান্তি শান্তি লাগবে। অশান্তি-বুদ্ধির কেউ তোমার আশে পাশে থাকলে তোমার অশান্তি লাগবে।'

'আমার কোন ধরনের বুদ্ধি ?'

'ঐ যে বললাম, ধারাল বুদ্ধি।'

'শান্তি-বুদ্ধি, না অশান্তি-বুদ্ধি ?'

'অশান্তি-বুদ্ধি !'

আমি হেসে ফেললাম। সুবীরদাও হাসছেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার আমি কত সহজ ভাবে হাসছি। গল্প করছি। অথচ আমার মা জ্বরে ছট্‌ফট্‌ করছেন। এতক্ষণে তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে নি। আমি দিলু হয়ে যেতে শুরু করেছি। মেকাপ শেষ হবার পর দিলুর পোশাকটা পরব। দিলু হবার দিকে আরকটু এগুব।

সোহরাব চাচা গম্ভীর মুখে আমার দিকে আসছেন। তিনি একই সঙ্গে গম্ভীর এবং বিরক্ত। অথচ তাঁরই এখন সবচে হাসি খুশি থাকার কথা। লোকজন সব চলে এসেছে। ডিরেক্টর সাহেব সুস্থ। পুরোপুরি শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। জেনারেটারের অভাবে রাতের কাজ আগে কিছু হয় নি। জেনারেটার চলে এসেছে। এখন রাতেও কাজ হবে। শুটিং বন্ধ থাকায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে।

'রুমালী।'

'জ্বি চাচা।'

'স্যার তোমাকে ডাকছেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার মা'র যে এত জ্বর সেটাতো তুমি আমাকে বল নি। অসুখ বিসুখ হলে আমাকে জানাবে না ?'

'আপনি এত ব্যস্ত। আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করছিল না।'

'এটাতো বিরক্ত হবার কিছু না। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যাই হোক, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ডাক্তার চলে আসবেন। জালালের মা'কে বলে এসেছি মাথায় পানি ঢালতে।'

'থ্যাংক য়্যু চাচা ।'

' স্যার কী বলে শুনে, মা'র কাছে গিয়ে বোস। সব রেডি হলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

সোহরাব চাচা চলে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলাম, চাচা একটা কথা শুনে যান। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আজ আপনি আমার সঙ্গে এমন রেগে রেগে কথা বলছেন কেন ? প্লীজ রেগে থাকবেন না। আপনি রেগে থাকলে আমার অভিনয় খারাপ হবে।

সোহরাব চাচা আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, রুমালী তোমার অভিনয় খারাপ হবে না। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের মধ্যে তুমি একজন। যে কোন অবস্থায় তোমার অভিনয় ভাল হবে।

সুবীরদা একটা ভেজা কাপড় আমার মুখের উপর দিয়ে দিলেন। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি। আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের একজন, সোহরাব চাচা এই কথা কেন বললেন, তা বের করার চেষ্টা করছি। তিনি কি কিছু জানেন ? না কিছু অনুমান করেছেন ?

ডিরেক্টর সাহেবকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে তাঁর বয়স দশ বছর কমে গেছে। তিনি ধবধবে শাদা প্যান্টের উপর লাল-নীল স্ট্রাইপ দেয়া হাফ সার্ট পরেছেন। আজ কি তিনি চুল অন্যরকম করে আঁচড়েছেন ? তাঁকে একটু যেন অচেনা লাগছে। তাঁর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। এই ভদ্রলোকের চশমা প্রীতি আছে। তাঁর অনেকগুলি চশমা। তিনি একেক সময় একেক চশমা পরেন। তিনি আমাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, রুমালী তোমার খবর কী ?

ঝড় বৃষ্টির রাতে স্কুল ঘরের কথা তাঁর কি কিছু মনে নেই ?

আমিও তাঁর মতই সহজ এবং স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছি। পারছি না। আমার হাত পা ভারী হয়ে আসছে। গলার স্বর বসে যাচ্ছে। সোহরাব চাচার কথা মত আমি যদি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েও থাকি— এই মানুষটার সামনে সহজ হবার সাধারণ অভিনয় করতে পারছি না। কিংবা কে জানে সহজ হবার অভিনয়ই হয়তো সবচে কঠিন।

'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলার জন্যে ডেকেছি।'

'বলুন।'

'বোস। জরুরি কথাটা এমন না যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে।'

আমি বসলাম। তিনি চেয়ার টেনে আমার সামনে বসলেন। হাসি মুখে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, জরুরি কথার আগে জরুরি না এমন একটা জিনিস দেখ। আমার হাতে এটা কী দেখ ? নাও হাতে নিয়ে দেখ। এটা হচ্ছে একটা বুনো ফল। ফলটার নাম হল — মন-ফল। ইংরেজী করলে হবে Mind-Fruit.

'মন-ফল ?'

'হ্যাঁ মন-ফল। পাহাড়ি অঞ্চলের গাছে হয়। কাঁটায় ভর্তি গাছ। ঢল যখন নামে তখন পানিতে ভেসে আসে।'

কাগজী লেবুর সাইজের ফলটা আমি হাতে নিলাম। পচা টাইপ গন্ধ আসছে। বুনো ফলের বুনো গন্ধ। আমি বললাম, ফলটার বিশেষত্ব কী ?

'কাচা অবস্থায় ফলটা বিষাক্ত। যখন পাকে তখন অল্পবয়েসী মেয়েরা ফলটা খুব আগ্রহ করে খায়। তখন তাদের 'মন' না-কি অন্য রকম হয়ে যায়। এই

জন্যেই ফলটার নাম মন–ফল Mind-Fruit. মেয়েরা এই ফল লুকিয়ে চুরিয়ে খায়।'

'শুধু মেয়েরাই খায় ? ছেলেরা খায় না।'

'শুনেছি ছেলেরা খায় না। তাদের উপর ফলের তেমন প্রভাবও নেই। ফলটা অবিবাহিত কুমারী মেয়েদেরই প্রিয়। তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?'

'জ্বি লাগছে।'

'আমার ধারণা এই ফলে কোন হেলুসিনেটিং ড্রাগ-ট্রাগ আছে। মাইন্ড অলটারিং ড্রাগ, ধুতরায় যেমন আছে তেমন। ঠিক করেছি ফলের কার্যকারিতা আমি পরীক্ষা করে দেখব।'

'খাবেন ?'

'হ্যাঁ খাব।'

'আপনিতো বললেন, ছেলেদের উপর কোন প্রভাব পড়ে না।'

'এই জন্যেই বেশি করে খাব। আমি গোটা চারেক ফল জোগাড় করতে বলেছি। সহজে পাওয়া যায় না।'

'এই ফলটা কি পাকা ?'

'বাইরের খোসা সবুজ হলেও ফলটা না-কি পাকা।'

'আপনার খেয়ে দরকার নেই। আমাকে দিন—আমি খেয়ে কী হয় আপনাকে বলব।'

'আরে না। তুমি কী খাবে! আমি আগে পরীক্ষা করে নেই। ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে তখন তোমাকে বলব। এই সব পরীক্ষা মাঝে মাঝে খুব ফ্যাটালও হয়। সিদ্ধির শরবত খেয়ে একবার প্রায় মরতে বসেছিলাম। গল্পটা শুনবে ?

আমি গল্পটা শুনতে চাচ্ছি না। কারণ আমি দ্রুত দিলু হয়ে যাচ্ছি। দিলু অন্যের গল্প শুনতে তেমন আগ্রহী না। সে নিজের গল্প করতে চায়। আমার অনেক গল্প আছে যা আমি উনাকে শুনাতে চাই। মুখে সাবানের ফেনা নিয়ে ফুঁ দিয়ে আমি খুব সুন্দর বাবল বানাতে পারি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে মুখ থেকে একের পর এক বেলুন বের হচ্ছে। কিন্তু উনি নিজেই এখন গল্প করবেন। সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরানো মানে লম্বা গল্পের প্রস্তুতি।

'সে এক মজার গল্প। না মজার না, টেনশানের গল্প। এখনো মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। এই দেখ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

তিনি হাত এগিয়ে দিলেন। হাতের লোম সত্যি খাড়া হয়ে আছে।

আমি হাসলাম, তিনি গল্প শুরু করলেন। খুব আগ্রহ করে যে গল্পই বলা হোক শুনতে ভাল লাগে। অসাধারণ গল্পও অনাগ্রহের সঙ্গে বললে শুনতে ভাল লাগে না। ডিরেক্টর সাহেব সব গল্পই খুব আগ্রহের সঙ্গে করেন। তবে আমার সমস্যা হচ্ছে—আমি উনার কোন গল্পই মন দিয়ে শুনতে পারি না। গল্পের মাঝামাঝি জায়গায় সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মনে হয় তিনি অনেক দূর থেকে কথা বলছেন। তাঁর চেহারা অস্পষ্ট হয়ে আসে। কেন এ রকম হয় ?

'রুমালী শোন, সিদ্ধির সরবতের ব্যাপারটা তোমাকে বলি— শাক্ত হিন্দুরা কালীপূজার রাতে এই সরবত তৈরি করে। মহাদেব শিব তাঁর সঙ্গী নন্দি ভৃঙ্গিকে নিয়ে এই সরবত খেতেন বলে শিবের অনুসারিরাও পূজার অঙ্গ হিসেবে খায়। পেস্তা বাদাম পিশে, দুধ চিনি মিশিয়ে এই সরবত তৈরি করা হয়। ঘটিতে করে বরফ কুচি মিশিয়ে পরিবেশন করে। খেতে অতি স্বাদু। তবে সরবতের আসল ইনগ্রেডিয়েন্ট ধুতরো পাতার রস। ধুতরো পাতা কচলে সেই রস সরবতে মিশিয়ে দেয়া হয়। ফল ভয়াবহ। ধুতরো পাতার রসে আছে—পাওয়ারফুল মাইন্ড অলটারিং হেলুসিনেটিং ড্রাগ। যে খায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জগৎটা যায় পাল্টে। সে ভয়ংকর ভয়ংকর সব জিনিস দেখতে থাকে।'

'কী রকম ভয়ংকর ?'

'নির্ভর করে সরবতটা কে খেয়েছে তার মানসিকতার উপর। কেউ ভূত-প্রেত দেখে, কেউ দেখে তার আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।'

'আপনি কী দেখেছিলেন ?'

'আমি দেখলাম আমার দু'টা হাত লম্বা হতে শুরু করেছে। হাতটা যেন রবারের। কেউ টানছে আর লম্বা হচ্ছে। গল্পে জ্বীনের হাতের কথা পড় না ? জ্বীন খেতে বসেছে। কাগজি লেবু দরকার। লম্বা হাত বাড়িয়ে বাড়ির উঠোনের কোণার কাগজি লেবু গাছ থেকে লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এল। সেই রকম।'

'অদ্ভুত তো !'

'অদ্ভুততো বটেই।

'সিদ্ধির সরবত খাবার পরই গাছ গাছড়ার ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল হয়। এই বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করি। বোটানীর ছাত্র না হয়েও—গাছ গাছড়া সম্পর্কে আমি অনেক জানি। প্রমাণ দেব ?'

'না প্রমাণ দিতে হবে না। প্রমাণ দেবেন কেন ? আপনি যা বলবেন, আমি তাই বিশ্বাস করব।'

'যে যা বলে তুমি কি তাই বিশ্বাস কর ?'

'না।'

'সিদ্ধির সরবতের গল্পটা তোমার মনে হয় ভাল লাগে নি।'

'আপনার এ রকম মনে হচ্ছে কেন ?'

'যাদেরকেই আমি সিদ্ধির সরবত খাবার গল্পটা বলেছি তারাই গল্পের এক পর্যায়ে বলেছে—আমি একটু খেয়ে দেখতে চাই। কোথায় পাওয়া যায় ? তুমি কিছু বল নি।'

'আপনি কি একই গল্প সবাইকে করেন ?'

'আমি একা কেন সবাইতো তাই করে। সব মানুষেরই তার নিজের কিছু গল্প থাকে। এই গল্পগুলিই সে সবাইকে করে।'

'ও।'

'আচ্ছা দেখি তোমার জ্ঞান। বল কত রকমের শাক আমাদের দেশে পাওয়া যায় ?'

'জানি না।'

'অবশ্যই জান। অন্তত কিছু কিছুতো জান—পুঁই শাক, লাল শাক, কলমী শাক, পালং শাক.... এর বাইরে কী জান ?'

'এর বাইরে কিছু জানি না।'

'আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে কিছু শাকের নাম শুনিয়ে দেই.... সরিষা শাক, জয়ন্তি শাক, গুলঞ্চ শাক, হিঞ্চ শাক, ঘেঁটু শাক, সুষনি শাক, কালকাসুন্দে শাক, বেতো শাক, লাউ শাক, শেভেঞ্জে শাক....। এদের মধ্যে একটা শাক আছে যা খেলে পাগল ভাল হয়। মনোবিকারগ্রস্তদের বিকার কমে। শাকটার নাম হল সুষনি শাক। বোটানিক্যাল নাম হল—Marsilea quadrifolia. তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে কি-না বল ?'

'লাগছে।'

'ভেরি গুড। আচ্ছা এখন যাও—আমাদের ক্যামেরা ওপেন করার সময় হয়ে এসেছে।'

'আপনি কী জরুরি কথা যেন বলবেন বলেছিলেন।'

'জরুরি কথা ? ও— হ্যাঁ জরুরি কথা। আচ্ছা এখন থাক—পরে বলব। অনেক অপ্রয়োজনীয় কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা প্রয়োজনীয় কথা, শুনতেও ভাল লাগে না। বলতেও ভাল লাগে না।'

আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তিনি খুব অস্বস্থি বোধ করছেন। না অস্বস্থি না, অস্থিরতা। মনে হচ্ছে তিনি কোন কিছুতে মন বসাতে পারছেন না। চেয়ারে

বসেছিলেন, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসলেন। ড্রয়ার খুলে সোনালী ফ্রেমের চশমা বের করে পরলেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন। এই চশমাটাও তাঁর পছন্দ হল না। তিনি ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন। ড্রয়ারের জিনিসপত্র নামাচ্ছেন। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন— রুমালী তোমার সঙ্গে কি নীরার কথা হয়েছে ?

'জ্বি হয়েছে।'

'কী ধরনের কথা ?'

'সাধারণ কথা।'

'সাধারণ কথার ফাঁকে সে কি বলেনি— আমি অসুস্থ ?'

'জ্বি বলেছেন।'

'কী ধরনের অসুস্থ তা বলে নি ?'

'জ্বি না।'

'তুমি জানতে চাও নি ?'

'জ্বি না।'

'তোমার কাছে কি আমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে ?'

'জ্বি-না।'

'অনেক অসুখ আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমি আসলেই অসুস্থ।'

তিনি আবার আগের জায়গায় এসে বসেছেন। এখন তাঁকে শান্ত মনে হচ্ছে। অস্থিরতা কেটে গেছে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ক্লান্ত গলায় বললেন— নীরা যুক্তি-তর্ক খুব ভাল পারে। সে তার যুক্তি দিয়ে নিমিষের মধ্যে প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমি সুস্থ আবার প্রমাণ করতে পারে আমি অসুস্থ। ও অনেকটা গার্গীর মত।

'গার্গী কে ?'

'প্রাচীন ভারতের এক মেয়ে, যাজ্ঞবল্ক্য নামের এক মহাজ্ঞানী পন্ডিতকে যুক্তিতে হারিয়ে সে লেজেগোবরে করে দিয়েছিল। তর্কে হেরে ভূত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য শেষ পর্যন্ত বললেন— গার্গী তুমি প্রশ্নের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি যদি না থাম তাহলে তোমার মাথা খসে পড়বে। পৌরাণিক গল্প।'

আমার ইচ্ছা করছিল বলি, তর্কে হেরে আপনিও কি যাজ্ঞবল্ক্যের মত বলেন— তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি থাম নয়তো তোমার মাথা খসে পড়বে। তা বললাম না। কুণ্ঠিত গলায় জানতে চাইলাম, আজ আমার কোন অংশটা হবে?

'সবাইকেইতো সবারটা বলেছি। তোমাকে বলা হয় নি ?'

'জ্বি না।'

'আচ্ছা পরে বলব।'

'পরে কেন। এখনি বলুন। আমি নিজের মনে একটু ভাবব।'

তিনি চিন্তিত মুখে আরেকটা সিগারেট হাতে নিলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিগারেটে আগুন ধরালেন। সিগারেটে টান দিয়ে খুব কাশতে লাগলেন। জীবনের প্রথম সিগারেটে টান দিলে মানুষ যে ভাবে কাশে তিনি সেই ভাবে কাশছেন। মনে হচ্ছে তাঁর জগৎটা আবারো এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি এ রকম করছেন কেন ?

'দিলুর যে অংশটা আজ শুট করা হবে সেটা হচ্ছে সিক্যোয়েন্স ওয়ান হানড্রেড থার্টি টু। দিলুর এক কাল্পনিক বান্ধবী আছে— Imaginary friend. তার নাম তৃণা। দিলু যখন কোন ব্যাপারে খুব আপসেট হয় তখন সে কোন এক নির্জন জায়গায় চলে যায়। তার কল্পনার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে। ঐ অংশটা।'

'কল্পনার বান্ধবীকে কি সত্যি সত্যি দেখানো হবে ?'

'না দেখানো হবে না। দিলুর এই কাল্পনিক বান্ধবী কখনো দিনে আসে না। আসে রাতে। কাজেই আমি কী করব শোন— দিলুকে রাতে আধো আলো, আধো অন্ধকারে বসিয়ে দেব। লাইট সোর্স এমন রাখা হবে যেন দেয়ালে দিলুর দু'টা ছায়া পড়ে। দিলু তার একটা ছায়ার সঙ্গে কথা বলবে। দিলু এবং তার দু'টা ছায়াকে নিয়ে থ্রি শটে শুট করা হবে। থ্রি শট থেকে টু শট। দিলু এবং দিলুর একটা ছায়া। টু শট থেকে— সিঙ্গেল শট। ক্লোজ আপ। দিলুর ক্লোজ আপ, ছায়ার ক্লোজ আপ।

'বাহ্ সুন্দর তো।'

'সুন্দরতো বটেই। মানুষ এবং তার ছায়া নিয়ে টু শট বানানো— কনসেপ্ট হিসেবে ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা তুমি এখন যাও।'

'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'না শরীর খারাপ না। I am just fine.'

আমি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ঘরের বাইরেই সোহরাব চাচা। দেখে মনে হল তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাঁর মুখ আগের মতই বিরক্ত ও বিষণ্ণ। মনে হচ্ছে তিনি রেগেও আছেন। কার উপর রেগে আছেন ? আমার উপর ? সোহরাব চাচা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। আমি বললাম, চাচা আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ? সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন, হ্যাঁ বলব। স্যারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে ?

'হ্যাঁ।'

'কী কথা হয়েছে ?'

'শাক নিয়ে কথা হয়েছে। বাংলাদেশে কত রকম শাক পাওয়া যায় এইসব।'

'আর কোন কথা হয় নি ?'

'না।'

'শাক সব্জির বাইরে কোন কথা হয় নি ?'

'জ্বি না। কী কথা হবে ?'

সোহরাব চাচা জবাব দিলেন না। তিনি হন হন করে উল্টো দিকে যাচ্ছেন। খুব সম্ভব ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে যাচ্ছেন। কোন সমস্যা কি হয়েছে ? আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা ? হোক সমস্যা। আমি মা'র ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

আশ্চর্য মা'র ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছ না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাকবাংলোর সামনে একটা জীপ গাড়ি এসে থেমেছে। জীপ থেকে বেশ কিছু অচেনা মানুষজন নামছে। এদের মধ্যে একট মেয়ে আমার বয়েসী। খুব মিষ্টি চেহারা। মাথাভর্তি কোকড়ানো চুল। মেয়েটি অভিভূতের মত চারদিকে তাকাচ্ছে। একবার তাকাল আমার দিকে। আমি হাসলাম। এত দূর থেকে সে নিশ্চয়ই আমার হাসি দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে তার ভাল লাগতো। সে দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকাতেই আমি হাত নাড়লাম। দিলু হলে তাই করতো। মেয়েটি এখন অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। সোহরাব চাচা ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীপের ড্রাইভার বড় বড় স্যুটকেস টেনে নামাচ্ছে। এরা মনে হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে।

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়েটা উঠোনে একা একা হাঁটছে। এর সঙ্গে আমার এখনো কথা হয় নি। আজ কোন এক ফাঁকে তার সঙ্গে ভাব করব। একী মেয়েটা বিড় বিড় করে কথা বলছে নাকি ? কা'র সঙ্গে কথা বলছে ? কল্পনার কোন বান্ধবী। দিলুর মত তারও কি কোনো ইমাজিনারি ফ্রেন্ড আছে ?

আমি মা'র ঘরে ঢুকলাম। ঘরে মা একা। তাঁর মাথায় পানি দেয়া হয়েছে। চুল ভেজা। মা চাদর গায়ে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই চোখ মেললেন। তাঁর চোখ টকটকে লাল। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, বকু একটা গাড়ি এসে থেমেছে না ? শব্দ শুনলাম। আমি বললাম, হ্যাঁ।

'কে এসেছে তোর বাবা ?'

'বাবা আসবে কীভাবে ? বাবার কি আসার কথা ?'

'সোহরাব ভাইকেতো বলেছি উনাকে খবর দিতে।'

'উনি খবর পাঠালেও বাবার আসতে আসতে দু'তিন দিন লাগবে।'

'দু'তিনদিন লাগবে কেন ? ঢাকা থেকে এখানে আসতে পাঁচ ছ'ঘন্টা লাগে। পাগলের মত কথা বলিস কেন ?'

'মা তোমার জ্বর মনে হয় খুবই বেশি। তুমিতো কথাই বলতে পারছ না। তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।'

আমি মা'র কপালে হাত রেখে চমকে উঠলাম—জ্বর আসলেই বেশি। পানি ঢেলে কোন লাভ হয় নি। জ্বর কমে নি। মা'র শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। কেমন টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন।

'জীপে করে কে এসেছে বকুল ?'

'জানি না মা।'

'জীপের শব্দ শুনে মনে হল তোর বাবা এসেছে।'

'একবারতো বলেছি মা, বাবা আসে নি।'

'তোর বাবা এলে থাকবে কোথায় ?'

'এই ঘরেই থাকবে, আর থাকবে কোথায় ?'

'আরে না। তা কী করে হয়! তোর বাবার সঙ্গে আমি কি আর এক ঘরে থাকতে পারি ? তুই আর তোর বাবা এইখানে থাকিস। আমি অন্য কোথাও চলে যাব।'

'বাবা এসে কোথায় থাকবে সেটা নিয়ে তোমাকে এখন মাথা গরম করতে হবে না। বাবা আসুক তারপর দেখা যাবে। আমার মেকাপ কেমন হয়েছে মা ?'

মা আমার দিকে না তাকিয়েই অনাগ্রহের সুরে বললেন, ভাল।

'তুমি কী ভাবছ মা ?'

'কিছু ভাবছি না। আচ্ছা শোন, তোর বাবা আবার সঙ্গে করে ঐ ধুমসী মাগীটাকে আনবে নাতো ?'

'আনতেও পারে। মা শোন—"ধুমসী মাগী" টাইপ কথা বলো নাতো শুনতে খারাপ লাগে।'

'ধুমসী মাগীকে কী বলব—শুকনো মাগী বলব ?'

'আচ্ছা ঠিক আছে—যা বলতে ইচ্ছে করে বলো।'

মা শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে আছেন। যেন হাত ছেড়ে দিলেই আমি কোথাও চলে যাব। আমাকে আটকে রাখতে হবে।

'মা তোমার কি খুব বেশি খারাপ লাগছে ?'

'হুঁ।'

'পানি খাবে ?'

'খাব।'

আমি মা'কে পানি এনে দিলাম। মা খেতে পারলেন না। একটু মুখে দিয়েই রেখে দিলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, বকু পানিটা ভয়ংকর তিতা লাগছে। পানি তিতা লাগা খুব অলক্ষণ। মৃত্যুর আগে আগে আল্লাহ্ পাক পানি থেকে স্বাদ উঠিয়ে নেন। পানি তিতা বানিয়ে দেন।

'কত অদ্ভুত কুসংস্কারের মধ্যে যে তুমি বাস কর না মা। রাগ লাগে। জ্বর-জ্বারি হলে পানি তিতা লাগে। পানি কেন সব খাবারই তিতা লাগে।'

'এই তিতা সেই তিতা না-রে মা। অন্য রকম তিতা।'

'মা চুপ কর। তোমার কথাবার্তা অসহ্য লাগছে। সামান্য জ্বর হয়েছে— আর তুমি কী শুরু করেছ !'

মা অনেক কষ্টে পাশ ফিরলেন, একটা হাত আমার কোলে দিলেন। মা'কে দেখে আমার এখন ভয়ংকর মায়া লাগছে। ইচ্ছে করছে আমিও মা'র সঙ্গে চাদরের নীচে চলে যাই। মা'কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি। দিলুতো তাই করবে। সে মা'কে এই অবস্থায় ফেলে কোথাও যাবে না।

'বকু!'

'কী মা ?'

'তোর বাবার খুব ভাল একটা গুণ কী জানিস ? অসুখ বিসুখে সে খুব সেবা করতে পারে। আমাদের একটা কাজের ছেলে ছিল রুসমত নাম। তার একবার টাইফয়েড হল। উঠে বসতে পারে না, নড়তে চড়তে পারে না এমন অবস্থা। তোর বাবা তাকে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিত। সেই ছেলে এমনই হারামজাদা তোর বাবার পকেট থেকে একদিন মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল।'

'মা তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।'

'আমার কোন অসুখ বিসুখে তোর বাবা খুবই অস্থির হয়ে পড়ত। অফিস কামাই দিয়ে ঘরে বসে থাকত।'

'ভাল। বাবার পত্নী প্রেমের কথা শুনে আমি মুগ্ধ।'

'আমি মাঝে মাঝে অসুখের ভান করতাম। অসুখ বিসুখ কিচ্ছু না। সকালবেলা তোর বাবার অফিসে যাবার সময় শুয়ে পড়ে উহ্ আহ্।'

'এইসব ন্যাকামীর কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না মা। চুপ কর।'

'আচ্ছা যা— চুপ করলাম।'

'তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতো মা। আমি সোহরাব চাচাকে ডাক্তারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আসি।'

আমি মা'র ঘর থেকে বের হয়েই দেখি সোহরাব চাচা ডাক্তার নিয়ে এদিকেই আসছেন। অল্পবয়সের একজন ডাক্তার। দেখে মনে হয় কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সোহরাব চাচা বললেন, রুমালী তুমি আমার ঘরে গিয়ে একটু বোস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি ডাক্তারকে রুগী দেখিয়ে আসি।

'রুগী দেখার সময় আমিও সঙ্গে থাকি।'

'তোমার সঙ্গে থাকার কোন দরকার নেই। তোমাকে যা করতে বলছি কর।'

আমি সোহরাব চাচার ঘরের দিকে রওনা হলাম। চারদিক কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে ক্যাম্প খালি— কেউ নেই। একজন লাইটবয় ইলেকট্রিক তার নিয়ে কী যেন করছে। তাকে বললাম, লোকজন সব কোথায় ?

সে বলল, শুটিং স্পটে চলে গেছে আপা।

'কখন গেছে।'

'দশ পনেরো মিনিট আগে।'

আমাকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেল কেন ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সোহরাব চাচা গম্ভীর ভঙ্গিতে চৌকির উপর বসে আছেন। আমি তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছি। সোহরাব চাচার হাতে মগভর্তি চা। তিনি ঘন ঘন চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছেন। চা তাঁর অপছন্দের পানীয় বলে জানতাম। আজ দেখি তিনি আগ্রহ করেই চা খাচ্ছেন।

আমি বললাম, ডাক্তার কী বলেছে সোহরাব চাচা ?

'বলেছে— প্রেশার খুব হাই। জ্বর কমার অষুধ দিয়েছে। আশংকা করছে নিউমোনিয়া। এরা নতুন ডাক্তার কেঁচো দেখলে ভাবে সাপ। আমার ধারণা সন্ধ্যার মধ্যে জ্বর কমবে। তুমি থাক তোমার মা'র পাশে— তাঁর সেবা যত্ন কর। রোগের আসল চিকিৎসা সেবা যত্ন। অষুধ রোগের কোন চিকিৎসা না।'

'আমি থাকব কী করে ? আজ আমার শুটিং হবে !'

সোহরাব চাচা কথা না বলে চায়ের কাপে ঘন ঘন কয়েক বার চুমুক দিলেন। কেশে গলা পরিষ্কার করে হুট করে বললেন, বকুল শোন— আসল ব্যাপারটা তোমাকে বলি। তোমাকে ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

আমার উচিত ছিল প্রচন্ড ধাক্কা খাওয়া। কেন জানি ধাক্কা খেলাম না। হয়ত আমার অবচেতন মন ব্যাপারটা আগেই বুঝে ফেলেছিল। কিংবা আমি হয়ত অসাধারণ অভিনেত্রী। বড় বিপর্যয়েও শান্ত থাকার অভিনয় করছি। আমি শান্ত গলায় বললাম, আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'যেসব অংশ শুট করা হয়েছে সেগুলি কী হবে?'

'রিশুট হবে।'

'নতুন যে মেয়েটা এসেছে সেই আমার অংশ করবে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার নাম কী?'

'ওর নাম তিথি। তিথিকণা।'

'ও।'

'তুমি বাদ পড়লে কেন জানতে চাও না?'

'জ্বি না। বাদ পড়েছি এইটাই বড় কথা। কেন বাদ পড়েছি এটা বড় কথা না।'

সোহরাব চাচা চায়ের মগ নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বললেন, নীরা ম্যাডাম তোমাকে বাদ দেবার কথা বলে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথার বাইরে যাবার সাধ্য স্যারের নেই। নীরা ম্যাডাম এই ছবির প্রযোজক।

'বুঝতে পারছি। ডিরেক্টর সাহেব যে জরুরি কথাটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা কি এটাই যে আমি বাদ পড়েছি?'

'হুঁ। স্যার বলতে পারেন নি বলেই আমাকে বলতে হল।'

'আমরা কি এখন ঢাকায় চলে যাব?'

'তোমার মা'র শরীরটা একটু ভাল হোক— তারপর যাও। আমি গাড়ি দিয়ে দেব।'

'গাড়ি লাগবে না। বাসে তুলে দিলেই আমরা চলে যেতে পারব। চাচা শুনুন— আমি যে বাদ পড়েছি এটা এখন মা'কে শুনানোর দরকার নেই। মা'কে বললেই হবে যে আমার অংশ শেষ। অসুস্থ অবস্থায় মা যদি শোনেন আমি বাদ পড়েছি খুব কষ্ট পাবেন।'

'ঠিক আছে তাকে কিছু বলার দরকার নেই। সবাইকে বলে দেব তাঁকে কিছু না জানাতে।'

'আমি যে বাদ পড়েছি এটা সবাই জানে?'

'হ্যাঁ জানে।'

'কী কারণে বাদ পড়েছি এটা জানে ?'

'স্যার বলেছেন— তুমি অভিনয় খুব ভাল করলেও চরিত্রটার গেটাপের সঙ্গে তোমার গেটাপ মিশছে না। দিলু খুব হাসি খুশি লাইভলী একটা মেয়ে। আর তুমি হলে বিষন্ন প্রকৃতির।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'বকুল শোন— পরে তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে। তুমি মন খারাপ করো না।'

'বাদ পড়েছি বলে মন খারাপ করছি না। আমি মন খারাপ করছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে।'

'অন্য কারণটা কী ?'

'আগে আপনি কথায় কথায় আমাকে মা ডাকতেন। বাদ পড়ার পর একবারও মা ডাকেন নি। তার মানে হচ্ছে— আগে যে আপনি মা ডাকতেন ভালবেসে ডাকতেন না। হিসেব নিকেশ করে ডাকতেন।'

সোহরাব চাচা চুপ করে আছেন। আমি সহজ গলায় বললাম, চাচা শুনুন– আমি শুটিং স্পটে যাব। কাউকে বিরক্ত করব না। দূর থেকে শুটিং দেখব। এখন মা'র কাছে গিয়ে বসে থাকলেই মা সন্দেহ করবেন।

'ঠিক আছে। যাও শুটিং স্পটে যাও। তবে বাদ পড়া নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলবে না। স্যারের কনসানট্রেশন নষ্ট হবে।'

'আপনি মোটেই চিন্তিত হবেন না চাচা। আমি কাউকেই বিরক্ত করব না। আমি অত্যন্ত লক্ষ্মী টাইপ মেয়ে এবং ভাল অভিনেত্রী।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দিলু সেজে থাকলেও আমি এখন আর দিলু না, আমি রুমালী। শুটিং স্পটে চলে যাব। রুমালী হয়ে চুপচাপ বসে থাকব। শুটিং দেখব। ক্যামেরাম্যান বলবেন, অল লাইটস। সব বাতি জ্বলে উঠবে। খুলে যাবে অন্য ভুবনের দরজা। যে ভুবনে আমার জায়গা নেই।

শুটিং স্পটে যাবার আগে মেকাপ তুলে ফেলব ? না যে ভাবে আছে সে ভাবে যাব ? বুঝতে পারছি না। মেকাপ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মুখে মেকাপ থাকলে মনে হবে আমি সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে আছি— সবাইকে বলতে চেষ্টা করছি— তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি তৈরি হয়ে এসেছিলাম তারপর ওরা আমাকে বাদ দিল। তার কোন দরকার নেই। এখন আমি মা'র

কাছ যাব। মা'কে বলব, শুটিং-এ যাচ্ছি, দোয়া করোতো মা। এই বলে বিদায় নিয়ে নীচে এসে মেকাপ তুলব। তারপর এক কোণায় চুপচাপ বসে শুটিং দেখব। শুটিং এর ফাঁকে ফাঁকে আশে পাশের মানুষের সঙ্গে টুকটুক করে গল্প করব। হাসব। পাপিয়া ম্যাডামের গম্ভীর মেয়েটার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করব।

মা জেগেই ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, এখনো যাস নি।

আমি বললাম, না। ডাক্তার তোমাকে কী বলল ?

মা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ডাক্তার ছেলেটাকে দেখেছিস ? কী রকম রাজপুত্রের মত চেহারা। কী অসম্ভব ভদ্র। এখনো বিয়ে করে নি।

'এর মধ্যে সব জিজ্ঞেস করে ফেলেছ ?'

'জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা কী ? ছেলের বাড়ি কোথায় বলতো ?'

'সুন্দরবন ?'

'সুন্দরবন বাড়ি হবে কেন ? ওদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনা কী রকম যোগাযোগ লক্ষ্য করেছিস ? তোর বাবার দেশের বাড়িও নেত্রকোনা।'

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে আছি। এতো পাগলের প্রলাপ ! মা আনন্দিত গলায় বললেন— ছেলেটার ভাল নাম শাহেদুর রহমান। ডাকনাম— মিঠু।

'তোমাকে সে ডাকনামও বলে ফেলল ?'

'নিজ থেকেতো বলে নি। জিজ্ঞেস করেছি বলেই বলেছে। তোকে সে দেখেছে। একদিন শুটিং এর সময় ছিল।'

'আমাকে পছন্দ করেছে ?'

'তোকে অপছন্দ করবে কে ? তোকে যেই দেখবে তারই মাথা ঘুরে যাবে।'

'মা শোন তুমি মিঠু বাবাজীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসো নিতো ?'

'বাবাজী বলছিস কেন ? এইসব আবার কী রকম ঢং ? মিঠু বলেছে আমাদেরকে নিয়ে এখান থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় দেখতে যাবে। পাহাড় ভর্তি সুন্দর সুন্দর পাথর। মিঠুর ধারণা দামী পাথর।'

'মা তোমার বকবকানি অসহ্য লাগছে। আমি শুটিং-এ গেলাম। তুমি শুয়ে শুয়ে ডাক্তার ছেলেকে বড়শি দিয়ে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তোলার নানা ফন্দি ফিকির বের করার চেষ্টা করতে থাক।'

ঘর থেকে বের হয়েই আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি হলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম— বৃষ্টি যেন না হয়। চারদিকে যেন ঝলমল করে সূর্যের আলো। শুটিং যেন ঠিকমত হয়। মঈন নামের মানুষটা যেন তার কাজ সুন্দর মত গুছিয়ে শেষ করতে পারেন।

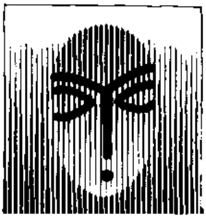

সেলিম ভাইয়ের একটা দৃশ্য দিয়ে শুটিং শুরু হবে।

গাছের নীচে বসে তিনি ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করবেন। গ্রামের একটা ছেলে কৌতূহলী হয়ে দৃশ্যটা দেখবে। ছেলেটির দিকে না তাকিয়েই তিনি বলবেন— ছবি তুলবি ? ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়বে। তখন দূর থেকে দিলুর গলা শোনা যাবে। দিলু চেঁচিয়ে বলবে— "আমার একটা ছবি তুলে দিন। আমার ছবি।" সেলিম ভাই দিলুর দিকে তাকিয়ে হাসবেন। দিলু এসে দাঁড়াবে। তার ছবি তোলা হবে। তখন দিলু বলবে— "এখন এই পিচ্চিটার পাশে একটা ছবি তুলব।" বলেই সে ছেলেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে। তারপর তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে ছুটে যাবে পুকুর ঘাটের দিকে। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে তখন জামিল বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা বই। পেঙ্গুইন পেপার ব্যাক। দিলু এসে জামিলের পাশে বসবে এবং বলবে, জামিল ভাই আমি আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলব। সেলিম ভাই ছবি তুলে দেবেন। জামিল বলবেন— "যা ভাগ।" দিলু আহত চোখে তাকিয়ে থাকবে জামিলের দিকে। জামিল তার আহত অভিমানী দৃষ্টি বুঝতে পারবেন না— কারণ তিনি বই থেকে একবারও চোখ তোলেন নি। জামিল তখন বলবেন— দিলু যা তো কাউকে বল, আমাকে যেন কড়া করে এক কাপ চা দেয়। চিনি হাফ চামচ। দিলু উঠে দাঁড়াবে। তারপর একটা কান্ড করবে— জামিলের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারবে পুকুরের দিকে। বই ছুঁড়ে ফেলেই দিলু ছুটে চলে যাচ্ছে। জামিল হতভম্ব। বইটা পুকুরের পানিতে ভাসছে। জামিল একবার তাকাচ্ছেন বইটার দিকে, একবার দিলুর দিকে। দিলুর ছুটে যাবার ব্যাপারটা সেলিমও দেখছেন। তিনি ক্যামেরা তুলে দিলুর ছুটে যাবার

দৃশ্য নিয়ে নিলেন। শাটার টিপতেই ফ্রেমে বন্দি হল দিলু। সিকোয়েন্সের এইখানেই সমাপ্তি।

কাজ শুরু হচ্ছে না। তিথিকণার মেকাপ শেষ হয় নি। সে এসে পৌছায় নি। সর্পভুক সেলিম ভাই এসেছেন। তাঁর গাল টাল ভেঙ্গে একাকার। শরীর মনে হয় পুরোপুরি সারে নি। কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আমার দিকে যতবার চোখ পড়ছে– চোখ ঝট করে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ বোঝা যাচ্ছে না। ডিরেক্টর সাহেব জাম গাছের নীচে বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে টুল। টুলে পা তোলা। বসার ভঙ্গি বেশ আয়েশী। সিগারেট টানছেন। সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছেন। শ্রোতা মওলানা সাহেব। মওলানা গভীর আগ্রহে কথা শুনছেন। নিশ্চয়ই ধর্ম সংক্রান্ত কোন কথা।

সেলিম ভাই যে জায়গায় তাঁর কাজ হবে ঠিক সেই জায়গাতেই বসা। তার পাশেই পিচ্চি ছেলেটা বসে আছে। ছেলেটাকে এখান থেকে নেয়া হয়েছে। গারো ছেলে। নাক চ্যাপ্টা বলে অন্য রকম সুন্দর। গায়ের রং ধবধবে শাদা। গারোদের মধ্যে কালো কম। সেলিম ভাই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেটা কথা বলছে না, শুধু শুনে যাচ্ছে। তাদের কারো কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার কান খুব পরিষ্কার। অন্য সময় হলে তাদের কথা শুনতে পেতাম— আজ পাচ্ছি না। আজ আমার মন অন্য রকম হয়ে আছে। সেই অন্য রকমটা কী নিজেও বুঝতে পারছি না।

পাপিয়া ম্যাডাম তাঁর মেয়ের সঙ্গে কী একটা খেলা খেলছেন। কোন ইলেকট্রনিক গেম হবে। লুডু বোর্ডের মত বোর্ড। সাপ এবং মইয়ের ছবি আছে। তবে কৌটায় ছক্কা নিয়ে চালতে হয় না। চালার বদলে বোতাম টিপতে হয়। বোতাম টিপলেই শুরুতে মেরী হ্যাড আ লিটল ল্যাম্বের বাজনা বাজে তারপর এক থেকে ছয়ের ভেতর একটা সংখ্যা ভেসে ওঠে।

বোতাম টেপার ফাঁকে ফাঁকে পাপিয়া ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথা বলছেন। খুব সাধারণ কথা। কথা বলতে হয় বলেই বলা। মেয়ে সঙ্গে আছে বলে তিনি অন্য সবার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন এ রকম হতে পারে।

'শুনলাম তোমার মা'র শরীর ভাল না ?'

'জ্বি।'

'সমস্যাটা কী ?'

'জ্বর।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'জ্বি।'

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়েও চায় না— তার মা কারো সঙ্গে কথা বলুক। পাপিয়া ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেই মেয়ে তাঁর মায়ের হাত ধরে টানে।

আমি তাদের খেলাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। তাতেও মেয়েটির আপত্তি। আমার দিকে তাকিয়ে সে কঠিন গলায় বলল, Don't look at the board. ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখে চমৎকার ইংরেজি শুনলে ভাল লাগে। তাদের কথা শুনতে ইচ্ছে করে। এই মেয়েটা স্বল্পভাষী। তার মা দশটা কথা বললে সে দু'টা কথা বলছে। ছোটবেলাতেই যে মেয়ে এত কম কথা বলে— বড় হলে তার অবস্থা কী হবে? খুব বেশি বকবক করবে? না পুরোপুরি চুপ হয়ে যাবে?

আমাকে কেউ তেমন লক্ষ্য করছে না। শুটিং এর সময় সবার সঙ্গে বসে থাকতে যতটা অস্বস্তিকর হবে বলে ভেবেছিলাম ততটা লাগছে না। সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ক্যামেরাম্যান আজীজ আংকেল বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। আকাশে বড় বড় মেঘের খণ্ড। মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সূর্য ঢাকা পড়ছে। আজীজ আংকেল নিশ্চয়ই মনে মনে হিসেব করছেন— কতক্ষণ 'সান' পাওয়া যাবে। দিনে শুটিং-এর সময় সব ক্যামেরাম্যান সূর্য উপাসক হয়ে যান।

আজ শুটিং খুব কষ্টকর হবে। একটু পর পর 'সান' না পাওয়ার কারণে শট কাট হবে। আর্টিস্টদের উপর খুব চাপ পড়বে। অভিনয়ে ডিসকনটিনিউটি চলে আসবে।

ইউনিটের একটা ছেলে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছে। সবাইকে চা দিচ্ছে। লাল টকটকে ফ্লাস্কে চা। চারদিক সবুজ বলেই ফ্লাস্কের লাল রঙ খুব সুন্দর ফুটেছে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে।

অন্য সময় হলে আমি চা খেতাম না। আজ নিজ থেকে চা চেয়ে নিলাম। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা। চা খাচ্ছি—তাকিয়ে আছি ডিরেক্টর সাহেবের দিকে। আমার তাকিয়ে থাকা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পারছেন না বলেই আমি তাকিয়ে থাকতে পারছি।

আমি ভেবে পাচ্ছি না মানুষটা এত সহজ স্বাভাবিক আচরণ কি করে করছেন। সামান্য অন্যায় করলেও অপরাধ বোধ হয়। যার উপর অন্যায়টি করা

হয়েছে তার সামনে সহজ হওয়া যায় না। উনার সহজ ভঙ্গিটা কি অভিনয় ? অভিনয় হলে বলতেই হবে তিনি ভাল অভিনেতা।

ডিরেক্টর সাহেব উঠে আসছেন। আমাদের দিকেই আসছেন। আমার কাছে নিশ্চয়ই না। হয়ত পাপিয়া ম্যাডামকে কিছু বলার জন্যে আসছেন। যেহেতু আমি পাশে আছি— আমাকেও হয়ত কিছু বলবেন— 'কেমন আছ রুমালী' ধরনের কোন কথা। আমাকে খুব সহজ ভাবে জবাব দিতে হবে। ডিরেক্টর সাহেব পাপিয়া ম্যাডামের সামনে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, দু'টার আগে তোমার কোন কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তুমি ইচ্ছা করলে রেস্ট নিতে পার।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, রেস্টইতো নিচ্ছি। ঘরের ভেতর রেস্ট নেবার চেয়ে বাইরে নেয়া কি ভাল না ?

'বোতাম টিপে কী খেলা খেলছ ?'

'লুডু খেলা। ইলেকট্রনিক লুডু। কৌটার ভেতর ছক্কা নিয়ে চালতে হয় না। বোতাম টিপলেই ডিসপ্লেতে এক থেকে ছয়ের ভেতর একটা সংখ্যা ভেসে ওঠে।'

'কই গুটি চেলে দেখাওতো।'

'এখন দেখানো যাবে না। আমার মেয়ে রাগ করবে। আমরা দু'জন যখন এক সঙ্গে থাকি তখন সে তৃতীয় কাউকে সহ্য করতে পারে না। এখনি সে কেমন করে তাকাচ্ছে।'

ডিরেক্টর সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— রুমালী আমার সঙ্গে এসোতো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি কী বলবেন তা আমি জানি। কেন আমাকে বাদ দিতে হল তা ব্যাখ্যা করবেন। ব্যাখ্যাটা কী ভাবে করা হবে তা হচ্ছে কথা। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে বলবেন।

একই কথা একেকজন একেক ভাবে বলে। শুধু মাত্র বলার ভঙ্গির কারণে— কথার অর্থ পর্যন্ত বদলে যায়। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলবেন— রুমালী! আমি খুব দুঃখিত যে তুমি বাদ পড়ে গেলে। ঘটনাটার উপর আমার হাত ছিল না। তোমার যত না খারাপ লাগছে, আমার তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে। অভিনয় ভাল না হবার কারণে তুমি যদি বাদ পড়তে আমার মোটেও খারাপ লাগত না। অভিনয় তুমি যে শুধু ভাল কর তা না, খুবই ভাল কর। শোন রুমালী কিছু কিছু ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটে যার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই ব্যাপারটা বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেবে অবশ্যই তুমি জান। আমার অবস্থা তুমি সেই দিক থেকে বিচার করবে। কেমন ? বি এ গুড গার্ল। এইবার সুন্দর করে একটু হাসোতো।

ডিক্টের সাহেব এর বাইরে কিছু বলবেন না। এইটিই তিনি হয়ত আরো গুছিয়ে বলবেন— আমার কাছে মনে হবে আরে তাইতো। মানুষটার উপর তখন আমার আর রাগ থাকবে না। মানুষটার জন্যে করুণা ও মমতায় হৃদয় দ্রবীভূত হবে।

উনি কীভাবে কথাগুলি বলেন তা শোনার জন্যে আগ্রহ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। উনি কিছু বলছেন না। উনি মানুষজন যে দিকে বসে আছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছেন। মাঠের দিকে যাচ্ছেন। সবাই নিশ্চয়ই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সবাই ভাবছে— 'ব্যাপারটা কী ?'

'রুমালী !'

'জ্বি।'

'তুমি আমাকে ছোট্ট একটা কাজ করে দাও তো ।'

'কী কাজ বলুন— করে দিচ্ছি।'

'এই মাঠে কিছু ফড়িং ঘুরছে। তুমি আমাকে বড় সড় দেখে একটা ফড়িং ধরে দাও। ফড়িং ধরতে পার না ?'

'কখনো ধরি নি। তবে নিশ্চয়ই ধরতে পারব।'

'ফড়িং দিয়ে কী করব বলতো ?'

'দিলুর যখন শট নেয়া হবে তখন ফড়িংটা আপনি ব্যবহার করবেন। দিলুর হাতে থাকবে ফড়িংটা।'

'ঠিক ধরেছ। ক্যামেরা দিলুকে পেছন থেকে ধরবে। দেখা যাবে সে মাঠে ছোটাছুটি করছে। একটা হাতে তখন কিন্তু ফড়িংটা আছে। ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না। আমরা ক্যামেরায় যা দেখছি তা হচ্ছে একটা মেয়ে মাঠে ছোটছুটি করছে। মেয়েটা যখন ক্যামেরার দিকে ফিরে তাকাল তখন দেখা গেল তার হাতে ফড়িংটা ধরা। ফড়িংটা ছটফট করছে— মেয়েটা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ফড়িং এর দিকে। দৃশ্যটা সুন্দর হবে না ?'

'খুব সুন্দর হবে।'

'তুমি একটা ফড়িং ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

উনি চলে গেলেন উনার জায়গায়, আমি গেলাম ফড়িং ধরতে। ফড়িং ধরার জন্যে ইউনিটে অনেক লোক আছে। যে কোন প্রোডাকশন বয়কে ফড়িং ধরতে বললে সে মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশটা ফড়িং ধরে নিয়ে আসবে। তা না করে তিনি

আমাকে ফড়িং ধরতে বললেন। কাজটার পেছনে তাঁর একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী ? আমাকে এবং অন্য সবাইকে দেখানো যে সব স্বাভাবিক আছে ? আমাকে সহজ করা ? তার প্রয়োজন ছিল না, আমি সহজ স্বাভাবিক হয়েই আছি।

তিথিকণার মেকাপ শেষ হয়েছে। মেয়েটা খুব সুন্দর। মেকাপের পর তাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মত। শট দেবার জন্যে সে তৈরি। ভীত এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে সে হাসছে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে— অভিনয়টা সে ভাল পারবে। এ রকম কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বরং উল্টোটা হবার কথা, কারণ ডিরেক্টর সাহেব তাকে কী বলছেন তা সে মন দিয়ে শুনছে না, বার বারই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেবের কথার মাঝখানেই একবার সে তার মা'র দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। ডিরেক্টর সাহেব বললেন— তিথি আমি কী বলছি মন দিয়ে শোন। তুমি তোমার জীবনের একটা ট্রানজিশন পয়েন্টে আছ। এই তুমি কিশোরী— এই তুমি তরুণী এমন অবস্থা। বুঝতে পারছ কী বলছি ?

'হুঁ।'

মেয়েটির মা বললেন— হুঁ বলছ কেন ? বল— 'জ্বি'।

'জ্বি।'

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এই ফড়িংটা হাতে নাও। দু' আঙ্গুলে পাখা দু'টা ধর।

তিথি বলল, অসম্ভব আমি মরে গেলেও ফড়িং ধরব না, ঘেন্না লাগে।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, ঘেন্না লাগার কী আছে, ফড়িং কী সুন্দর একটা পতঙ্গ।

তিথিকণা বলল, সুন্দর পতঙ্গ হলে আপনি ধরে বসে থাকুন। আমি ধরব না।

তিথির মা বললেন, এইসব কী বেয়াদবের মত কথা। কার সঙ্গে কথা বলছ খেয়াল থাকে না ? সরি বল।

তিথি বলল, সরি সরি সরি।

'এইবার আংকেল যা বলছেন কর— ফড়িংটা ধর।'

'বললাম না মা, আমার ঘেন্না লাগে। তোমাকে যদি একটা পেট মোটা মাকড়শা ধরতে বলা হয় তুমি ধরবে ? তুমিতো মাকড়শা দেখেই ফিট হয়ে পড়ে যাবে।'

'ফড়িংতো আর মাকড়শা না।'

'ফড়িং মাকড়শার চেয়েও খারাপ। যা যা করতে বলা হবে আমি করব, কিন্তু ফড়িং ধরব না। আর যদি ধরতে হয় হাতে গ্লাভস্ পরে নেব। আমার জন্যে গ্লাভস্ আনাতে হবে।'

তিথি শেষ পর্যন্ত ফড়িং হাতে নিয়ে দৃশ্যটা করল। এত সুন্দর করল যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন— বাহ্ চমৎকারতো। মেয়েটাতো দারুণ।

জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তার দৃশ্যটা আরো সুন্দর হল। বই ছিঁড়ে পানিতে ফেলে দেয়া। রাগ করে দৌড়ে ছুটে যাওয়া। ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় চমকে তাকানো।

আমার কাছে সবচে ভাল লাগল— তার ক্যামেরায় ছবি তোলার অংশটা। সেলিম ভাই ছবি তুলছেন। তিথির হাতে ফড়িং। সেলিম ভাই (চিত্রনাট্যের সাব্বির) বললেন— রেডি ওয়ান-টু.... থ্রি বলার ঠিক আগে আগে তিথি ফাজলামি করে ঠোঁট দু'টো গোল করে ফেলল। অপূর্ব দৃশ্য। তাদের বয়েসী মেয়েরা ছবি তোলার সময় এ রকম কাণ্ড কারখানা করে। আমি কি এরকম করতাম ? না করতাম না। তিথি করছে কারণ একটা সিনেমা তৈরি হচ্ছে এ ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে নেই। সে ঘরে যা করে এখানেও তাই করছে। পুরো ব্যাপারটা সে নিয়েছে খেলার মত।

লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তিথিও আমার সঙ্গে আসছে। সে গোসল না করে দুপুরের খাবার না-কি খেতে পারে না। ভালমত সাবান ডলে গোসল করবে। তারপর খাবে। খাবার পর আবার মেকাপ নিয়ে অভিনয়ের জন্যে তৈরি হবে। শুধু আজ গোসল না করে খেয়ে ফেলার ব্যাপারে তাকে অনেক বলেও রাজি করানো যায় নি। তিথির মা তার সঙ্গে আসতে চাচ্ছিলেন। তিথি বলেছে— মা তোমাকে আসতে হবে না। তুমি লাঞ্চ কর। আমি সোহরাব চাচার সঙ্গে যাচ্ছি, উনার সঙ্গে ফিরে আসব।

আমরা তিনজন ক্যাম্পের দিকে ফিরছি। সবার আগে সোহরাব চাচা— তাঁর একটু পেছনে আমরা দু'জন। আমি বললাম— তিথিকণা তোমার অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। তিথি বলল, তুমি আমার নাম জান কীভাবে ?

'জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

'আমাকে দেখে তুমি দোতলার বারান্দা থেকে হাত নাড়াচ্ছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'এম্নি।'

'তোমার নাম আমি জানি না— তোমার নাম কী ?'

'রুমালী।'

'বাহ্ কী অদ্ভুত ! রুমাল থেকে রুমালী। চাদর থেকে চাদরি। হি হি হি।'

তিথি হঠাৎ শুরু করা হাসি হঠাৎই থামিয়ে বলল, চাদরি বলায় রাগ কর নিতো ?

'না।'

'আমি যে চরিত্রটা করছি, সেই চরিত্রটা তোমার করার কথা ছিল— তাই না ?'

'হুঁ।'

'তারপর তোমাকে বাদ দেয়া হয়েছে ?'

'হুঁ।'

'কেন ?'

'অভিনয় ভাল হচ্ছিল না।'

'অভিনয় ভাল হবে কি-না সেটা ওরা আগে দেখে নেবে না ? ডেকে এনে অভিনয় করিয়ে তারপর বাদ দিয়ে লজ্জা দেবে কেন ?'

আমি চুপ করে রইলাম। তিথিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছে। প্রথমেই যাদের ভাল লাগতে শুরু করে তাদেরকে কখনো খারাপ লাগে না। ভাল লাগার পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। তিথি বলল, তোমাকে অভিনয় করার একটা কৌশল শিখিয়ে দেই— কৌশলটা শিখলে দেখবে ভাল অভিনয় করবে।

'কৌশলটা কার কাছে শিখেছ ?'

'নিজে নিজেই বার করেছি। কারো কাছ থেকে শিখি নি। আমি বেশির ভাগ জিনিসই নিজে নিজে বার করি। কারো কাছ থেকে শিখি না।'

'এটাতো ভাল। নিজেই নিজের শিক্ষক।'

'কৌশলটা হল— অভিনয়ের আগে নিজের মধ্যে একটা রাগ তৈরি করবে। কোন একটা ব্যাপারে হুট করে রেগে যাবে। তারপর রাগটা চাপা দিয়ে অভিনয় করবে। দেখবে অভিনয় ভাল হবে।'

'কারণটা কী ?'

'রাগ ছাড়া অভিনয় করতে গেলে লজ্জা লাগবে। সবাই হা করে তাকিয়ে আছে, দেখছে। লজ্জা লাগবে না ? অভিনয় কেমন হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে সব

সময় ভয় থাকবে। মনের ভেতর রাগ থাকলে— এইসব কোন কিছুই মাথায় থাকবে না।'

'তোমার কথা সত্যি হলে যাদের রাগ বেশি তাদের খুব ভাল অভিনেতা হবার কথা।'

' তা জানি না। আমার যা মনে এসেছে আমি তোমাকে বললাম। আমিতো আর বেশি কিছু জানি না। আমি এ বছর এস.এস.সি. দেব। তাছাড়া আমি ছাত্রীও খুব খারাপ। স্কুলে সায়েন্স পাই নি আর্টস পেয়েছি।'

'সায়েন্স পড়তে ইচ্ছে করে?'

'সায়েন্স আর্টস কোনটাই আমার পড়তে ইচ্ছা করে না। আমার কী ইচ্ছা করে জান?'

'কী ইচ্ছা করে?'

'দিন রাত কম্পিউটার নিয়ে খেলতে ইচ্ছা করে।'

'ভিডিও গেম?'

'আরে না, ভিডিও গেম কেন খেলব? ভিডিও গেম খেলে বাচ্চারা। আমিতো বাচ্চা না— আমি কম্পিউটার ফটোশপ নিয়ে কাজ করি।' ফটোশপ হল— একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম Adobe photoshop. এই প্রোগ্রাম দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। উদাহারণ দিয়ে বুঝাই— মনে কর প্রথম তুমি রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি কম্পিউটারে ঢুকালে। তারপর তোমার নিজের একটা ছবি ঢুকালে। তারপর দু'টা ছবিকে একসঙ্গে জোড়া লাগালে। কিছু কারেকশন করলে। তারপর ছবিটা প্রিন্ট করলে, তখন দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের পাশে তুমি বসে আছ। একটুও মেকি মনে হবে না। মনে হবে সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ছবি তোলা হয়েছিল। তুমি রবীন্দ্রনাথের নাতনী। কিংবা রবীন্দ্রনাথের নাতনীর কোন বান্ধবী।'

'তোমার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি আছে?'

' অনেকগুলি আছে। আইনস্টাইনের সঙ্গে আছে। শেখ হাসিনার সঙ্গে আছে, বেগম জিয়ার সঙ্গে আছে, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আছে। লতা মুঙ্গেশকরের সঙ্গে আছে।'

'বল কী?'

'আমি ছবিগুলি নিয়ে এসেছি— তোমাকে দেখাব। অবশ্যি তুমি যদি দেখতে চাও।'

'আমি দেখতে চাই।'

'আচ্ছা দেখাব। শুটিং শেষ হোক তারপর। শুটিং শেষ হবার পর, গোসল করে ফ্রেশ হয়ে দেখাব।'

'তুমি কি ঘন ঘন গোসল কর ?'

'হুঁ করি। আমি আগের জন্মে মাছ ছিলামতো, এই জন্যে বেশি বেশি গোসল করি। রুমালী শোন, তুমি আমার উপর রাগ করো না।'

'রাগ করব কেন ?'

'এই যে আমি হঠাৎ এসে তোমার জায়গাটা নিয়ে নিয়েছি এই জন্যে।'

'কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না। এই জায়গাটা গোড়া থেকেই তোমার ছিল। আমি ভুল করে মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে চলে এসেছিলাম।'

'বাহ্ তুমি দেখি একেবারে আমার বাবার মত কথা বল। বাবা এত সুন্দর করে কথা বলে যে তার মিথ্যা কথাগুলিও সত্যি মনে হয়। ধর কোন একটা বিষয় নিয়ে তোমার মন খারাপ। তুমি বাবার কাছে গিয়ে যদি বিষয়টা বল— বাবা পানির মত বুঝিয়ে দেবেন যে মন খারাপ করার মত কিছু হয় নি তুমি মন ভাল করে ফিরে আসবে।'

'তোমার বাবা কি তোমার সঙ্গে এসেছেন ?'

'হুঁ এসেছেন। বাবা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আমি যেখানে যাব বাবা যাবে। একবার আমরা স্কুল থেকে এক্সকারশানে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। বাসে করে গিয়েছিলাম। কক্সবাজার পৌঁছে দেখি— বাবা তার আগের দিন প্লেনে করে কক্সবাজারে চলে এসেছেন। হোটেল শৈবালে থাকেন। আমরা সব মেয়েরা সি বিচে হৈ চৈ করি উনি দূরে একা একা হাঁটেন। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করলাম। দেরি হয়ে গেছে। সবার কাছ থেকে বকা খাব। ভালই হয়েছে বকা খেলে রাগ উঠে যাবে। রাগ উঠে গেলে অভিনয় ভাল হবে।'

আমি মা'র ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেলাম। ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। মা ঘুমুচ্ছেন না, জেগে আছেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। চোখ মুখ ফোলা। চুল এলোমেলো। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। যাবার সময় হাসিখুশি দেখে গিয়েছিলাম— অল্প সময়ে আবার কী হয়ে গেল। আমি বললাম, জ্বর কি আরো বেড়েছে ? মা জবাব দিলেন না। মনে হল আমি যা বলছি তা তাঁর

কানে ঢুকছে না। আমি মা'র কপালে হাত রাখলাম— জ্বর আছে, এবং বেশ ভালই আছে। থার্মোমিটারে মাপলে একশ দুই টুই হয়ে যাবে।

'জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে গুদাম বানিয়ে রেখেছ কেন ?'

মা ক্লান্ত গলায় বললেন, বকুল তুই আমার সামনে বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

আমি মা'র সামনে বসলাম। মা'র ভাবভঙ্গি কেমন কেমন যেন লাগছে। গলার স্বর পর্যন্ত পাল্টে গেছে।

'তোর কাজ শেষ হয়েছে ?'

'হুঁ।'

'শুটিং কেমন হল ?'

'ভাল।'

'কোন অংশটা হল ?'

'ছবি তোলার অংশ। সাব্বির সাহেব ক্যামেরায় ছবি তুলছেন— ঐ অংশ। সর্পভুক সেলিম ভাই এবং আমি।'

'আজকের মত কি কাজ শেষ ?'

'কিছু বাকি আছে বিকেলে হবে।'

'মেকাপ তুলে ফেলেছিস কেন ?'

'মেকাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তুলে ফেলেছি। বিকেলে শুটিং এর আগে আবার নেব। মা, জানালাগুলি খুলে দি ?'

'না জানালা খুলবি না। আলো চোখে লাগে। বকুল— তুই এত সহজে মিথ্যা কথা বলছিস কীভাবে ?'

'মিথ্যা কথা বলছি ?'

'হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলছিস। তোকে বাদ দেয়া হয়েছে। তোর জায়গায় আরেকটা মেয়ে অভিনয় করছে। মেয়েটার নাম তিথিকণা। তোকে বলেছে— আমাকে নিয়ে বিদেয় হতে। বলে নি ?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, হ্যাঁ বলেছে। তবে এত খারাপ ভাবে বলে নি ভদ্রভাবে বলেছে।

'তার পরেও তুই মাটি কামড়ে পড়ে আছিস ?'

'তোমার শরীর ভাল না, এই অবস্থায় যাব কীভাবে ?'

'আমার কোন সমস্যা হবে না। আমি যেতে পারব।'

'যেতে পারলে চল যাই।'

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। তুই ইউনিটের কোন একটা ছেলেকে রিকশা ডাকতে বল। আমাদের বাসস্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দেবে। বাসে করে আমরা চলে যাব।

'কাউকে কিছু না বলে চলে যাব ?'

'যারা আমার মেয়ের গায়ে থুথু দিয়েছে— তাদের বলাবলির কী আছে ?'

'ওরা ভুল করেছে বলে আমরা কেন ভুল করব মা ? আমরা ভুল করব না। আজ রাতে শুটিং এর শেষে আমি সবার কাছ থেকে হাসি মুখে বিদেয় নেব, পরদিন সকালে চলে যাব।'

'না আমি এখনি যাব।'

'তুমি এখনি যেতে চাইলে যাও। আমি তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসব। কিন্তু আমি চোরের মত পালিয়ে যাব না। আমি কোন চুরি করি নি যে আমাকে চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে।'

মা শব্দ করে কাঁদছেন। গোংগানীর মত শব্দ হচ্ছে। মা'র কান্না দেখে আমার কেন যেন মায়া লাগছে না। রাগ লাগছে। কান্নার শব্দ শুনে লোকজন জড় হবে। জানতে চাইবে কী ব্যাপার। কী বিশ্রী !

'বকুল।'

'মা বল, আমি শুনছি।'

'তুই আমার সামনে থেকে যা। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'কোথায় যাব ?'

'যেখানে ইচ্ছা যা— তোর দেবতার সামনে হা করে বসে থাক। দেবতাকে পূজা কর গিয়ে। দেবতা তোর গায়ে যে থুথু দেবে— সেই থুথু চেটে চেটে খা...'

'এইসব কী বলছ ?'

'আমি কী বলছি আমি জানি। তোকে আমি গর্ভে ধরেছি। আমি তোর গর্ভে জন্মাই নি। আমি বোকা সেজে থাকি বলেই তুই আমাকে বোকা ভাবিস— শোন বুদ্ধিমতী— যে রাতে তুই ঘটনা ঘটিয়েছিস আমি সেই রাতেই টের পেয়েছি। তুই মরার মত ঘুমুচ্ছিলি আমি সারারাত তোর পাশে জেগে বসেছিলাম। সারারাত নিজের মনে কী বলেছি শুনতে চাস ?'

'না শুনতে চাই না।'

'সারারাত আমি আল্লাহ্‌কে বলেছি— আমি এত কী পাপ করেছি যে তুমি আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছ ? যে মেয়েকে বুকে নিয়ে জীবন কাটাব ভেবেছিলাম— এখন দেখি সেই মেয়ে বাজারের একটা নষ্ট মেয়ে।'

'তুমি কি দয়া করে চুপ করবে মা ?'

'তোর দেবতা কি তোকে বিয়ে করবে ? করবে না, পূজা নেবে কিন্তু বিয়ে করবে না। দেবতারা বোকা হন না। তারা দেবী বিয়ে করেন— তারা বাজারের নষ্ট মেয়ে বিয়ে করেন না। বড়জোড় কিছুক্ষণ কচলাকচলি করেন। তারপর ঘেন্নায় থুথু দেন। তোর জীবন কাটবে দেবতার থুথু গায়ে মেখে।'

'মা হাতজোড় করছি চুপ কর।'

'চুপতো করবই। চুপ করা ছাড়া আমার গতি কী ? আমি চুপ করব— আর কথা বলব না। শুধু তোর ভবিষ্যৎটা কী হবে বলে চুপ করি। আমি চোখের সামনে তোর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

'আমার ভবিষ্যৎটা তুমি রাতে বলো মা। রাতে খুব মন দিয়ে শুনব।'

'না রাতে না। এখনই শোন। আমি ঢাকায় যাব— তারপর তোকে নিয়ে আমি ক্লিনিকে ক্লিনিকে ঘুরব। তোর পেট খালাস করতে হবে....'

'মা ছিঃ।'

'খবরদার তুই ছিঃ বলবি না। খবরদার। ছিঃ বলতে হলে আমি বলব। তুই বলবি না। বেশ্যা মেয়ের মুখে ছিঃ মানায় না। যা আমার সামনে থেকে, যা। তোর মুখের দিকে তাকালেও পাপ হয়।'

আমি ঘর থেকে বের হলাম। মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছি, মা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন— বেশ্যা। আমার মেয়ে বেশ্যা।

জালালের মা কোত্থেকে উদয় হয়েছে। তার মুখ ভর্তি পান। সে পানের পিক ফেলে আরেকটু এগিয়ে এল। মা কী বলছেন ভাল মত শুনতে হবে। আমি হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। একবার কি পেছনে ফিরে দেখব মা'র দরজার সামনে আরো লোক জড় হয়েছে কি না ? না থাক।

দু'টার মত বাজে। এখন কোথায় যাব ? গ্রামের পথে একা একা হাঁটব ? সোমেশ্বরী নদীর পানি দেখতে যাব ? না-কি কোন গারো বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলব, আপনারা কেমন আছেন ? আমি আপনাদের দেখতে এসেছি। আমার খুব পানির তৃষ্ণা, আপনারা আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিন না।

পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। খুব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি যদি আমাকে কেউ দিত। ক্ষিধেও পেয়েছে। সকালে বড় মগ ভর্তি এক মগ চা খেয়েছি— এরপর আর কিছু খাওয়া হয় নি। ও না খেয়েছি, শুটিং চলার সময় আর একবার চা খেয়েছি। ক্ষিধেয় এখন নাড়ি কামড়াচ্ছে। ক্ষিধের দোষ নেই। ক্ষিধের কাছে মানুষ পরাজিত হবেই। ক্ষিধের কাছে পরাজয় মানে শরীরের কাছে পরাজয়। মানুষ বার বার শরীরের কাছে পরাজিত হয়েছে। মনের কী প্রবল ক্ষমতা, কিন্তু তার পরেও শরীরের কাছে সে কত অসহায়।

আচ্ছা জাহেদার কাছে গেলে কেমন হয়। জাহেদাকে জিজ্ঞেস করতে পারি— জাহেদা তোমার কাছে পাকা মন-ফল আছে। থাকলে কয়েকটা মন-ফল দাওতো খেয়ে দেখি। মন-ফল কি মনের জোর বাড়ায় ? দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে দেয় ?

আমি রোদে নেমে পড়লাম। ভয়ংকর কোন কাণ্ড করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কেউ এখন আমার দিকে তাকাচ্ছে না। এমন কোন কাণ্ড কি করা যায় যেন সবাই চমকে তাকায় আমার দিকে। ডিরেক্টর সাহেব হতভম্ব গলায় বলেন— "কী হল?"

সিনেমার গল্পে দিলু এমন একটা কাণ্ড করেছিল। বেচারীর দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না। শেষটায় এমন এক কাণ্ড সে করল যে সবাই বাধ্য হল তাকাতে। সে নিজে কিন্তু তা জানতে পারল না। দিলু তখন দিঘীর নীল জলে টকটকে লাল রঙের স্কার্ট পরে ভাসছিল। আমার লাল স্কার্ট নেই, কিন্তু লাল শাড়িতো আছে। দিঘীর নীল জলে লাল শাড়ি খুব মানাবে।

মেঘ কেটে রোদ উঠেছে। প্রচন্ড রোদ। আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে। প্রচণ্ড রোদের সময় চারদিক কি একটু ঘোলাটে লাগে ? আমার লাগছে। মনে হচ্ছে হালকা করে কুয়াশা হয়েছে।

রাস্তার দু'পাশে পানিতে নাক ডুবিয়ে মহিষের দল শুয়ে আছে। পানির উপর শুধু নাক ভেসে আছে আর কিচ্ছু নেই। মহিষের নাক ভাসিয়ে ডুবে থাকার দৃশ্যটা কি ডিরেক্টর সাহেব নিয়ে রেখেছেন ? না নিয়ে রাখলেও তিনি নেবেন। কোন সুন্দর দৃশ্যই তাঁর চোখ এড়াবে না। যা কিছু সুন্দর তিনি বন্দি করে ফেলবেন সেলুলয়েডে। সেলুলয়েডে যা বন্দি করা যায় না তার প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। মানুষের মন বন্দি করা যায় না বলেই কি মানুষের মনের প্রতি তাঁর এত অনাগ্রহ ?

জাহেদার উঠোনে বকটা গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। এর নাম ধলামিয়া। ধলা মিয়া বলে ডাক দিলে বৃদ্ধ মানুষের মত টুকটুক করে হেঁটে আমার কাছে আসার

কথা। আমি ডাকলাম, ধলামিয়া ধলামিয়া। বকটা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল তারপর ছোট ছোট পা ফেলে আমার দিকে আসতে শুরু করল। কী অদ্ভুত দৃশ্য। ডিরেক্টর সাহেবকে এই ব্যাপারটা বলা দরকার, এবং দৃশ্যটাও তাঁকে দেখানো দরকার। আমার ধারণা দৃশ্যটা দেখা মাত্র তিনি তাঁর ছবিতে ঢুকিয়ে দেবেন। নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি করবেন। যেমন দিলু নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক বাড়িতে ঢুকে শোনে, এই বাড়িতে একটা পোষা বক আছে। যার নাম ধলামিয়া। নাম ধরে ডাকলেই যে গুট গুট করে হেঁটে কাছে আসে ! দিলু অল্পতেই মুগ্ধ হয়। এই ঘটনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হল। দৃশ্যটা জামিল ভাইকে সে দেখাবেই। জামিল তার কথা পাত্তাই দিলেন না। বক আবার মানুষের কথা শুনে কাছে আসে না-কি ?

আচ্ছা আল্লাহ্‌তালা কী করেন ? তিনিও কি নতুন নতুন দৃশ্য তৈরি করে মূল দৃশ্যমালায় ঢুকিয়ে দেন। নতুন দৃশ্যগুলি তাঁর আদি পরিকল্পনায় ছিল না, হঠাৎ মাথায় এসেছে।

'ভইনডি কেমুন আছেন গো ?'

আমি চমকে পেছনে ফিরলাম। খলুই হতে জাহেদা ঠিক আমার পেছনে। তার খলুই ভর্তি গোবর। তার হাতও গোবরে মাখা মাখি। কাউকে গোবর নিয়ে মাখামাখি করতে দেখলে অন্য সময় আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠত। এখন করছে না। এখন মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। জাহেদার হাত গোবরে মাখামাখি না থাকলে মানাতো না।

'জাহেদা আপনি কেমন আছেন ?'

জাহেদা হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাল আছি গো ভইনডি। তয় আমার লোকটা নিরুদ্দেশ হইছে।

'নিরুদ্দেশ হইছে মানে কী ?'

'দুইদিন আগে হাটে যাইব বইলা বাইর হইছে আর ফিরে নাই।'

'সে কী।'

জাহেদা হাসছে। শরীর দুলিয়ে হাসছে। স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়াটা যেন বড়ই আনন্দময় সংবাদ।

'চিন্তার কিছু নাই। আবার ফির‍্যা আসব। আর না আসলে নাই। পশু পাখিও শিকল দিয়া বান্দন যায় না। আর মানুষ বইল্যা কথা।'

'উনি কি প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়ে যান ?'

'হুঁ। তার বাতাস রোগ আছে।'

'বাতাস রোগটা কী ?'

'বাতাস রোগটা যার থাকে হে বাতাস পাইলেই উইড়্যা যায়। হে খুঁজে রঙ্গিলা বাতাস।'

'ও আচ্ছা। বাতাস রোগের কথা এই প্রথম শুনলাম।'

'ভইনডি আফনে কি কোন কামে আসছেন ?'

'না। আমি আপনের সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।'

'আসেন গফ করি। খাড়ান হাত ধুইয়া আসি।'

জাহেদা আমাকে পাটি পেতে দিল। পাখা এনে দিল। ফুল তোলা ওয়ারের বালিশ এনে দিল। পান সুপারি এনে দিল। খালি পেটে পান খেতে কেমন লাগে দেখার জন্যে আমি পান খাচ্ছি। একটা আয়না থাকলে দেখতাম আমার ঠোঁট লাল হয়েছে কি না। ঠোঁট যদি টকটকে লাল হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার স্বামী আমাকে পাগলের মত ভালবাসবে।

'জাহেদা!'

'বলেন ভইনডি।'

'দেখুনতো আমার ঠোঁট লাল হয়েছে কি না।'

'হইছে ভইনডি। খুব লাল হইছে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'আপনের মনডা কি খারাপ ?'

'হ্যাঁ আমার মন খুব খারাপ।'

জাহেদা কুটকুট করে হাসছে। মুখে আঁচল চেপেও হাসি থামাতে পারছে না। আমার মন খারাপ শুনে তার হাসি পাচ্ছে কেন ? মেয়েটা কি পাগল ?

'হাসছেন কেন ?'

'আপনের মন ভাল হইয়া যাইব। খুব ভাল হইব।'

'কখন মন ভাল হবে ?'

'এক দুই দিনের মইধ্যে।'

'আপনার কথাতো একটাও ঠিক হয় না। আপনি বলেছিলেন চণ্ডিগড়ে কোন শুটিং হবে না। একজন মানুষ মারা যাবে। কই কেউতো মারা যায় নি। শুটিংও ঠিকমতই হচ্ছে।'

'ভইনডি আমার কথা মাঝে মাঝে লাগে। মাঝে মাঝে লাগে না।'

'সবার বেলাতেই তো এমন হয়। সবার কথাই মাঝে মাঝে লাগে। মাঝে মাঝে লাগে না।'

'তাও ঠিক।'

আকাশে কি মেঘ জমতে শুরু করেছে ? আলো কেমন মরে আসছে। আমি মেঘ দেখার জন্যে আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ নেই, কিন্তু রোদ মরে যাচ্ছে, আশ্চর্য তো ! জাহেদা বলল, আইজ রাইত ঝুম তুফান হইব।

'তাই বুঝি ?'

'হুঁ, ঝুম তুফান হইব। সোমেশ্বরী নদীত বান ডাকব। হাতি ভাসাইন্যা বান।'

'আপনার মন এইসব খবর আপনাকে দিচ্ছে, না-কি আকাশের অবস্থা দেখে বলছেন।'

'মন বলতাছে।'

'আপনের স্বামী কবে ফিরবে ?'

'তাতো ভইনডি বলতে পারব না।'

'স্বামীর ব্যাপারে মন কিছু বলছে না ?'

'জ্বে না।'

বকটাকে ডাকা হয় নি। তারপরেও সে নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। আমার দিকেই আসছে। বকটা বড় হয়েছে মানুষের সঙ্গে, কিন্তু সে মনে হয় একজন মানুষকে অন্য একজনের কাছ থেকে আলাদা করতে পারে না। আমরা যেমন একটা বককে অন্য একটা বক থেকে আলাদা করতে পারি না, তারাও আমাদের পারে না। সে আমাকে জাহেদা ভেবেই আমার কাছে আসছে।

জাহেদা পেছন থেকে ডাকল ধলামিয়া। ধলামিয়া। বকটা দাঁড়িয়ে গেল। সে একবার দেখছে জাহেদাকে, একবার আমাকে। মনস্থির করতে পারছে না কার কাছে যাবে। কী করে দেখার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, এবং আমিও ডাকলাম ধলামিয়া। পাখিটা আমার কাছেও এল না, জাহেদার কাছেও গেল না— স্থির হয়ে রইল।

জাহেদা শান্ত গলায় বলল, ভইনডি ধলামিয়া আন্ধা। চউক্ষে দেখে না।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, সে কী।

ছোট বয়সে এরে যখন ধইরা আনে তখন চউক্ষে হাত লাইগ্যা চউখ নষ্ট হইছে। বকটা আন্ধাগো ভইনডি। হে মানুষ চিনে না।

আমার বুকে ধাক্কার মত লাগল। পাখি অন্ধ হতে পারে ? এর কেউ নেই। কোন সঙ্গিনী এর পাশে বসে না। এ উড়ে আকাশে যেতে পারে না। সারাদিন নিজের অন্ধকার ভুবনে আপন মনে হাঁটে। আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদতে চাচ্ছিলাম— কাঁদতে পারছিলাম না। অন্ধ পাখিটা আমাকে কাঁদিয়ে দিল। আমি ডাকলাম— ধলামিয়া আয় আয়। আয়রে লক্ষ্মী আয়।

ধলামিয়া আসছে। ছোট ছোট পা ফেলে কী অদ্ভুত ভাবেই না আসছে। আমার চোখ ভর্তি পানি। চোখের পানিতে পাখিটা ঝাপসা দেখছি।

জাহেদা বলল, ভইনডি কাইন্দেন না। আফনের কান্দনে ধলামিয়ার লাভ-লোসকান কিছুই নাই। কাইন্দা কী হইব ? ভইনডি আফনের মনে হয় শইলডা খারাপ। বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া থাকেন।

আমি বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ধলামিয়া আবারো উঠোনে চলে গেছে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। বাড়ির পেছনের কাঁশবনে বাতাস লেগে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। জাহেদা আমার মাথার কাছেই কাঁথা নিয়ে বসেছে। কোন নকশি কাঁথা তৈরি হচ্ছে না। কাব্যময় কোন দৃশ্য নয়, অতি সাধারণ দৃশ্য। ছেড়া কাঁথা রিপু করা হচ্ছে।

'ভইনডি!'

'হুঁ।'

'ঘুমান আরাম কইরা ঘুমান।'

জাহেদা কাঁথা সেলাই করতে করতে বিড় বিড় করে নিজের মনেই কথা বলছে। কথাগুলি আমার কানে আসছে গানের মত। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় শান্তিময় ঘুম।

ঘুম ভেঙ্গে দেখি রাত হয়ে গেছে। জাহেদা ঘরে বাতি জ্বালায় নি। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কী অদ্ভুত কান্ড কতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছি ? ঘরের পেছনের বাঁশবনে বাতাস লেগে ভূতুড়ে শব্দ হচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে ডাকলাম, জাহেদা জাহেদা।

জাহেদা ঘর থেকে বের হল। তার হাতে কুপী। সে কুপী জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, লম্বা একটা ঘুম দিছেনগো ভইনডি। সইন্ধ্যাকালে দুইবার ডাকছি। সাড়া দেন নাই। মরা ঘুম ঘুমাইছেন গো ভইনডি। মরা ঘুম। আফনের খুঁজে মানুষ আসছে।

'কে এসেছে ?'

'মওলানা আসছে। বাইরের বাড়িত বইস্যা আছে। আমারে বলছে, ঘুম ভাঙ্গানির দরকার নাই। আরাম কইরা ঘুমাইতাছে ঘুমাউক। মানুষের নিদ্রাও ইবাদৎ। আফনেরার এই মওলানা লোক ভাল।

আমি বাইরে এসে দেখি মওলানা সাহেব বাংলা ঘরের উঠানে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গা দিয়ে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ আসছে। আজ মনে হয় প্রাণ ভরে গায়ে আতর মেখেছেন। তাঁর হাতে লম্বা টর্চ। এরকম লম্বা টর্চ এর আগে আমি দেখি নি। মওলানা বললেন, ঘুম কেমন হয়েছেগো আম্মাজী ?

'ঘুম খুব ভাল হয়েছে।'

'পাঁচটা মিনিট আম্মা। এশার আযান হয়েছে। নামাজটা পড়ে রওনা দিব। অজু আছে দিরং হবে না।'

'গায়ে এত আতর দিয়েছেন কেন ? গন্ধে মাথা ঘুরছে।'

'মনটা খুব খারাপ হয়েছে— এই জন্যে আতর দিয়েছি। চোখে সুরমাও দিয়েছি। রাত্রি বিধায় দেখতে পাচ্ছেন না। মন খারাপ হলে সুগন্ধ মাখলে ভাল লাগে।'

'মন খারাপ কেন ?'

'শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্যে মন খারাপ। তিথিকণা আম্মা হঠাৎ বলল, অভিনয় করব না। এই মেয়ে বড় শক্ত। 'না' মানে না।'

'কী নিয়ে রাগ করেছে ?'

'সঠিক বলতে পারব না। বয়স অল্প। অল্প বয়সের রাগের জন্য কারণ লাগে না। বয়সটাই রাগের। আম্মাজী জাহেদারে নামাজের জন্যে পাটি টাটি কিছু দিতে বলেন। একটু কষ্ট দেই আম্মাজীরে। মনে কিছু নিয়েন না।

আমি নিজেই পাটি এনে দিলাম। মওলানা পাটিতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আম্মাজী আপনার একটা পত্র আছে আমার কাছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমার চিঠি ? কে দিয়েছে ?

'স্যারের স্ত্রী। নীরা ম্যাডাম দিয়ে গেছেন। বলেছেন— সময় সুযোগ মত আপনার হাতে দিতে। সময় সুযোগ পাচ্ছিলাম না। দিতে পারি নাই।'

আমি হাত বাড়িয়ে খাম বন্ধ চিঠি নিলাম। মওলানা বললেন, ম্যাডাম বলে গেছেন, চিঠি পড়া শেষ হলে আমি যেন আপনার কাছ থেকে নিয়ে নষ্ট করে ফেলি। আম্মাজী এক কাজ করেন। চিঠি এইখানেই পড়েন। এই ফাঁকে নামাজ আদায় করে ফেলি। আছরের নামাজ কাজা হয়েছিল। আর নামাজ কাজা করব না।

'নীরা ম্যাডাম যাবার সময় আপনাকে এই চিঠি দিয়ে গেছেন ?'

'জ্বি। আর হাতের এই টর্চ লাইটটাও দিয়ে গেছেন। বড় ভাল মেয়ে আমাকে অত্যন্ত পেয়ার করেন। আগে আমাকে আপনি করে বলতেন। এখন তুমি করে বলেন।'

আমি মওলানা সাহেবের হাত থেকে চিঠি নিয়ে কুপির আলোয় পড়তে বসলাম। জাহেদা তার কাজকর্ম করে যাচ্ছে। আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। বকটা আমার খুব কাছাকাছি। বকের একটা বিরাট ছায়া পড়েছে দেয়ালে।

রুমালী,

কিছু কিছু জিনিস আমি ভয়ঙ্কর অপছন্দ করি। চিঠি লেখা তার মধ্যে একটি। অনেককেই তার অপছন্দের কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়। জীবনের অনেক 'আয়রনি'র একটি হচ্ছে অপছন্দের কাজটি বেশি বেশি করা। যে চিঠি লিখতে অপছন্দ করে দেখা যায় তার জীবিকাই হয় চিঠি লেখা। পোস্টাপিসের সামনে সে টুল পেতে বসে থাকে। একটাকা দু'টাকার বিনিময়ে চিঠি লিখে দেয়। আমি সে রকম না। অপছন্দের কাজ আমি করি না। চিঠি লেখা আমার জীবিকা নয়। আমার যা বলার তোমাকে সরাসরিও বলতে পারতাম। বলতে ইচ্ছে করল না। বলতে গ্লানিবোধ হল।

চিঠি লিখতেও গ্লানিবোধ করছি— তবে চিঠির সুবিধাটা হচ্ছে আমার গ্লানিবোধ তোমাকে দেখতে হচ্ছে না। কেউ চায় না তার লজ্জা অন্যের সামনে তুলে ধরতে। শরীরের লজ্জা আমরা কাপড় দিয়ে ঢাকি। মনের লজ্জা কী দিয়ে ঢাকব ?

আমি ঢাকায় রওনা হবার আগে আগে মঈনকে বলে এসেছি— তুমি অবশ্যই রুমালীকে তোমার ছবি থেকে বাদ দেবে। এবং কেন বাদ দেয়া হল তা গুছিয়ে বলবে। সেই গুছিয়ে বলার মধ্যে যেন কোনরকম অস্পষ্টতা না থাকে। সে বলেছে, আচ্ছা।

আমি জানি সে কিছুই বলবে না। সত্য আগুনের মত। সবাই সেই আগুনের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আমার মত শক্ত মেয়েই পারে না, আর ও নিতান্তই দুর্বল একজন মানুষ। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে এই দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। এবং মওলানা সাহেবকে দিলাম তিনি যেন যথাসময়ে চিঠিটা তোমার হাতে দেন। মওলানাকে আমার পছন্দ হয়েছে। মঈনের অনেক গুণের মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে পাথরের গাদার ভেতর থেকে সে মানিক খুঁজে নিতে পারে। যাদেরকে সে খুঁজে নেয় তারা তাকে ভালবাসে অন্ধের মত। তারা তাকে ঘিরে রাখে কঠিন দেয়ালে। যেন দেয়াল ভেঙ্গে কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে। পৃথিবীর কোন যুক্তির ক্ষমতা নেই সেই দেয়ালে ফাটল ধরাবে।

রুমালী, আমার চিঠি খুব সম্ভব খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে— আমি প্রসঙ্গ ছেড়ে বাইরে চলে এসেছি। ভয় নেই আবারো প্রসঙ্গে ফিরে যাব। চিঠির এলোমেলো ভাব ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে— কারণ চিঠিটা লিখতে গিয়ে প্রবল মানসিক চাপ অনুভব করছি।

মঈনের দুর্বলতার কথা তোমার কাছে কিছু কিছু বলেছি। তার চরিত্রের সবল অংশের কথা বলা হয় নি। আমি নিজেও কিন্তু জানি না। একজন দুর্বল মানুষ আশেপাশের সবাইকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে পারে না। সে কিন্তু পারছে। কী করে পারছে আমার তা জানা নেই। এক সময় জানতে চেষ্টা করেছি— এখন চেষ্টা করি না। ধরে নিয়েছি এটি ব্যাখ্যাতীত কোন প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে। এই মানুষটির প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণের কারণ তুমি নিজে কি ব্যাখ্যা করতে পারবে ? পারবে না। মঈনের কাছে যে থাকে তার মনের 'Rational' অংশ কাজ করে না। মনে করা যাক তুমি তার পাশে গিয়ে বসলে। সে তোমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর রুমালী তোমার কী খবর ?" তাতেই তোমার পৃথিবী দুলে উঠবে। তোমার কাছে মনে হবে এই মানুষটির মুখ থেকে এই অপূর্ব বাক্যটি শোনার জন্যে তুমি জন্ম জন্ম ধরে অপেক্ষা করছিলে।

তোমার কি মনে আছে—

আমি তোমাকে বলেছিলাম তাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে প্রবল ঘোর তৈরি হয়েছিল, মনে হয়েছিল, এই মানুষটিকে আমার দরকার। মঈন নামের মানুষটি অতি সহজেই অন্যের ভেতর স্বপ্ন তৈরি করে দিতে পারে। সে তার নিজের স্বপ্নে অন্যদের টেনেও নিতে পারে। স্বপ্নহীন মানুষদের জন্য এটা

অনেক বড় ব্যাপার। তারা স্বপ্ন খুঁজে বেড়ায়। প্রথমবার তাকে দেখেই আমি বাবাকে হতভম্ব করে দিয়ে বলেছিলাম, এই মানুষটিকে আমি বিয়ে করতে চাই! ছেলে সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়ে বাবা হতভম্ব— সে মানুষ হয়েছে এতিমখানায়— পূর্ব পরিচয় বলতে তার তেমন কিছু নেই। আমি তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি— রবীন্দ্রনাথের ঐ বিখ্যাত গান— "ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে।" কিংবা, "আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।" ভাল কথা এই গান দু'টি কি তুমি গাইতে পার?

এখন তোমাকে লাবণ্যের কথা বলি।

আমার যখন বিয়ে হয় আমার ছোটবোন লাবণ্য তখন দেশের বাইরে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছে— ছুটি পায় নি বলে আসতে পারে নি। চিঠিতে আমাকে সাহস এবং উৎসাহ দিয়েছে। চমৎকার সব চিঠি। লাবণ্য আমার মত নয়— সে সুন্দর চিঠি লিখতে পারে। তার চিঠি পড়লে মনে হয় সে সামনে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছে। তার গানের গলাও অপূর্ব। এই দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে। সেও তোমার মতই চাপা স্বভাবের। গরমের ছুটিতে সে দেশে এল। মঈনের সঙ্গে তার প্রথম দেখা। মঈন তাকে বলল, "তারপর লাবণ্য তুমি কেমন আছ?" এই বাক্যটিতেই লাবণ্য অভিভূত হল বলে আমার ধারণা। তার চিন্তা চেতনার জগৎটা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। চাপা স্বভাবের মেয়ে বলে কাউকে সে তা বুঝতে দিল না। নিজেকে প্রবল ভাবে আড়াল করে রাখল। মঈনের সঙ্গে সে একা কখনো কথা বলে নি। আমরা দু'জন যখন গল্প করতাম তখনই সে উপস্থিত হয়ে হাসিমুখে বলত— আমি কি তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি? তোমাদের খানিকক্ষণ বিরক্ত করতে পারি?

তার ছুটি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সে ফিরে যেতে চাইল না। সে বলল, শান্তিনিকেতন তার ভাল লাগছে না। তারপরেও সে গেল। দিন দশেক থেকে হুট করে ফিরে এল। তার দিকে তখন তাকানো যায় না। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। মাথার চুল উঠে উঠে যাচ্ছে। আমি তাকে বলাম, তোর কী হয়েছে? সে বলল, বুঝতে পারছি না কী হয়েছে। ব্লাড ক্যানসার ফ্যানসার হয়েছে মনে হয়। চিকিৎসা করাতে এসেছি। শরীরের সব রক্ত ফেলে দিয়ে আমি নতুন রক্ত নেব। কোন পবিত্র মানুষের রক্ত। তোমার সন্ধানে কোন পবিত্র মানুষ আছে?

'তোর সমস্যা কী?'

'আমার সমস্যা— রাতে ঘুম হয় না। এমন কোন ঘুমের অষুধ নেই, খাই নি। কোন লাভ হয় নি।'

'দিনে ঘুম হয় ?'
'দিনে হয় তবে খুব সামান্য। আপা তুমি কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আমাকে শান্তিমত ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা কর। এ রকম আর কিছু দিন চললে আমি মরে যাব।'
তাকে ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তাররা কোন রোগ ধরতে পারলেন না। তার শরীর আরো খারাপ করল। পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। জীবনের শয্যাশায়ী অংশটা হয়ত তার ভাল কেটেছে কারণ এই সময় মঈন তাকে বই পড়ে পড়ে শুনাতো। নিজের লেখা চিত্রনাট্য শুনাত।
এখন তুমি যে ছবিটা করছ সেই ছবির চিত্রনাট্য তখনি করা। চিত্রনাট্যটা লাবণ্যের খুব পছন্দ ছিল। লাবণ্য বলতো— আমি অভিনয়ের কিছু জানি না, কিন্তু আমি দিলুর ভুমিকায় অভিনয় করব। আপনি কিন্তু আর কাউকে দিলু হিসেবে নিতে পারবেন না। আমি করব দিলু আর আপা করবে নিশাত। আসুন আমরা রিহার্সেল করি। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন কী করে অভিনয় করতে হয়।
তার শরীর একটু সুস্থ হল। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে। আমি এবং বাবা দু'জনই চেষ্টা করলাম তাকে আটকে রাখতে। সে থাকবে না। তাকে না-কি যেতেই হবে। সে চলে গেল। সাত দিনের মাথায় আবার ফিরে এল।
সে মারা যায় ছাদ থেকে পড়ে। পুলিশের কাছে আমরা সে রকমই বলেছি। ঘুম হত না বলে সে ছাদে হাঁটত। ছাদের রেলিং-এ পা তুলে বসে থাকত। খুব সম্ভব সেখান থেকেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়।
ব্যাপার তা ছিল না। সে খুব সুস্থ মাথায় ছাদ থেকে লাফ দেয়। যে তীব্র আবেগ সে মঈনের জন্যে জমা করে রেখেছিল— সেই আবেগ সে কখনো প্রকাশ করে নি। আমাকে কিছু বুঝতে দেয় নি। তার মৃত্যুর পর তার ডাইরি পড়ে আমি সব জানতে পারি। ডাইরির একটি অংশ আমি এত অসংখ্যবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে আছে। আমি স্মৃতি থেকে আবারো লিখছি। দেখবে এখানেও তোমার সঙ্গে লাবণ্যের খানিকটা মিল আছে—
মঈন ভাইকে আমার দুলাভাই ডাকা উচিত কেন জানি ডাকতে পারি না। দুলাভাই মানেই কিছু ফাজলামি, কিছু রসিকতা। দুলাভাই মানেই আশে পাশে শালিকারা ঘুর ঘুর করছে। না এটা আমার ভাল লাগে না।
আজ সকাল থেকেই ভেবে রেখেছি মঈন ভাইকে ভড়কে দেব। কী ভাবে কাজটা করব ভেবে পাচ্ছি না। আপার সঙ্গে উনার বোধ হয় মন কষাকষি

হয়েছে। উনি আলাদা ঘরে শুচ্ছেন। আমি তাঁর মন ভাল করার প্ল্যান করছি। শুরুতে ভড়কে দিয়ে তারপর মন ভাল করে দেব। প্ল্যানটা হচ্ছে বিকট একটা মুখোশ পরে গভীর রাতে উনার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। ভয় দেখিয়ে আক্কেল গুড়ুম করে দেব।

শেষ পর্যন্ত সেই প্ল্যান মত কাজ করা হয় নি। গভীর রাতে মুখোশ পরে জানালার পাশে না দাঁড়িয়ে আমি দরজায় টোকা দিলাম। উনি দরজা খুলে দিয়ে একটুও না চমকে বললেন— লাবণ্য এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি। সকাল থেকে মাথা ধরে আছে। গল্প করলে মাথা ধরাটা কমবে। আর শোন মুখ থেকে মুখোশটা খোল।

আমি মুখোশ খুললাম। উনি বললেন, আলো চোখে লাগছে। আলো নিভিয়ে দিলে তোমার অসুবিধা হবে?

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, কোন অসুবিধা হবে না। আপনি বাতি নিভিয়ে দিন। মঈন ভাই বাতি নিভিয়ে দিলেন। আমার কাছে মনে হল এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী মেয়ে কোন দিন জন্মায় নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

লাবণ্য আমাকে যদি ব্যাপারটা বলতো— তার সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে কোন ব্যাপারই ছিল না। আমার প্রধান ত্রুটি, লাবণ্যকে চোখের সামনে দেখেও তার সমস্যা সম্পর্কে কোন রকম আঁচ করতে পারি নি।

লাবণ্যের ছায়া আমি পুরোপুরি তোমার উপর দেখছি। আমার আত্মা কেঁপে উঠেছে।

রুমালী, ভালবাসা ব্যাপারটা কি তুমি জান? আমার ধারণা তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ভেবেছ? তুমি কি কিছু বের করতে পেরেছ? পেরেছ বলে আমি মনে করি না। অনেক গুণীজন এই ব্যাপার নিয়ে ভেবেছেন। হিসেব নিকেষ করেছেন— থিওরী বের করেছেন, হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়েছেন। ফলাফল শূন্য। কেউ কেউ বলেছেন ভালবাসার বাস মনে। মন যেহেতু আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ভালবাসাও তাই। বৈজ্ঞানিকদের কোন যন্ত্রে ভালবাসাকে ধরা ছোঁয়া যাবে না।

একদল বললেন— মন আবার কী? মস্তিষ্কই মন। মানুষের যাবতীয় আবেগের একমাত্র নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়— কাজেই ভালবাসাও ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। ব্রেইনের টেম্পোরাল লোবে ভালবাসা বাস করে। টেম্পোরাল লোবে অসংখ্য নিওরোনের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক ইম্পালসের বিশেষ ধরনের আদান প্রদানই ভালবাসা।

আরেকদল বললেন, কিছুই হয় নি। মানুষের আবেগ, ভয়, ভীতি সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পিটুইটারী গ্লান্ড। একটা মেয়ে যখন একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তখন ছেলেটিকে দেখা মাত্র পিটুইটারী গ্লান্ড থেকে বিশেষ এক ধরনের এনজাইম বের হয়। সেই এনজাইমের কারণে ছেলেটি তখন যা করে তাই ভাল লাগে। তা দেখেই হৃদয়ে দোলা লাগে। ছেলেটি যদি ফোঁৎ শব্দ করে হাতের মধ্যে নাক ঝেড়ে সিকনিতে হাত ভর্তি করে ফেলে তখনও মনে হয়— "আহারে কী সুন্দর করেই না নাক ঝাড়ছে। পৃথিবীতে তার মত সুন্দর করে কেউ নাক ঝাড়তে পারে না।"

ভালবাসার সর্বশেষ থিওরীটি তোমাকে বলি। সর্বশেষ থিওরীতে বিজ্ঞানীরা বলছেন— প্রকৃতির প্রধান ইচ্ছা তাঁর সৃষ্ঠ জীবজগৎ যেন টিকে থাকে। জীব জগতের কোন বিশেষ ধারা যেন বিলুপ্ত না হয়। জীব জগতের একটা প্রধান ধারা হচ্ছে হোমোসেপিয়ানস— মানব জাতি। মানবজাতিকে টিকে থাকতে হলে তাদের সন্তান হতে হবে, এবং উৎকৃষ্ট সন্তান হতে হবে। সন্তান হবার জন্যে মানব-মানবীকে খুব কাছাকাছি আসতে হবে। কাজেই তাদের ভেতর একের জন্যে অন্যের একটা প্রবল শারীরিক আকর্ষণ তৈরি করতে হবে। সেই শারীরিক আকর্ষণের একটা রূপ হচ্ছে ভালবাসা। সেই ভালবাসার তীব্রতারও হের ফের হয়। প্রকৃতি যখন দেখে দু'টি বিশেষ মানব-মানবীর মিলনে উৎকৃষ্ট সন্তান তৈরির সম্ভাবনা তখন তাদের ভালবাসাকে অতি তীব্র করে দেয়। যেন তারা একে অন্যকে ছেড়ে যেতে না পারে। কোন বাধাই তাদের কাছে তখন বাধা বলে মনে হয় না। ছেলেরা রূপবতী মেয়েদের প্রেমে পড়ে— কারণ প্রকৃতি চায় পরবর্তী প্রজন্ম যেন সুন্দর হয়। গুণী মানুষদের প্রেমে মেয়েরা যুগে যুগে পাগল হয়েছে। কারণ প্রকৃতির সেই পুরানো খেলা, প্রকৃতি চাচ্ছে পুরুষদের গুণ যেন পরবর্তী প্রজন্মে ডি এন এ'র মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রকৃতি প্রাণপণে চাচ্ছে মানব সম্প্রদায়ের গুণগুলি যেন নষ্ট না হয়ে যায় যেন প্রবাহিত হতে হতে এক সময় পূর্ণ বিকশিত হয়। তৈরি হয় একটা অসাধারণ মানব সম্প্রদায়।

হাইপোথিসিস হিসেবে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না-কি ? যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক আমার নিজের ধারণা হাইপোথিসিস ঠিক নয়। আমি মঈন নামের মানুষটির প্রতি প্রবল ভাবেই আকর্ষিত হয়ে প্রায় ঘোরের মধ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পরপরই আমার নিজের জগৎ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। কারণ মঈন একজন অসম্পূর্ণ মানুষ। আমি কী বলার চেষ্টা করছি তুমি বুঝতে পারছ ? এন্টেনা নামের আমাদের একটি মেয়ে আছে। সে আমাদের ভালবাসার ফসল নয়। তাকে দত্তক নেয়া হয়েছে।

পশু কাঁদতে পারে না, হাসতেও পারে না। তারপরেও তীব্র যন্ত্রণায় পশু মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করে। পশুর যন্ত্রণার এই প্রকাশ একবার যদি তুমি দেখ— তোমার মাথায় তা সারাজীবনের মত গেঁথে যাবে। আমি প্রায়ই পশুর কান্নার এই দৃশ্য দেখি। মঈন গভীর রাতে অবিকল পশুর মতই কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে কী বলে জান? সে বলে— প্লীজ ডোন্ট থ্রো মি অন দ্যা স্ট্রীট। আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেল না। আমি তোমাকে মুক্তি দেব। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব বা ঘুমের অষুধ খাব। আমাকে অল্প কিছু দিন সম্মান নিয়ে বাঁচতে দাও।

সে তার এই অসম্পূর্ণতা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছে— আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই করার নেই।

আমি তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি নি। আমি তাকে বাস করতে দিয়েছি। সম্ভবত একজন অসুস্থ মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমি নিজেও মানসিক ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছি। তার কষ্ট অবশ্যই অসহনীয়, আমার নিজের কষ্টও কিন্তু অসহনীয়। সে নিজে যেমন পশুর মত কাঁদে আমি নিজেও পশুর মত কাঁদি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে সে ছাদে চলে যায়। রেলিং এর উপর উঠে বসে— আমি পেছনে পেছনে গিয়ে বলি, কী করছ? সে বলে, নীচে লাফিয়ে পড়ব। সাহস সঞ্চয় করছি। আমি বলি— প্লীজ ডু দ্যাট। তোমার জন্যে ভাল হবে। আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে নয়। নিজেকে মুক্তি দেবার জন্যেই এই কাজটা তোমার করা দরকার।

রুমালী! একজন মানুষ কোন পর্যায়ে এ ধরনের কথা বলতে পারে?

তোমাদের চণ্ডিগড়ে জাহেদা নামের একটা মেয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে। সে বলেছে— চণ্ডিগড়ে শুটিং হবে না। একটা মানুষ মারা যাবে। শোনামাত্রই আমার মনে হয়েছে— আচ্ছা এই মানুষটা কি মঈন হতে পারে না? ভয়ংকর একটা খেলা কি শেষ হবে না?

প্রকৃতি অসুন্দর পছন্দ করে না। অপূর্ণতা পছন্দ করে না। তারপরেও সে অসুন্দর এবং অপূর্ণতা তৈরি করে তাদের নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলে। কেন খেলে বলতো?

আমার যা লেখার আমি লিখলাম। তোমার সঙ্গে কি আবারো আমার দেখা হবে? দেখা না হওয়াই ভাল। আর যদি দেখা হয়েও যায়— আমি ভাব করব তোমাকে চিনতে পারি নি। তুমি তাতে রাগ করো না। আরেকটা ছোট্ট অনুরোধ। চিঠিটা তুমি নষ্ট করে ফেলো।

—নীরা

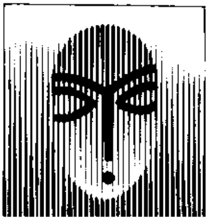

মওলানা সাহেব আগে আগে যাচ্ছেন। আমি তাঁর পেছনে। মওলানা সাহেবের হাতের টর্চে কী যেন সমস্যা হয়েছে— কিছুতেই জ্বলছে না। আমরা পথ চলছি অন্ধকারে। মাঝে মাঝে মওলানা সাহেব থামছেন— হাতের টর্চ ঝাঁকাঝাকি করছেন। কোন লাভ হচ্ছে না।

'আম্মাজী!'

'জ্বি।'

'নক্ষত্রের আলোয় নদীপথে যাওয়া যায়— কিন্তু স্থলপথে যাওয়া যায় না। টর্চটা নষ্ট হয়ে বিপদে পড়লাম। চলেন বড় রাস্তা দিয়ে যাই। একটু ঘোরা হবে। উপায় কী ।'

'চলুন যাই।'

আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম। আমার হাঁটতে ভাল লাগছে। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বাতাসে মাটির এবং কাঠ পোঁড়ানো ধোঁয়ার গন্ধ। পোড়া কাঠের গন্ধ কোত্থেকে আসছে? হাঁটার সময় মানুষ না-কি খুব ভাল চিন্তা করতে পারে। আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। মাথা পুরোপুরি খালি হয়ে আছে। মোসাদ্দেক স্যার বলতেন, খুকীরা মন যখন খুব অস্থির হবে তখন মনে মনে গান করবে। মন শান্ত হবে, মন শান্ত করার এর চেয়ে ভাল অষুধ নাই। মন শান্ত করার এটা হল কোরামিন ইনজেকশন। আশ্চর্য কোন গানের কথা, কোন গানের সুর আমার মনে আসছে না।

'আম্মাজী!'

'জ্বি মওলানা সাহেব।'

'মনটা কি অত্যধিক খারাপ হয়েছে?'

'নাতো মন খারাপ হবে কেন ?'

'নীরা ম্যাডাম বলেছিলেন, চিঠি পড়ার পর রুমালীর মনটা হয়ত খুব খারাপ হবে। মওলানা তুমি তার দিকে লক্ষ্য রেখো। ম্যাডাম আমাকে অত্যধিক স্নেহ করেন। আমাকে তুমি করে বলেন। আম্মাজী মনটা কি বেশি খারাপ ?'

'আমার মন খারাপ না।'

'হাঁটতে কষ্ট লাগছে ?'

'হাঁটতে মোটেও কষ্ট হচ্ছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে।'

'শুক্লা পক্ষ হলে হেঁটে মজা পেতেন। কৃষ্ণ পক্ষ শুরু হয়েছেতো হেঁটে মজা নাই। আম্মাজী একটা টেম্পো নিয়ে নেই।'

'এসেইতো পড়েছি টেম্পো নিতে হবে কেন ?'

মওলানা সাহেব প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, মিশনারী হাসপাতাল হয়ে যাই। মানে ব্যাপার হয়েছে কী আপনার মাতা'র শরীরটা সামান্য খারাপ করেছে। ডাক্তার বললেন হাসপাতালে থাকাই ভাল। তেমন কিছু অবশ্য না। হাসপাতালে না নিলেও চলত। বিদেশ জায়গা। হাসপাতালটা ভাল। মিশনারীরা হাসপাতাল, স্কুল এইসব ভাল করে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মওলানা এইসব কী বলছেন ? হাসপাতালে নেবার মত কী ঘটল !

'মা'কে হাসপাতালে কখন নেয়া হয়েছে ?'

'বিকালে। তাঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ করল— নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। হাসপাতালে আবার অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে। বিসমিল্লাহ বলে নলটা নাকে ঢুকায়ে দিলেই হয়।'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, মা'কে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে এমন অবস্থা আর খবরটা আপনি এতক্ষণে দিলেন ?'

'আম্মাজী আপনিতো ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে ডেকে তুলে দুঃসংবাদ দিতে নাই। নিষেধ আছে। ঘুম ভাঙ্গারও ঘন্টা খানিক পরে দুঃসংবাদ দিতে হয়।'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মওলানা সাহেব বার বার দুঃসংবাদ দুঃসংবাদ করছেন কেন ? মা কি মারা গেছেন ? সুস্থ সবল মানুষ চোখের পলকে ধড়ফড় করে মারা যায়। মা কোন সুস্থ মানুষ না।

'মা'র শরীর এখন কেমন ? ঠিক করে বলুনতো ?'

'আম্মাজী উনি ভাল আছেন। ডাক্তার ঘুমের অষুধ দিয়েছেন। আমি যখন আসি তখন দেখে এসেছি শান্তিমত ঘুমাচ্ছেন। যে কোন অসুখে ঘুম অষুধের মত কাজ

করে। অস্থির হবার মত কিছু হয় নাই। অস্থিরতা আল্লাহপাক নিজেও পছন্দ করেন না। কোরআন মজিদে এই জন্যে বলা হয়েছে— হে মানব সন্তান তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

আমার কোন তাড়াহুড়া নেই। আমি অস্থির না। আমি স্থির। আমি সব সময়ই এ রকম। মা'র মৃত্যু সংবাদ পেলেও হয়ত স্থিরই থাকতাম। ইউনিটের লোকজন বলত মেয়েটা মানুষ না পাথর ? প্রকৃতি কাউকে পাথর বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠায় হাজারো দুঃখ কষ্টেও তাদের কিছু হয় না। আবার কাউকে কাউকে বরফ বানিয়ে পাঠায়— সামান্য উত্তাপে বরফ গলে পানি।

মা'র মৃত্যুর পর আমার কী হবে ? জীবন যাত্রায় তেমন কোন পরিবর্তন কী হবে ? মা'র সঙ্গে আগে যে ঘরে থাকতাম পরেও নিশ্চয়ই সেই ঘরেই থাকব। বজ্রপাতের শব্দে মা'র বুকের কাছে লুকানোর সুযোগ হবে না। আশ্বিন মাসে শেষ রাতের দিকে যখন শীত পড়বে তখন ঘুম ঘুম চোখে মা'কে বলব না— মা গায়ে কাঁথা দিয়ে দাও।

মৃত্যু শোক ভোলা যায় না বলে একটা ভুল কথা প্রচলিত আছে। সবচে সহজে যে শোক ভোলা যায় তার নাম মৃত্যু শোক। সবচে তীব্র শোক হচ্ছে— জীবিত মানুষ হারিয়ে যাবার শোক। হারিয়ে যাওয়া মানুষটি যতদিন জীবিত থাকে ততদিন এই শোক ভোলা যায় না। বাবা যদি মা'কে ছেড়ে না গিয়ে মারা যেতেন মা বাবাকে ভুলে যেতেন এক বছরের মাথায়। তার ভালবাসার কম্বল উইপোকায় কেটে ফেলত। বাবা বেঁচে আছেন কিন্তু হারিয়ে গেছেন বলেই মা'র এই তীব্র কষ্ট।

পাশাপাশি থেকেওতো একজন মানুষ হারিয়ে যেতে পারে। মঈন সাহেব তাঁর স্ত্রীর পাশেই বাস করছেন— কিন্তু হারিয়ে গেছেন। নীরা ম্যাডামের শোক এবং যন্ত্রণার এইটাই কারণ। নীরা ম্যাডাম কি এই তথ্য জানেন ?

'আম্মাজী আমরা এসে পড়েছি— এইটা মিশনারী হাসপাতাল।'

হাসপাতাল কোথায়, ছিমছাম ছোট্ট লাল ইটের বাড়ি। সামনে কী সুন্দর বাগান। বাগানের ঠিক মাঝখানে মাদার মেরীর পাথরের মূর্তি। মেরীর কোলে শিশু জেসাস খ্রাইস্ট। হাসপাতালের কাছাকাছি এলেই ফিনাইলের গন্ধ পাওয়া যায়— আমি পাচ্ছি ফুলের ঘ্রাণ। বেলী ফুলের ঝাড় থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে। কী আশ্চর্য !

'মিশনারীদের হাসপাতালতো আম্মাজী— বড় সুন্দর। এই হাসপাতালে মৃত্যু হলেও আরাম। একটা ভাল জায়গায় মৃত্যু হল। হাসপাতাল যিনি চালান—

ফাদার পিয়ারে উনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক বিশিষ্ট ডাক্তার। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বড়দিনের দিন আমাকে এক ঝুড়ি ফল পাঠায়েছেন। একটা নতুন স্যুয়েটার পাঠায়েছেন। নীল রঙ। আসল ভেড়ার লোমের স্যুয়েটার। মাঘ মাসের শীতে এই স্যুয়েটার পরলে গরমে গায়ে ঘামাচি হয়ে যায়। স্যুয়েটারটা চুরি হয়ে গেছে। থাকলে দেখাতাম।

'আপনাকে সবাই পছন্দ করে কেন?'

'এটাতো আম্মাজী বলতে পারব না। এটা আল্লাহপাকের একটা মহিমা।'

বাগান পার হয়ে হাসপাতালের সামনে দাঁড়ালাম। আমাদের পায়ের শব্দে যিনি বের হয়ে এলেন তিনিই ফাদার পিয়ারে। তালগাছের মত লম্বা একজন মানুষ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তারপরেও মনে হচ্ছে শক্ত শরীর। খেটে খাওয়া মানুষদের মত পেশী বহুল হাত। পরনে বাঙ্গালীদের মত লুঙ্গী এবং লুঙ্গীর উপর হাতকাটা পাঞ্জাবি। সুন্দর বাংলা বলেন। মাঝে মধ্যে দু'একটা নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ তাঁর বাংলায় ঢুকে পড়ে। তাতে তাঁর বাংলা ভাষা আরো সুন্দর হয়ে কানে বাজে। যেমন আমার মা সম্পর্কে বললেন— তোমার মা ভাল আছে। শ্বাস কষ্ট ছিল এখন নাই। এখন শান্তিমত 'ঘুমাইচ্ছে'। 'ঘুমাইচ্ছে' শব্দটা কী সুন্দর করেই না কানে বাজল।

'খুকী তুমি মা'কে দেখে চলে যাও। আমাদের এখানে রুগীর সঙ্গে থাকার নিয়ম নাই। মা ঘুমাইচ্ছে— ডোন্ট ওয়েক হার আপ। ঘুমের অষুধ দিয়েছি।'

আমি মা'র বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মা হাত পা এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। হাতে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। খুব ধীর লয়ে তাঁর বুক ওঠা নামা করছে। একজন নার্স মা'র পাশেই টুল পেতে বসে আছেন। ফাদার পিয়ারে বলেছিলেন মা শান্তিমত ঘুমুচ্ছেন। এই কি শান্তিমত ঘুমের নমুনা? দেখেতো মনে হচ্ছে মা মৃত্যুর হাত ধরে শুয়ে আছেন। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার আমি কি মায়ের গায়ে হাত রেখে পাশে বসতে পারি? সিস্টার ঘাড় কাত করলেন।

মা'র হাতে হাত রাখতেই তিনি ঘুমের মধ্যেই হাত সরিয়ে নিলেন। তার পরপরই চোখ মেললেন। আমি বললাম, কেমন আছ মা?

মা হাসলেন। এবং আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

'শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে?'

'সন্ধ্যার সময় খুব খারাপ লাগছিল। এখন লাগছে না।'

'তোমার অবস্থা দেখে আমার খুব ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই আমি মরব না। আমি মরলে তোকে কে দেখবে?'

আমি মা'র হাত আমার কোলে রাখলাম। নার্স বললেন, আপনি চলে যান। আপনি এখানে থাকলেই আপনার মা কথা বলতে থাকবেন। ঘুম হবে না। তাঁর ঘুম দরকার। ডাক্তার জানতে পারলে খুব রাগ করবেন। উনি ভয়ংকর রাগী।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললাম, মা যাই।

মা চোখ বন্ধ রেখেই বললেন— তোর বাবা বোধ হয় রাতেই আসবে। যদি আসে হাসপাতালে পাঠানোর দরকার নাই। এই হাসপাতালে বাইরের কাউকে থাকতে দেয় না।

'মা আমার উপর তোমার রাগটা কি একটু কমেছে?'

'কোন রাগ নেই।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'মা আমি যাই?'

'আচ্ছা। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করিস।'

'আচ্ছা।'

'তোর বাবা যদি আসে তাহলে তার খাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিস। খাওয়ার সময় সামনে থাকিস। কেউ সামনে না থাকলে সে খেতে পারে না।'

'মা তুমি নিশ্চিত থাক। বাবা যদি আসে আমি অবশ্যই তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব।'

মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। বাবা যে আসবে না, এই সহজ সত্যটা তিনি বুঝতে পারছেন না। যে চলে যায় সে ফিরে আসার জন্যে যায় না। তার জন্যে ভালবাসার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়ে রাখলেও লাভ হবে না। আর যে আসে সে সিংহাসনের জন্যে অপেক্ষা করে না।

আমি মওলানা সাহেবকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছি। মওলানা সাহেবের টর্চ ঠিক হয়েছে। আলো দিচ্ছে। এর আগে কি তিনি মিথ্যা মিথ্যি টর্চ নষ্ট করে রেখেছিলেন? যাতে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে আসতে পারেন। সেখান থেকে মিশনারী হাসপাতালে।

'মওলানা সাহেব!'

'জ্বি আম্মাজী।'

'আপনি কি আমার মা'র জন্যে একটু দোয়া করবেন?'

'এটাতো আম্মাজী আপনাকে বলতে হবে না। উনি হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে খতমে ইউনুস পড়তেছি। খুব শক্ত দোয়া। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন।'

ক্যাম্প কেমন নিঃস্প্রাণ। লোকজন নেই। রাত এমন কিছু হয় নি অথচ মনে হচ্ছে সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে। আমি নিজের ঘরে চলে গেলাম। ঘরে ঢুকে বড় ধরনের চমক খেলাম। বাবা খাটে বসে আছেন। তাঁর পাশে কালো রঙের হ্যান্ড ব্যাগ।

টেবিলে কলা, আনারস। তাঁকে খুবই বয়স্ক দেখাচ্ছে। মাথার চুল প্রায় সবই পড়ে গেছে। শেষবার যখন দেখেছি তখনো তাঁর মাথায় অনেক চুল ছিল। মনে হচ্ছে অল্পদিনেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমার মনে হল তিনি অকূল সমুদ্রে পড়েছিলেন। আমাকে দেখে খানিকটা ভরসা পেলেন। আমার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলি— "বাবা তুমি আজ আসায় আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি।" কিন্তু সে রকম কিছুই করতে পারলাম না। শুধু বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আমি খবর পেয়েই রওনা হয়েছি, তারপর গাড়ি নষ্ট, ফেরী নাই— বিরাট ঝামেলা। এসে শুনি তোর মা হাসপাতালে...।

'তুমি যে সত্যি এসেছ বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, তোরা বিপদে পড়বি আমি আসব না?

'মা তোমাকে দেখে কী যে খুশি হবে।'

বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ কেমন যেন ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে। কেঁদে ফেলবেন নাতো? আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললাম, ওরা কেমন আছে বাবা? আমার দুই ভাই বোন?

বাবা নিচু ভঙ্গিতে বললেন, ভাল।

'ওদের নাম আমি জানি না। ওদের নাম কী?'

বাবা বিব্রত গলায় বললেন, মেয়েটার নাম 'রূপা' আর ছেলের নাম তার মা রেখেছে 'সাকিব'।

নিজের ছেলেমেয়েদের নাম বলছেন এতে এত বিব্রত হবার কী আছে? আমি বললাম, রূপা নাম তুমি রেখেছ?

'হুঁ।'

'ওরা কি জানে রুমালী নামে তাদের একটা বোন আছে?'

'জানবে না কেন। জানে।'

'তুমি কি রূপাকে স্কুলে দিয়ে আসো, নিয়ে আসো ?'

'তার মা দিয়ে আসে। আমি নিয়ে আসি।'

'ফেরার পথে তুমি কি তোমার মেয়েকে আইসক্রীম কিনে খাওয়াও ? আমাকে যেমন খাওয়াতে ?'

বাবা জবাব দিলেন না। বাবা খুবই অস্বস্থি নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। বাবার কি এখন উচিত না তাঁর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়া ? না-কি মেয়ে অচেনা হয়ে গেছে ? অচেনা মেয়েকে আদর করতে সংকোচ লাগছে ?

'তোমার শরীরটা এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা। বুড়ো হয়ে গেছ।'

'বয়স হয়েছেতোরে মা।'

'কেন বয়স হচ্ছে ?'

বাবা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বিষণ্ন গলায় বললেন, তোর মা'র শরীর কি বেশি খারাপ ?'

'হ্যাঁ। তবে তুমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই মা'র শরীর ভাল হয়ে যাবে।'

'আমি এখনই যাচ্ছি। রাতে হাসপাতালেই থাকব।'

'মিশনারী হাসপাতাল, তোমাকে থাকতে দেবে না।'

'অসুবিধা নেই। বারান্দায় বসে থাকব। না-কি বারান্দাতেও বসতে দেবে না ?'

'বারান্দায় বসতে দেবে। বাবা শোন বিয়ের পর পর তুমি মা'কে চমকে দেয়ার জন্যে অনেক উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করতে। এ রকম কোন উদ্ভট কিছু কি করতে পারবে ?'

বাবা অবাক হয়ে বললেন— কী করতে বলছিস ?

'জোনাকি পোকার একটা মালা মা'র গলায় পরিয়ে দেবে ?'

'জোনাকি পোকার মালা পাব কোথায় ?'

'আমি জোগাড় করে দেব। বাবা তুমিতো জান না— তুমি মা'কে একটা কম্বল কিনে দিয়েছিলে— সেই কম্বলটা মা চৈত্র মাসের গরমেও গায়ে দিয়ে রাখে। তুমিতো হাসপাতালে যাচ্ছ মায়ের পায়ের কাছে কম্বলটা দেখবে।'

'এইসব কথা কেন বলছিস ?'

'আমার মনটা খুব খারাপতো। এই জন্যে বলছি। যখন আমার মন খারাপ হয় তখন ইচ্ছে করে আশে পাশের সবার মন খারাপ করে দেই।'

বাবা পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, তুই একটু কাছে আয়তো মা। তোর মাথায় হাত বুলিয়ে তোকে একটু আদর করি।

আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছি। আমি কাঁদছি না কিন্তু বাবা খুব কাঁদছেন।

আমি বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি যেন তিনি বয়স্ক কোন মানুষ নন। অল্প বয়েসী শিশু। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদছেন।

বাবা মওলানা সাহেবকে নিয়ে মা'কে দেখতে গেছেন। আমি গোসল করে কাপড় বদলে ডাইনিং হলে খেতে গিয়েছি। ডাইনিং হলে তিথি বসে আছে। একপাশে তিথি, এক পাশে তার মা এবং এক পাশে বাবা। তিথি মুখের সামনে একটা বই ধরে আছে। তিথির মা ভাত মাখিয়ে তার মুখে তুলে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি লজ্জা পেলেন। এত বড় মেয়েকে মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিতে হচ্ছে এই জন্যেই হয়ত লজ্জা। আমার কাছে দৃশ্যটা খুব সুন্দর লাগল। তিথি মুখের উপর থেকে বই নামিয়ে বলল, তুমি কোথায় ছিলে ? বিকেল থেকে তোমাকে খুঁজছি। কেউ বলতে পারছে না তুমি কোথায়। এদিকে তোমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। মেয়েকে খোঁজা হচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে না।। তুমি দেখি আমার চেয়েও অদ্ভুত।

'খুঁজছিলে কেন ?'

'বলেছিলাম না তোমাকে ছবি দেখাব ? রবীন্দ্রনথের সঙ্গে ছবি। ছবি খুঁজে পাই নি। মনে হচ্ছে আনা হয় নি। সোহ্‌রাব আংকেলের কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিয়েছি। ঢাকায় পৌঁছেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি শুনেছ যে আমি অভিনয় করছি না। ঢাকা চলে যাচ্ছি।'

'শুনেছি।'

'কী জন্যে অভিনয় করব না, সেটা শুনেছ ?'

তিথির মা বললেন, চুপ করতো মা। এত সব বলার দরকার কী !

তিথি বলল, আমার বলতে ইচ্ছে করছে। তুমি দয়া করে ইন্টারফেয়ার করবে না। ভাত যা খাবার খেয়েছি। আর খাব না। আমার মুখ ধুইয়ে চলে যাও। কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি— রুমালীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। আজ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করব।

তিথির মা বললেন, গল্প সকালে করলে হবে না ?

'না সকালে করলে হবে না। এখনি করতে হবে। প্লীজ তোমরা দু'জন এখন যাও।'

আমি ভাত খাচ্ছি। তিথি আমার সামনে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছে। খুব ভাল লাগছে তিথির গল্প শুনতে।

'পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে আমার লেগে গেল। একটা সিকোয়েন্স নেয়া হবে। দিলু আর নিশাত বসে আছে। দিলু বলবে— আপা তুমি কথা বলার সময় আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

নিশাত বলবে, কথা বলার সময় তোর দিকে তাকাতে হবে কেন?

'আমার সঙ্গে কথা বললে— আমার দিকে তাকিয়ে বলতে হবে।'

'কেন তুই এত বিরক্ত করিস দিলু।'

'এই কথাটা তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বল।'

নিশাত তখন বিরক্ত হয়ে উঠে যাবে। এই দৃশ্যটা হবার সময় ঝামেলা হল। পাপিয়া ম্যাডাম অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন আমি হাত দিয়ে তার মুখ ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে বললাম— "আমার সঙ্গে কথা বললে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে হবে।"

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, তিথি শোন আমার গায়ে হাত দিও না। আমাকে টাচ না করে ডায়ালগ বল।

আমি বললাম, সেটা ভাল হবে না।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ভাল হোক বা না হোক। তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।

আমি বললাম— গায়ে হাত দেব না কেন? আপনার কি কোন ছোঁয়াছে অসুখ আছে যে গায়ে হাত দিলে আমার সেই অসুখ হয়ে যাবে?

পাপিয়া ম্যাডাম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন— এ রকম বেয়াদবী কার কাছ থেকে শিখেছ। আমি বললাম, আমি কারো কাছ থেকে কিছু শিখি না। আমি যা করি নিজে নিজে করি।

তিথিকণা খুব হাসতে লাগল।

আমি বললাম, তোমাদের এই ঝগড়া ঝাটির সময় ডিরেক্টর সাহেব কি করলেন? চুপ করে রইলেন?

'ঝগড়া যখন শুরু হল তখন উনি ছিলেন না। হঠাৎ উনার শরীর খারাপ করল। তিনি শট ডিভিশন তাঁর এসিসটেন্টকে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমি যখন বললাম— আমি অভিনয় করব না। তখন সোহরাব চাচা ডিরেক্টর সাহেবকে আনতে গেলেন। উনি এলেন না। বলে পাঠালেন, "শুটিং প্যাক আপ।"

'উনার সঙ্গে পরে তোমার দেখা হয় নি ?'

'দেখা হয়েছে। শুটিং স্পট থেকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উনি দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসেছিলেন। আমি যখন বললাম, আংকেল আমি অভিনয় করব না। কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি। উনি বললেন, আচ্ছা। আমি বললাম, আংকেল আপনি রাগ করছেন নাতো ? উনি বললেন, আমি তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। যদি ধাঁধার জবাব দিতে পার তাহলে রাগ করব না। তিনটা পিঁপড়া নিয়ে একটা ধাঁধা।'

'তুমি জবাব দিতে পেরেছ ?'

'হ্যাঁ পেরেছি।'

'কাল সকালে তুমি চলে যাচ্ছ ?'

'আমি একা না। সবাই চলে যাচ্ছে।'

'সে কী !'

'সোহরাব চাচা বলেছেন— শুটিং শিডিউল নতুন করে করা হবে। এখন সব কাজ বন্ধ। বাকি যা কাজ শীতের সময় করা হবে। তারা যে জেনারেটার নিয়ে এসেছিল সেটাও ঠিক মত কাজ করছে না। আমার কী মনে হয় জান ? আমার মনে হয় এই ছবিটা আর হবে না। না হলেই ভাল।'

'না হলে ভাল কেন ?'

'গল্পটা বাজে। দিলু মরে গেল। দিলু মরবে কেন ? মরার মত কী হয়েছে ? দুঃখ কষ্ট পেলেই মরে যেতে হবে ?'

'তিথি!'

'বল।'

'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'দূর থেকে দেখেছতো এই জন্যে পছন্দ হয়েছে। কাছ থেকে দেখলে পছন্দ হত না। দূর থেকে যে জিনিস যত সুন্দর কাছ থেকে সেই জিনিস তত অসুন্দর।'

'তাই বুঝি ?'

'অবশ্যই তাই। দূর থেকে চাঁদ কত সুন্দর। কাছে গেলে পাথরের পাহাড়— এবড়ো থেবড়ো, খানা, খন্দ, গর্ত।'

জাহেদা বলেছিল রাতে ঝড় হবে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডাকবে। হাতি ডোবা বান। জাহেদার কোন কথাই ঠিক হয় না। এই কথাটা কি মিলে যাবে ? আকাশে কোন তারা দেখা যাচ্ছে না। মেঘ জমেছে। বিজলী চমকাচ্ছে। বিজলী

চমকালেই বজ্রের শব্দ শোনা উচিত। বজ্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ঝড় দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে পা তুলে বেশ আরাম করে বসে আছি। ঝিঁঝিঁ ডাকছে না। বড় ধরনের বৃষ্টি বা ঝড়ের আগে আগে ঝিঁঝিঁ পোকারা চুপ করে যায়।

ক্যাম্প নীরব হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেও উঠোনে কয়েকজন লাইটবয় ঝগড়া করছিল। এখন তারা নেই। জোনাকি আছে। প্রচুর পরিমাণে আছে। জোনাকি ধরার কোন জাল থাকলে এক খেপে অনেক জোনাকি ধরে ফেলা যেত। একটা লম্বা সুতায় মৌমাছির মোম মাখিয়ে জোনাকিগুলি বসিয়ে দিলেই– জোনাকির মালা।

মা'কে নিয়ে আমি এখন আর দুঃশ্চিন্তা করছি না। বাবা চলে এসেছেন দুঃশ্চিন্তা যা করার তিনিই করবেন। জোনাকি পোকার একটা মালা বানিয়ে বাবাকে দিয়ে এলে চমৎকার হত। দেয়া গেল না। একদিকে ভালই হয়েছে। মালা বানান হলে হয়ত দেখা যেত বাস্তবের মালা কল্পনার মালার মত সুন্দর হয় নি।

অস্পষ্ট ভাবে বৃষ্টির ফোঁটা কি পড়তে শুরু করেছে ? বোধ হয় না। পাহাড়ি বৃষ্টি ঝম করে চলে আসে। ধীরে সুস্থে আসে না। যত বৃষ্টি নামুক, ঝড় আসুক আমি এই জায়গা থেকে নড়ব না। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হলেও খবরদারীর জন্যে আজ মা আসবেন না। টেনে হিঁচড়ে ঘরে ঢোকানোর চেষ্টা করবেন না। আজকের রাতটা পুরোপুরি আমার। রাতটা আমি গল্প করে করে কাটাব। কার সঙ্গে গল্প করব ? দিলুর যেমন কল্পনার বান্ধবী আছে এমন কোন কল্পনার বান্ধবীকে নিয়ে আসব। ঝুম বৃষ্টি নামলে দু'জনে মিলে ভিজব। সোমেশ্বরী নদীতে সত্যি যদি হাতি ডোবা বান ডাকে তাহলে তাকে নিয়ে নদী দেখতে যাব। মানুষ একা কোথাও যেতে পারে না। যখন কেউ থাকে না তখন কল্পনার একজনকে পাশে থাকতে হয়। কল্পনার বন্ধু থাকা খুব চমৎকার ব্যাপার। তাকে নিজের মত করে তৈরি করা যায়। পছন্দ না হলে ঢেলে সাজানো যায়। তাকে রূপ দেয়া যায়। তার কাছ থেকে রূপ কেড়ে নেয়া যায়।

নীরা ম্যাডামের মত একজন কাউকে এনে কি পাশে বসাব ? তাঁর সঙ্গে গল্প করব। না থাক। বরং তাঁর চিঠিটার একটা জবাব মনে মনে লিখে ফেলি। এই চিঠি তিনি পড়বেন না। তাতে কী ? অন্তত আমি নিজেতো জানব তাঁর চিঠির একটা জবাব আমার কাছে আছে। সম্বোধন কী হবে ? নীরা ম্যাডাম লিখব ? না-কি ভাবী ? সুজনেষু ? সুহৃদয়েষু ? কোনটাইতো মানাচ্ছে না। যদি শুধু নীরা

লেখা যেত তাহলে মানাতো। সেটা সম্ভব না। উনি অনেক বড় মানুষ— আমি কে ? আমি কেউ না।

"আপনার চিঠিটি আজ রাতে পড়েছি। যে কোনো চিঠি আমি দু'বার তিনবার করে পড়ি। আপনারটা একবারই পড়েছি। এত সুন্দর চিঠি কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছে করল না। আপনি চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে বলেছেন— আমি নষ্ট করে ফেলেছি। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। তারপরেও চিঠিটা পুরোপুরি নষ্ট হয় নি। আপনার মাথায় রয়ে গেছে। আমার মাথায়ও রয়ে গেছে। যেদিন আমরা দু'জন পৃথিবীতে থাকব না শুধুমাত্র সেদিনই চিঠিটা নষ্ট হবে।

চিঠিতে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আপনি জানতে চাচ্ছিলেন— কেন আমি উনাকে এত পছন্দ করলাম। বা আমার মত অন্যরা কেন করছে। আপনি এই প্রশ্নের জবাব জানেন না দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের এই প্রশ্নের জবাব পেতে এত দেরি হল কেন ? কী করে আপনি ভাবলেন— উনার ছেলে ভুলানো পিঁপড়ের ধাঁধা জাতীয় কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পাগলের মত সবাই উনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। কিংবা উনার দুঃখময় শৈশবের গল্প শুনে আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে প্রবল করুণা। করুণা থেকে জন্ম নিচ্ছে প্রেম। আপনি এমনও ধারণা করছেন যেন উনি নানান ধরনের কৌশল করে করে আমাকে বা লাবণ্যকে বা আমাদের মত কাউকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছেন ? আপনি নিজে মেয়ে— আপনারতো জানা উচিত মেয়েরা সবার আগে যা ধরতে পারে তা হল পুরুষদের কৌশল। পুরুষদের হ্যাবলামীও সহ্য করা যায় কিন্তু কৌশল না।

প্রবল আবেগ নিয়ে উনার কাছে ছুটে যাওয়ার কারণটি এখন আমি ব্যাখ্যা করি ? আমার মা একবার টবে পুঁই শাকের একটা চারা পুতলেন। চারাটায় যেন ঠিকমত রোদের আলো পড়ে সে জন্যে মা টবটাকে বারান্দার মাঝামাঝি এনে রাখলেন। তারপর আমি একদিন কী কারণে যেন বারান্দায় গিয়েছি হঠাৎ দেখি পুইশাকটা বড় হয়েছে। ডাল বের করে দিয়েছে। কিন্তু কোন কিছু ধরতে পারছে না। সে যেন তার অনেকগুলি হাত বের করে দিয়েছে, কিন্তু সেই হাত দিয়ে সে কাউকে ছুঁতে পারছে না। কী ভয়ংকর অসহায় যে লাগছে গাছটাকে।

ডিরেক্টর সাহেব অবিকল এ রকম একটা লতানো গাছ। যে গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু শক্ত করে ধরার মত কিছু পাচ্ছে না— সে আতঙ্কে অস্থির। সে কি এই জীবনে ধরার মত কিছু পাবে না ?

এ ধরনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছার নামই ভালবাসা। আমার ভালবাসার শুরুটা সেখানেই, সম্ভবত আপনার বোন লাবণ্যের ব্যাপারেও এ রকম হয়েছে।

মানুষটার পাশে আগ্রহ নিয়ে দাঁড়ানোর পর অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা। সৌন্দর্য দেখার ক্ষমতা। সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। সৃষ্টিশীল মানুষের যে ব্যাপারটা থাকে। প্রকৃতি হয়ত খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। যারা এই ক্ষমতাটা পায় তারাও খুব স্বাভাবিক ভাবেই নেয়। ক্ষমতার মাত্রা সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে না। কিন্তু আমার মত মানুষ— যারা সৃষ্টিশীল না তারা অভিভূত হয়। অভিভূত হয়ে ভাবে সাধারণ একজন মানুষের এত ক্ষমতা ? আপনি নিজেও কি অভিভূত হন নি ? তাঁকে দেখামাত্রই কি আপনার সমস্ত চেতনা কেঁপে ওঠে নি ?

কোন মেয়ে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে তার চোখে প্রেমিকের সৎ গুণ গুলিই পড়ে। ক্রটি গুলি চোখে পড়ে না। আপনি লিখেছেন— প্রেমিক যখন নাক ঝেড়ে হাত সিকনিতে ভর্তি করে ফেলে— তখন মনে হয়— আহা কী সুন্দর করেই না নাক ঝাড়ছে।

আমি মেয়েটা একটু বোধ হয় আলাদা, আমি শুধু তাঁর ক্রটিগুলি বের করতে চেষ্টা করেছি। তার কারণও আছে, তাঁর ক্রটিগুলি চোখে পড়লে তাঁর প্রতি আমার মুগ্ধতা কমতে থাকবে। আমি ধাক্কা খাব। ফিরে যেতে পারব নিজের জগতে। সেলিম ভাইকে তিনি ছবিতে নিলেন। সুপারস্টার ফরহাদ সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তখন আমি মনে প্রাণে চাচ্ছিলাম যেন তিনি সেলিম ভাইকে বাদ দিয়ে দেন। যেন আমি তাঁর এই ব্যাপারে মস্ত একটা আঘাত পাই। যেন আমি তাঁর কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি।

সে রকম হয় নি। উল্টোটাই হয়েছে। ফরহাদ সাহেবের মত নামী দামী অভিনেতাকে তিনি পাত্তাই দেন নি। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের ক্রটি গুলিই গুণ হিসেবে দেখা দেয়। উনি তেমন একজন। মানুষের মস্ত বড় ক্রটি তার অহংকার। কিন্তু উনার অহংকারইতো উনার গুণ। আপনি জানেন না তাঁর ক্রটিগুলি দেখে আমি যতই দূরে সরতে গিয়েছি ততই তাঁর কাছে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। ততবারই মনে হয়েছে এইসব ক্রটি আমার নেই কেন ?

আপনার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে কী করে ধারণা করল মেয়ে ভুলানোর জন্যে তিনি তাঁর মজার মজার গল্পের ঝুড়ি খুলে বসেন ?

আপনি কি দেখেন নি— এই একই গল্প তিনি কত আগ্রহের সঙ্গে মওলানা সাহেবের সঙ্গে করছেন, বা ইউনিটের একটা ছেলের সঙ্গে করছেন।

তাঁর সম্পর্কে আমি এমন অনেক কিছুই বলতে পরব যা আপনি দীর্ঘদিন বিবাহিত জীবন যাপন করেও লক্ষ্য করেন নি।

আপনি কি তাঁর মুগ্ধ হবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন ? তাঁর মুগ্ধতার ভিন্ন একটা মাত্রাও আছে— তিনি তাঁর নিজস্ব মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে চান, যাতে তাঁর আনন্দের ভাগ অন্যরাও পায়। মুগ্ধ অনেকেই হয়। আনন্দ অনেকেই পায়। কিন্তু ক'জন তা ছড়িয়ে দিতে চায় ?

অবশ্যই আপনি তাঁর সম্পর্কে এমন এক তথ্য জানেন— যা আমি জানি না। আমার জানার কথা নয়। সেই তথ্য জানিয়ে আপনি আমাকে যে ধাক্কাটি দিতে চেয়েছিলেন তা দিতে পেরেছেন। কী তীব্র কষ্ট যে আমি পেয়েছি তা আপনি কোনদিন জানবেন না। আপনি যদি ভেবে থাকেন— আমি কষ্ট পেয়েছি এই ভেবে যে আমি মানুষটিকে নিয়ে কখনো সংসার করতে পারব না। আমাদের ঘরে ছোট্ট বাবু আসবে না। তাহলে আপনি ভুল করেছেন। আপনি যদি ভেবে থাকেন— কোন একদিন আমি মানুষটাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব, তাহলে আপনি খুব বড় ভুল করেছেন। আমার বাবাকে একজন মা'র কাছ থেকে নিয়ে গেছে— মা'র কষ্ট আমি জানি। এই কষ্টের কোন সীমা নেই। আমি কি করে অন্যকে এই কষ্ট দেব ? তা ছাড়া উনার মত মানুষকে ভুলানোর ক্ষমতা কি আমার মত বাচ্চা একটি মেয়েকে দেয়া হয়েছে ?

আমার কষ্ট পাবার কারণ হল, যে মানুষ তাঁর আনন্দ তার মুগ্ধতা চারদিকে ছড়িয়ে দেয় সে তার কষ্টটা কাউকেই বলতে পারে না। আমারতো মনে হয় নিজেকেও না। তাকে তার নিজের কষ্টও নিজের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়। মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ একজন মানুষ শারীরিক অসম্পূর্ণতার জন্যে অসম্পূর্ণ। শরীর কি এতই বড় ?

হ্যাঁ বড়। অবশ্যই বড়। শরীরের কাছে আমরা বার বার পরাজিত হই তারপরেও কিন্তু বলার চেষ্টা করি— শরীর কিছুই না। মনকে ধারণ করার সামান্য পাত্র মাত্র। মুখের বলায় কী যায় আসে। শরীর হচ্ছে শরীর। তার ক্ষমতাও মনের ক্ষমতার মতই অসীম।

আপনি উনাকে অসম্পূর্ণ শরীরের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন। উনি মুক্ত হতে চান— সাহসের অভাবে পারছেন না। সেই সাহস আপনি উনাকে দিতে পারেন নি। আমি কিন্তু পারি। আপনি কি চান সেই সাহস আমি তাঁকে দেই?

'রুমালী!'

আমি চমকে তাকালাম। চিঠি তৈরিতে বাধা পড়ল। সোহরাব চাচা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, কী ব্যাপার চাচা?

সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন— স্যার তোমাকে একটু ডাকছেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সোহরাব চাচা প্রায় কান্না কান্না গলায় বললেন, স্যারের শরীরটা খুব খারাপ করেছে। মন খারাপ। শরীরও খারাপ।

'শুটিং বন্ধ হয়ে গেল সেই জন্যে মন খারাপ?'

'হ্যাঁ। কী কষ্ট যে স্যার করেন ছবির জন্যে। সেই ছবি যখন হয় না ....'

'সোহরাব চাচা?'

'জ্বি মা।'

'লক্ষ্য করেছেন বেশ অনেকদিন পর আপনি আমাকে মা বললেন।'

সোহরাব চাচা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আচ্ছা ঐ প্রসঙ্গ থাক। একটা জরুরি কথা বলি। আপনি আপনার স্যারকে এত পছন্দ করেন কেন?

'জানি না মা।'

'সত্যি জানেন না?'

'না।'

'উনার কি জ্বর?'

'হ্যাঁ খুব জ্বর। তার উপর হাবিজাবি খেয়েছেন।'

'হাবিজাবিটা কী— মদ?'

'না মদ না— মন-ফল। চার পাঁচটা কোত্থেকে জোগাড় করে খেয়েছেন। মওলানা এনে দিয়েছে। শুনেছি এইসব খেলে পাগল হয়ে যায়।'

'আপনার কি ধারণা উনি পাগল হয়ে গেছেন?'

'আরে না। তবে চোখ লাল টকটকে হয়ে আছে— দেখলে ভয় লাগে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি ভয় পাব না। আমি খুব সাহসী মেয়ে। শুধু যে সাহসী তাই না— অন্যকে সাহস দেয়ার ব্যাপারেও এক্সপার্ট।

আমি খুব হাসছি। সোহরাব চাচা অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন। আমিও নিজের কাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছি— এত হাসছি কেন ? আমি কি জাহেদা হয়ে যাচ্ছি ?

উনার দরজার সামনে দাঁড়াতেই উনি বললেন— রুমালী এসো।

আমি পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। সোহরাব চাচা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি উনি যাবেন না। দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁর স্যারের শরীর খারাপ, মন খারাপ। তিনি তাঁকে ছেড়ে এক পাও যাবেন না। প্রয়োজনে সারারাত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

আমি ভেবেছিলাম উনাকে দেখব চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তা না। উনি চেয়ারে বসে আছেন। মনে হচ্ছে এখনই কোথাও বেরুবেন। ইলেকট্রিসিটি আছে। তারপরেও তাঁর সামনের টেবিলে মোমবাতি। ফুলদানী ভর্তি জবা ফুল। জবাফুল কেউ ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখে না। তাঁর ঘরে যতবার এসেছি জবা ফুল দেখেছি। জবা মনে হয় তাঁর পছন্দের ফুল।

'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন ?'

'এখন যাচ্ছি না। যদি বৃষ্টি হয়— নদীতে পানি আসে তাহলে পানি দেখতে যাব। শুটিং শেষ। সবাই চলে যাবে। এখন যদি নদী না দেখা হয় আর দেখা হবে না। শেষ সুযোগ। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে না ?'

'জ্বি পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে।'

'তুমি বোস। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

আমি বসলাম। তিনি সিগারেট ধরালেন। ড্রয়ার খুলে রুমাল নিয়ে পকেটে ভরলেন। চুল আঁচড়াতে লাগলেন। আশ্চর্য তাঁকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। চোখ ঝকমক করছে। মানুষের সৌন্দর্যের পুরোটাইতো তার চোখে। মন-ফল খেলে চোখ কি হীরের মত জ্বলে ? আমি বললাম, আপনি দেখি একেবারে ফিটফাট বাবু হয়ে নদী দেখতে যাচ্ছেন।

তিনি বললেন, আমি যেমন নদী দেখব, নদীওতো আমাকে দেখবে। নদীও দেখুক যে আমি ফরম্যালি তার কাছে এসেছি। এলেবেলে ভাবে আসি নি। যাই হোক তোমাকে ডাকার কারণ হচ্ছে তোমাকে একটা কথা বলা। কথাটা না বললে আমার খারাপ লাগবে।

'আপনি এমন ভাব করেছেন— যেন আর কোনদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

'তোমার ধরণ দেখা হবে?'

'হ্যাঁ হবে। কারণ আপনি আবারো এই ছবি শুরু করবেন। তখন দিলু চরিত্র করার জন্যে আমাকে ডাকবেন।'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'না আমি আর ছবি করব না। ভাল লাগছে না। যে কথাটা তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম সেই কথাটা শোন— তোমাকে আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি। তুমি যেমন আমাকে লক্ষ্য করেছ আমিও করেছি। তুমি বড় হয়ে ছবির লাইনে পড়াশোনা করো। কোন ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়ো। ছবির ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে। জগৎটাকে তুমি ভালবাস। অভিনয় আছে তোমার রক্তের ভেতরে। তুমি পারবে।

'থ্যাংক য়্যু।'

'শোন রুমালী একটা উপদেশ দেই— চোখ সব সময় খোলা রাখবে। অতি তুচ্ছ দৃশ্যও যেন চোখ এড়িয়ে না যায়। চণ্ডিগড় গ্রামে জাহেদা নামের একটা মেয়ে আছে। মেয়েটা ভবিষ্যৎ বলে— তার বাড়িতে একদিন গিয়ে দেখি— একটা পোষা বক। নাম ধলামিয়া। বুড়ো মানুষদের মত টুক টুক করে হাঁটে। মজার ব্যাপার কী জান? বকটা অন্ধ।'

'আপনাকে কে বলেছে? জাহেদা।'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ন গলায় বললেন, না কেউ বলে নি। কিছুক্ষণ বকটার দিকে তাকিয়েই বুঝলাম সে অন্ধ। তোমাকে এটা বললাম কেন জান— যাতে তুমি তোমার দেখার চোখ তীক্ষ্ম করতে পার। এইটা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম— এখন তুমি যেতে পার।

'একটু বসি?'

'আচ্ছা বোস। বৃষ্টি বেশ ভালই নেমেছে তাই না?'

'জ্বি।'

তিনি উঠে জানালার পাশে গেলেন। জানালার পর্দা সরালেন। বৃষ্টির ছাট তার গায়ে লাগল। তিনি চট করে সরে গেলেন। যেন বৃষ্টিতে তাঁর কাপড় না ভেজে। অথচ আমি নিশ্চিত জানি— ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই তিনি নদী দেখতে যাবেন। তাঁর মাথার উপর ছাতা থাকবে না।

'রুমালী! মোমবাতির আলোটা কেন জানি চোখে লাগছে। কিছুক্ষণের জন্যে বাতিটা নিভিয়ে দি?'

'দিন।'

তিনি বেশ কয়েকবার ফুঁ দিলেন। বাতি নিভল না। তিনি ক্লান্ত এবং হতাশ চোখে মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের তারায় মোমবাতির শিখার ছায়া।

'নীরা বলছিল তুমি খুব সুন্দর গান কর শোনাও একটা গান। আচ্ছা তুমি কি ঐ গানটা জান— ? Where have all the flowers gone ?'

'জ্বি না।'

তিনি নিজের মনে গুন গুন করলেন— Where have all the flowers gone ? Young girls pick them every one ..... তারপর চুপ করে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন— আমার পছন্দের গান। কথাগুলি সুন্দর। গানটা শেষ হয় প্রশ্ন দিয়ে। When will they ever learn ? তারা কবে শিখবে ?

'আমি আপনাকে অন্য একটা গান শুনাই ?'

'না— কেন জানি এই গানটা ছাড়া অন্য কোন গান এখন শুনতে ইচ্ছে করছে না। আমার একটা সমস্যা আছে, যখন যে গানটা শুনতে ইচ্ছে করে তখন সেই গানের বদলে অন্য গান অসহ্য লাগে।'

'আমি এই গানটা শিখে রাখব যদি পরে কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয় আপনাকে শুনাব।'

'থ্যাংক য়্যু ইয়াং লেডি। মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না। চল ওঠা যাক। আমি এখন নদী দেখতে যাব।'

'আমি কি আসব আপনার সঙ্গে ?'

'না। আমি একা যেতে চাই।'

তিনি বৃষ্টির মধ্যেই উঠোনে নামলেন সোহরাব চাচা ছাতা নিয়ে ছুটে গেলেন। তিনি ইশারায় বললেন— না। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় শুরু হয়েছে।

সোমেশ্বরী নদী গর্জাচ্ছে। নদী তার অলৌকিক গলায় ডাকছে— এসো। এসো। সেই আহ্বান সবাই শুনতে পায় না। কেউ কেউ পায়।